বাছাই চর্যাপদ

২০১৬

সময়ের বিচারে হয়ত খুবই সংক্ষিপ্ত তবু বড় কম সময় নয় চার চারটে বছর। এই চার বছরে চর্যাপদ বেশ খানিকটা পথ এগিয়েছে। অবশ্য পথ চলার এখনো তার বহু বাকি। হয়তো বা শেষই নেই, হয়তো যা পেরিয়েছে তা সামান্যই।

প্রথম যখন চর্যাপদ আন্তর্জালের জগতে প্রবেশ করে তখন সেভাবে বলতে গেলে ভারতবর্ষে বাংলা নিয়ে লেখালেখি করার জায়গা অনেকটাই সঙ্কুচিত বললেই চলে বা বলা যায় সংখ্যায় অনেক কম। বাংলাদেশের ব্লগের পসার তখন অনেক বেশি। সেসবেরই আনাচে কানাচে ঘুরে ফিরে আমাদের মনে হল, এবার একটা বাংলা ব্লগ তৈরী করা যাক। যেখানে বাঙালীরা নিজের মনের মতো করে উজাড় করে দিতে পারবে। আলোচনা করবে সাহিত্য, শিল্প, সমাজ, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, খোলা মনে।

চেষ্টা ছিল নিতান্তই শিশুসুলভ। সেদিনও ছিল, আজও আছে। সেদিনও অজানা ছিল, আজও তাই রয়ে গেছে। কেমন করে ব্লগের সম্পাদনা করতে হয়, কেমন করে মানুষকে কাছে টেনে লেখাগুলো পড়াতে হয়, কেমন করে মানুষকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে হয়, পড়িয়ে নিতে হয়, সে বিষয়ে আমরা আজও অজ্ঞ। যে যেমন করে চর্যাপদকে চায় সে সেভাবেই তাকে আপন করে নিক, এইটুকুই ছিল চাহিদা।

আজ যখন চর্যাপদের পুরনো পাতাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখা যায়, তখন দেখে বেশ ভালোই লাগে যে বহু জ্ঞানী-গুণী বিদ্বজন আজ আমাদের মাঝে স্বয়ংস্ক্রিয় ভাবেই অংশগ্রহণ করেছেন, নিয়মিত লেখালিখি করেছেন, সাধুবাদ বা মতামতের তোয়াক্কা না করেই। লেখালেখিটা তাঁরা ভালবাসা থেকেই করেছেন। ফলত চাহিদা অনেকাংশেই পূর্ণ।

এইসব ছোট্ট ছোট্ট চাহিদা এবং পূরণ এই নিয়েই আমরা পা রাখলাম পাঁচে। তার অঙ্গ হিসেবে প্রতি বছরের মত চার-কেও ফিরে দেখা।

সূচীপত্র

কবিতা

অভ্যেসবশে	যদুবাবু	৬
নাইটস্কোপ	নবকলম	৩৫
হিমঘরে দু'জন	তৃতীয় পাণ্ডব	৫৭
ডায়েরির শেষদিক থেকে	নবকলম	৮৩
ধৈর্য	অভ্রনীল	১১৩
ছাদ ও অন্যেরা	তৃতীয় পাণ্ডব	১২৮

গল্প

ফসল	তুষার সেনগুপ্ত	৮
মিলির ইন্টারভিউ	অতিথি লেখক	৩০
হোয়াটসঅ্যাপ	হযবরল	৪৮
ভূত ভবিষ্যত	তৃতীয় পাণ্ডব	৬৬
টেলিফোন	হস্তীমূর্খ	৮৫
প্রতীক্ষা	দেবদত্ত	১০০
স্বীকারোক্তি	তুষার সেনগুপ্ত	১১১

মেরি ক্রিস্টমাস	রুদ্র রোদ্দুর	১১৭
ভ্যালেন্টাইনস ডে	তৃতীয় পাণ্ডব	১৫০

মুক্তগদ্য

সেই ছিল একদিন আমাদের	যদুবাবু	৩৬
গ্রীষ্মের প্রলাপ	শাক্যমুনি	৫৩
ইস্কুলের গল্প	যদুবাবু	৭৮
বিশ্ববাঙালি	হযবরল	১১৪

প্রবন্ধ

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ	অতনু	৯
শকুনি চরিত্র	হিমাদ্রী	৮৭
বৌদ্ধধর্ম যুক্তিবাদ ও পুনর্জন্ম	সৌমেন পাত্র	১৩০

রান্নাবান্না

সাদাশাহী মুরগি ও দুধসাদা মিষ্টি	শ্রীরূপা	৭২

সেকাল ও একাল

পরমাণু ও একটি অন্য যুদ্ধ	সৌমেন পাত্র	৪০
ছোট্ট দুটি গল্প	পাগলা দাশু	৬২
খোদার ওপর খোদকারি	প্রত্যয়	৬৯
মোদী বনাম পাকিস্তান, মোদী বনাম মিডিয়া	সৌরদীপ	৯৩
হিন্দুত্ব, গো-মাতা, রাজপাট ও বাঙালী	কল্পতরু	১১৯
দ্রৌপদী ধৃতরাষ্ট্র সংবাদ	অতনু	১২৩
ভগ্নস্তূপ ও এক ষষ্ঠবর্ষীয় শিশু	হস্তীমূর্খ	১৫৩

অভ্যেসবশে

যদুবাবু

জানুয়ারী ৭, ২০১৬

শব্দহীন, বর্ণহীন মুখ ওল্টাতে ওল্টাতে

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম একটা অচেনা হাসির সামনে,

আর সে আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল

একটা হারিয়ে যাওয়া প্রজাপতির জঙ্গলে...

সেখানে পাতার ফাঁক দিয়ে এখনও উঁকি দেয়

নীল সাদা প্যাস্টেল সূর্য,

তার গভীরে বল্কল খুলে সোনাঝুরি গাছ নামে

অলীক অবগাহনের জলে ...

হয়তো কোনো খাদের ধারে তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে ওঠে একটা পাখি,

আর তার গান শুনতে শুনতে,

ছাই ঝেড়ে উঠে বসে,

আরেকটা টান দিয়ে

কবিতার শেষ লাইনটা লিখে ফেলেন ব্যান্ডমাস্টার।

আমি এসব দেখতে দেখতে দূর থেকে তোমার জন্যে

রুমাল নাড়তে নাড়তে

একটা অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়বো,

যেখানে ঘুমের মাঝেও একটা পাল্লা ঠিক খুলে যাবে অভ্যেস মতন

যেখানে জানলার ফাঁকে এখন আর সেই অসহ্য টগর গাছটা নেই,

(মালাগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাওনি?)

যেখানে অনেকদিন পর একটা পড়ন্ত বিকেলে দেখবো

কালোজিরে ধনেপাতা আর বেড়ালের খাওয়া এঁটো-কাঁটার মাঝে

মায়ের খোঁজ নিতে মাঝে মাঝে তোমার ফোন আসে...

কিন্তু আমার ডাকবাক্সে একটাও কবিতার আবদার নেই।

ফসল

তুষার সেনগুপ্ত

এপ্রিল ৩, ২০১৬

রিক্সার প্যাডেলে পা দু'টো যেন বসতেই চাইছে না কেয়ামতের। খালি ছিটকে ছিটকে ওপর দিকে উঠতে চাইছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে আর শরীলটাও যেন শূন্যে ভাসছে। রোজই ভাবে আজ আর যাবে না হাবুলদের ঠেকে কিন্তু ইস্টিশনের শেষ লোকালটা চলে যেতেই কি যে হয়....

রোজ রাত্তিরের মত আজও বাড়ি ফিরে লন্ঠনের টিমটিমে আলোয় চম্পার ঘুমন্ত মুখটা দেখতে দেখতে কেয়ামত প্রতিজ্ঞা করে কাল থেকে আর ওমুখো হবে না। ডালে চুবিয়ে চুবিয়ে গোটা চারেক রুটি কোনমতে পেটে সেঁধিয়ে হারিকেনটা নিভিয়েই কেয়ামত জাপটে ধরে চম্পাকে। আর রোজকারের মতই ঝাপটা দিয়ে কেয়ামতের হাত সরিয়ে দিয়ে চাপা গনগনে গলায় খিঁচিয়ে ওঠে চম্পা,

- "মরণ! গাঁজা টেনে মাঝ রাত্তিরে সোহাগ কত্তে এসেছে। কেন, হাবুলের গাঁজার ঠেকে মাগি পাওয়া যায় না?"

বলেই উল্টোদিকে ফিরে শোয়। সারাদিন রিক্সা ঠেঙিয়ে রোজগার। বিবির খাওয়া পরার তো আর অভাব রাখেনি কেয়ামত। নিজের রক্তজল করা রোজগারের পয়সায় একটু ফুর্তি করলেই মাগির যত জ্বালা। একে নেশার ঘোর তার ওপর শাদি করা বিবির অচ্ছেদ্দা। মাথায় আগুন জ্বলে যায় কেয়ামতের। রিক্সার হ্যান্ডেল ধরা ডানহাতের শক্ত থাবায় খামচে ধরে চম্পার বুক। বাঁহাতে চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে গর্জে ওঠে,

- "কিসের এত তেজ তোর? বলি, মাগি তোর কিসের এত তেজ? তিন বচ্ছর শাদি হয়েছে, একটা বাচ্চাও তো বিয়তে পারলি না..... আয় শালি...."

কেয়ামতকে এক ধাক্কায় চৌকি থেকে নিচে ফেলে দিয়ে চম্পা দাঁতে দাঁত চেপে গুমরে ওঠে,

- "একদম ছুঁবি না আমায়। আমাকে তো শেষ করেছিস, আমার পেটেরটাকেও....."

ঘুরঘুট্টি অন্ধকারেও চম্পার মুখটা দেখতে চেষ্টা করে রহমত। ঘন অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। ইষ্টিশনের পেছনের জঙ্গল থেকে ভেসে আসা শেয়ালের চিৎকারকে ভেদ করে শুনতে পায় চম্পার হিসহিসে গলা,

- "তিন বচ্ছর ধরে লোকের মুখে শুনছি আমি নাকি বাঁজা। শালা! মরদের খ্যামতা নাই আর বিবি কিনা বাঁজা....."

জমাট বাঁধা অন্ধকার গায়ে মেখে কেয়ামত বোঝার চেষ্টা করে বিবি পোয়াতি হওয়ার খবরটা আনন্দের নাকি.....

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ১০০ বছর ও মহাকর্ষীয় তরঙ্গ

অতনু

মার্চ ৩০, ২০১৬

সময়টা ১৯১৯। সবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। ধ্বংসের স্মৃতি পেছনে ফেলে ছন্দে ফিরছে ইউরোপ। মে মাস নাগাদ আর্থার এডিংটনের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী বাক্সয় করে বিশাল বড় এক দূরবিন নিয়ে পাড়ি দিলেন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের প্রিন্সিপি দ্বীপে। না ছুটি কাটাতে নয়, তাঁরা গিয়েছিলেন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখতে। সূর্যগ্রহণ দেখতে বলা ভুল হল, তাঁরা গিয়েছিলেন বৃষ রাশির কয়েকটা নক্ষত্রকে দেখতে। একই সময় একই উদ্দেশ্যে ব্রাজিলের সোবরাল শহরে গেলেন ফ্রাঙ্ক ডেভিসনের নেতৃত্বে আর এক দল বিজ্ঞানী। এর আগে জানুয়ারি মাসেও তাঁরা ঐ দুই জায়গা থেকে নক্ষত্রগুলো দেখে এসেছেন; কিন্তু সে ছিল রাত্রিবেলা, আকাশে সূর্য ছিল না। এবার দিনের বেলায় দেখবেন, যখন ঐ তারাগুলো থেকে আলো আসবে সূর্যের পাশ দিয়ে। সূর্যগ্রহণের সময় আসতে হল কারণ চাঁদমামা যতক্ষণ না সুয্যিমামাকে আড়াল করছে, ততক্ষণ বৃষ কেন কোন রাশিকেই দেখা যাবেনা।

এত কাণ্ড করার কারণ তিন বছর আগে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন জেনারেল রিলেটিভিটি নামে এক বিদঘুটে তত্ত্ব বাজারে ছেড়েছেন। এই তত্ত্ব বলছে মহাকর্ষ না কি - নিউটন যেমন বলে গেছিলেন, দুটো ভারী বস্তুর আকর্ষণ বলের ব্যাপারই নয় - পুরোটাই জ্যামিতির খেলা। জ্যামিতি মানে স্পেসটাইমের জ্যামিতি। এর আগে ১৯০৭ সালের বিশেষ

আপেক্ষিকতার তত্ত্বে তিনিই দেখিয়েছেন যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা নিয়ে আমাদের তিনমাত্রার স্পেস আর সময় বা টাইমকে আলাদা করে না দেখে চারমাত্রার স্পেসটাইম হিসেবে দেখাই ভালো। তো আশেপাশে যখন কোন ভারী বস্তু নেই তখন স্পেসটাইম সমতল থাকে। কোন ভারী বস্তু রাখলেই স্পেসটাইম আর সমতল থাকেনা, বক্রতল হয়ে যায়। এই বক্রতলের বক্রতা নির্ভর করছে ঐ বস্তুটির ভরের ওপর। এবার দ্বিতীয় আরেকটি বস্তুর কথা ভাবা যাক। দ্বিতীয় বস্তুটি সমতল স্পেসটাইমে থাকলে অর্থাৎ নিউটনের ভাষায় তার ওপর কোন বল প্রযুক্ত না হলে সে সমবেগে সরলরেখায় ছুটবে। যখনই ভারী বস্তুটাকে রাখা হবে সে দ্বিতীয় বস্তুর ওপর মধ্যাকর্ষণ বল প্রয়োগ করে তাকে একটা নির্দিষ্ট পথে চালাবে, যেমন সূর্য পৃথিবীকে উপবৃত্তাকার পথে চালাচ্ছে। আইনস্টাইনের মতে অবশ্য দ্বিতীয় বস্তুটা সেই পথেই চলবে যাতে তাকে সবচেয়ে কম দুরত্ব পেরোতে হয়। যেটা আমরাও করি, কোন জায়গায় যাওয়ার আগে জেনে নিই শর্টেস্ট রুটটা কি (যদি না হাঁটা বা বেড়ানোটাই উদ্দেশ্য হয়)। সমতল স্পেসটাইমে সরলরেখায় ছোটার কারণ ওভাবে চললেই ন্যূনতম দুরত্ব অতিক্রম করতে হয়। সমতল ব্ল্যাকবোর্ডে দুটো বিন্দু এঁকে তাদের অসংখ্য রেখা দিয়ে যোগ করতে পারি, কিন্তু সবচেয়ে কমদৈর্ঘের রেখাটা হবে সরলরেখা। এবার যদি একটা ফুটবলের ওপর দুটো বিন্দু দিই, তাহলে কিন্তু তাদের মধ্যের ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের পথ সরলরেখা হবেনা। স্পেসটাইমের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ভারী বস্তুটা স্পেসটাইমটাকে এমনভাবে বেঁকিয়ে চুড়িয়ে রাখবে যাতে দ্বিতীয় বস্তুটা সরলরেখার বদলে ন্যূনতম দুরত্বের পথে ছোটে, আমরা যেমন রাস্তায় খানাখন্দ থাকলে একটু ঘুরপথে যাই। আইনস্টাইনের এই নতুন তত্ত্ব অনেকের কাছে হয়ে উঠল সুখে থাকতে ভূতে কিলনোর সামিল। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র দিয়ে দিব্যি কষে ফেলা যাচ্ছে চন্দ্র তারার অংক হিসেব। খামোকা এইসব জ্যামিতির ঝামেলা কেন বাপু? রবীন্দ্রনাথ তখন কিশোরদের উপযোগী বিজ্ঞানের পাঠ্যবই লিখছিলেন। ৭০ বছর বয়সে জেনারেল রিলেটিভিটি শিখতে বসে লিখলেন,

"আমরা এমন একটা জগতে আছি যার আয়তনের স্বভাব অনুসারে প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। বস্তুমাত্র যে আকাশে থাকে তার একটা বাঁকানো গুণ আছে, মহাকর্ষ তারই প্রকাশ। এটা সর্ব্যব্যাপী, অপরিবর্তনীয়। এমনকি আলোককেও এই বাঁকা বিশ্বের ধারা মানতে হয়, তার নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে। বোঝার পক্ষে (নিউটনের) টানের ছবি সহজ ছিল, কিন্তু যে নতুন জ্যামিতির সাহায্যে এই বাঁকা আকাশের ঝোঁক হিসেব করে জানা যায় সে কজন লোকেরই বা আয়ত্তে আছে।" (বিশ্বপরিচয়)

ফিরে আসি সেই সূর্যগ্রহণের কথায়। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী ভারী বস্তুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আলোকরশ্মিরও "বাঁকা বিশ্বের ধারা" মেনে সরলরেখা ছেড়ে বিচ্যুত হওয়ার কথা। এই বিচ্যুতিটাই মাপতে গেছিলেন এডিংটনরা। রাত্রে সূর্যের অনুপস্থিতিতে বৃষরাশির তারাগুলো থেকে আলো আসছিল সরলরেখায়। দিনের বেলায় সূর্যের পাশ দিয়ে আসার সময় ঐ একই তারা থেকে আসা আলো বেঁকে গেছিল প্রিন্সিপির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ১.৬১ সেকেন্ড ও সোবরালের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ১.৯৮ সেকেন্ড কোণে। আইনস্টাইনের হিসেব অনুসারে এই কৌণিক

সরণের মাপ হওয়া উচিৎ ১.৭৮ সেকেন্ড, যা পরীক্ষালব্ধ ফলের কাছাকাছি। এটাই ছিল সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সপক্ষে প্রথম পরীক্ষামূলক প্রমাণ। এডিংটন তার করে খবরটা জানালে আইনস্টাইন তারবার্তাটা তাঁর এক ছাত্রের হাতে দিয়ে বলেন *"এতে তোমার আগ্রহ থাকতে পারে।"* গুরুর তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে দেখে ছাত্রটি উল্লাসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু আইনস্টাইন তার উৎসাহে জল ঢেলে বলেন, *"এত লাফাচ্ছো কেন বাপু? এ তো জানা কথা আমার তত্ত্ব ঠিক"*। ছাত্রটি থমকে গিয়ে বলে, *"যদি এমন হত যে পরীক্ষার ফল আপনার হিসেবের সঙ্গে মিলছে না, তখন কি বলতেন?"* এর উত্তরে আইনস্টাইন যা বলেন তা ইতিহাস হয়ে গেছে, *"তখন ঈশ্বরের জন্য দুঃখিত হতাম, আমার তত্ত্বটা নির্ভুল!"* (Then I would have been sorry for the dear Lord – the theory is correct)

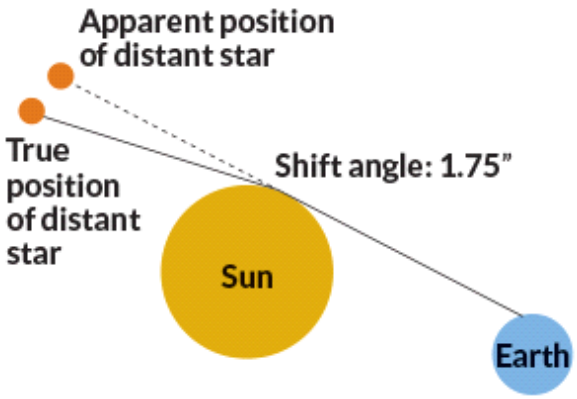

আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী ভারী বস্তুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আলোকরশ্মিও "বাঁকা বিশ্বের ধারা" মেনে সরলরেখা ছেড়ে বিচ্যুত হয়।

নিউটনের মহাকর্ষের সূত্র দিব্যি কাজ করলেও তাতে কিছু গণ্ডগোল ছিল। যেমন নিউটনের মহাকর্ষীয় বল কাজ করে action at a distance নীতি অনুসারে। ধরা যাক সূর্য যদি হঠাৎ হাপিস হয়ে যায় সেই মুহূর্তেই পৃথিবী সমেত সব গ্রহ ছিটকে চলে যাবে। কিন্তু আলোর বেগের (৩ লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড) চেয়ে দ্রুতগতিতে কোন তথ্য আদান প্রদান হতে পারেনা। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট। তার আগে সূর্যের অন্তর্ধানের খবর আমরা পাবনা। কিন্তু সে খবরটা আসবে কিভাবে? সূর্যের না হয় আলো আছে। ধরা যাক একটা মৃত নক্ষত্র শ্বেত বামন উড়ে এসে জুড়ে বসল সৌরমণ্ডলের কাছাকাছি। শ্বেত বামন আলো বিকিরণ করে না। তাহলে সে কিভাবে খবর পাঠাবে, "আমি এসে গেছি"?

আইনস্টাইন এক নতুন দূতের গল্প শোনালেন, যার নাম মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। তরঙ্গ বোঝা গেল, কিন্তু কেমন তরঙ্গ? আগে তরঙ্গ বলতে জানা ছিল, সমুদ্রের ঢেউ, শব্দ তরঙ্গ ইত্যাদি, যেগুলো প্রবাহিত হয় মাধ্যমের কণাগুলির কম্পনের

মাধ্যমে। তারপর হাইগেন্স, ম্যাক্সওয়েল এনারা দেখালেন আলোও এক ধরণের তরঙ্গ - তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ, যা কোন মাধ্যম ছাড়াই অগ্রসর হতে পারে। শুধু দৃশ্যমান আলো নয়, এক্স রশ্মি, গামা রশ্মি, অতিবেগুনি রশ্মি, অবলোহিত রশ্মি, মাইক্রোওয়েভ সবাই তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ, পার্থক্য শুধু তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কে। তরঙ্গের গতির লম্বভাবে তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্রের কম্পনের সঙ্গে এই ধরণের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। কিন্তু শব্দ তরঙ্গই হোক বা তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গই হোক, মাধ্যম থাক না থাক, এগোয় স্পেসটাইমের ওপর দিয়েই। কিন্তু মহাকর্ষীয় তরঙ্গের চরিত্র সম্পূর্ণ অন্য, এক্ষেত্রে ঢেউ তৈরী হয় খোদ স্পেসটাইমেই। ব্যাপারটা বুঝতে একটা থিয়েটারের হলে যাওয়া যাক। থিয়েটারের মঞ্চটা হল স্পেসটাইম আর নটনটীরা হলেন মাধমের কণা বা তড়িৎ বা চৌম্বক ক্ষেত্র। মঞ্চের ওপর নটনটীরা অভিনয় করছে এটা হল শব্দ বা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। এবার হঠাৎ ভূমিকম্প হল আর সোফা, খাট, আলমারি সমেত মঞ্চটা নাচতে শুরু করল, তখন যে নাটক শুরু হবে তা হল স্পেসটাইমের ঢেউ।

এখন কথা হল এই ঢেউ তৈরী হবে কিভাবে? জলে একটা পাথর ছুঁড়লে জলের ঢেউ তৈরী হয়। তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের উৎপত্তি হয় যখন কোন আধানযুক্ত কণার গতিবেগের মান বা দিক সময়ের সঙ্গে বদলাতে থাকে। একইরকম ভাবে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উৎস হল কোন ভারী বস্তুর ত্বরিত গতি। অর্থাৎ আপনি যদি মাটিতে ডিগবাজি খান বা একটা ডাম্বেল নিয়ে বনবন করে ঘোরান তাহলেও মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সৃষ্টি হবে যদিও অত ছোট্ট ঢেউকে ধরার মত যন্ত্র দূর ভবিষ্যতেও পাওয়ার সম্ভাবনা নগণ্য। শনাক্ত করার মত ঢেউ তৈরী হতে পারে কোন মহাজাগতিক ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটলে। এই যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে, তার অর্থ পৃথিবীর গতিবেগের অভিমুখ প্রতিমুহূর্তে বদলাচ্ছে। তাহলে পৃথিবীও মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বিকিরণ করছে। সেই বিকিরণের প্রাবল্য কতটা?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে একটা ব্যাপার মনে রখলে সুবিধে হবে যে অন্যান্য যেকোন তরঙ্গের মত মহাকর্ষীয় তরঙ্গও কিছু শক্তি বহন করে নিয়ে যায়। এখন শক্তির নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী শক্তির মোট পরিমাণ ধ্রুবক থাকতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন শক্তি বলতে শুধু স্থিতিশক্তি বা গতিশক্তি নয়, বস্তুর ভরকেও হিসেবে রাখতে হবে। কারণ আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব থেকে আমরা জানি ভরকে শক্তিতে এবং শক্তিকে ভরে রূপান্তরিত করা যায়। m পরিমাণ ভরকে যদি E পরিমাণ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তবে তাদের সম্পর্ক হবে $E=mc^2$, যেখানে c হল শূণ্য মাধ্যমে আলোর বেগ। তো মহাকর্ষীয় তরঙ্গ যদি খানিকটা শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবে যে বস্তুটি ঐ তরঙ্গ বিকিরণ করছে তার শক্তি সেই পরিমাণে কমে যাবে। তাহলে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করার সময় মহাকর্ষীয় বিকিরণের মাধ্যমে শক্তিক্ষয় করতে থাকবে। ফলতঃ তার কক্ষের ব্যাসার্ধ ক্রমশ কমবে এবং শেষে হতোদ্যম হয়ে সূর্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড, যখন তিনি পরমাণুর ভেতরে ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট ইলেকট্রনের আবর্তনকে সৌরমণ্ডলে সূর্যের চারিদিকে গ্রহগুলির আবর্তনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। রাদারফোর্ডের মডেল সত্যি হলে

ইলেকট্রন তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের মাধ্যমে শক্তিক্ষয় করে নিউক্লিয়াসের ঘাড়ে পড়বে আর পরমাণুর কোন অস্তিত্বই থাকবে না! পরে অবশ্য জানা যায় পরমাণুর ভেতরটা মোটেই সৌরজগতের মত নয়, ইলেকট্রন আসলে কোয়ান্টাম কণা, যে কোন নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের কক্ষে ঘোরে না, বরং সে এমনভাবে চলাফেরা করে যাতে তার কৌণিক ভরবেগ ও শক্তি ধ্রুবক থাকে।

তো যেকোন দুটো মহাজাগতিক বস্তু যদি পরস্পরের চারদিকে ঘোরে তবে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের মাধ্যমে যে শক্তি বিকিরিত হবে তা গণনা করা সম্ভব যদি বস্তুদুটির ভর ও মধ্যবর্তী দুরত্ব জানা থাকে। বস্তুদুটির ভর যত বেশী হবে ও তাদের মধ্যেকার দুরত্ব যত কম হবে তত বেশী শক্তি বিকিরিত হবে। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য এভাবে যে শক্তি বিকিরিত হয় তার হার ২০০ ওয়াট। এইটুকু শক্তি দিয়ে আপনি বড়জোর গোটা পাঁচেক টিউব লাইট জ্বালাতে পারেন বা একটা টিভি বা ল্যাপটপ কষ্টেসৃষ্টে চালাতে পারেন! ওয়াশিং মেশিন বা এসি শক্তিতে কুলোবে না। একটা তুলনার জন্য সূর্যের তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের কথা ভাবা যেতে পারে, আমাদের মানব সভ্যতা, জীবজগৎ যার একটা ছোট্ট অংশ ব্যবহার করে টিকে আছে। ১ এর পিছনে ২৬টা শূণ্য বসালে যা হয়, সূর্যের তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের ক্ষমতা তত ওয়াট। অর্থাৎ মহাকর্ষীয় তরঙ্গের মাধ্যমে সৌরমণ্ডল থেকে বিকীর্ণ শক্তি যে নেহাতই নগণ্য তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এইটুকু শক্তি বিকিরণের ফলে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ প্রতি বছর ০.০৩ ন্যানোমিটার অর্থাৎ একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর আকারের ৩০০ ভাগের একভাগ করে কমছে! এভাবে ১এর পিছনে ২৩টা শূণ্য বসালে যা হয় তত বছর পর পৃথিবী সূর্যের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে! সময়টা কত বড় তা বুঝতে এটুকু তথ্যই যথেষ্ট যে এই মহাবিশ্বের বয়স ১৪ বিলিয়ন অর্থাৎ চোদ্দর পিছনে ৯টা শূন্য বসালে যা হয় তত বছর।

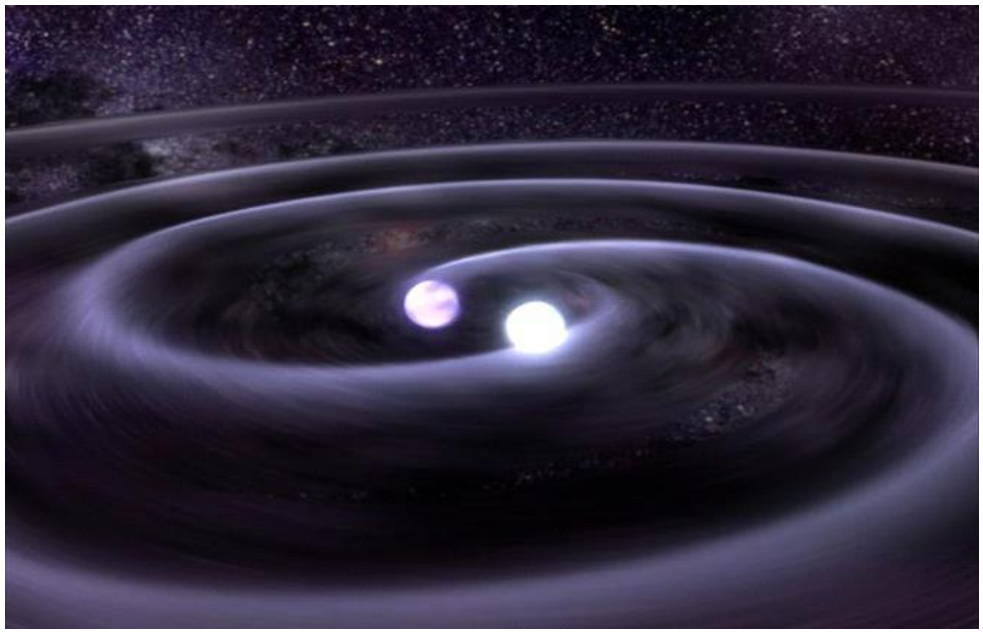

দুটো নক্ষত্র পরস্পরকে ঘিরে পরিক্রমণ করলে মহাকর্ষীয় বিকিরণের মাধ্যমে শক্তিক্ষয় করে একসময়ে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ওপরের সংখ্যাগুলো থেকে এটা বোঝা গেল যে সাধারণ গ্রহ, নক্ষত্রের গতির জন্য যে অতিক্ষুদ্র মহাকর্ষীয় তরঙ্গ তৈরী হয় তার মাপ নেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। পরিমাপযোগ্য মহাকর্ষীয় তরঙ্গ উৎপাদনের জন্য আরো অনেক বেশী ভর ও অনেক কম ব্যাসার্ধের কক্ষে পরিভ্রমণ করা মহাজাগতিক বস্তু সমষ্টির প্রয়োজন। এখন একটা গ্রহ একটা নক্ষত্রের যতখুশি কাছে তো যেতে পারেনা। যেমন সৌরজগতের কোন গ্রহই সূর্যের যা ব্যাসার্ধ অর্থাৎ ৭ লক্ষ কিলোমিটার বা তার কাছাকাছি যেতে পারবে না। তাই এমন বস্তু দরকার যার ভর শুধু বিশাল নয়, আয়তনও খুব ছোট। অর্থাৎ ঘনত্ব খুব বেশী। এই ধরণের মহাজাগতিক বস্তু তৈরী হয় একটা নক্ষত্রের জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়ার পর। এমনিতে ভরের জন্য যেকোন নক্ষত্রই চুপসে যেতে চায়, কিন্তু অনবরত নিউক্লিয় সংযোজন চুল্লি চালু থাকায় একটা বহির্মুখী চাপ কাজ করে, ফলে নক্ষত্র সাম্যাবস্থায় থাকে। এই নিউক্লিয় চুল্লির জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে নক্ষত্র সংকুচিত হতে থাকে। আমাদের সুব্রহ্মণিয়ন চন্দ্রশেখর দেখিয়েছিলেন তারাটির কেন্দ্রীয় অঞ্চলের (যেখানে নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়া চলার মত চাপ আর তাপমাত্রা বিদ্যমান থাকে) ভর যদি সূর্যের ভরের ১.৪ গুণের কম হয় তবে সে সংকুচিত হয়ে শ্বেতবামনে পরিণত হবে। একটা শ্বেতবামনের ঘনত্ব সূর্যের ঘনত্বের দশ লক্ষ গুণ, অর্থাৎ পৃথিবীর সমান আয়তনে সূর্যের সমান ভর ঢুকে যাবে। তারাটির কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ভর যদি সূর্যের ভরের ১.৪ গুণ থেকে ৩ গুণের মধ্যে হয় তাহলে আরো সংকুচিত হয়ে নিউট্রন স্টারে পরিণত হবে। এক একটা নিউট্রন স্টারের ঘনত্ব এমন যে কয়েক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের গোলকের মধ্যে গোটা কতক সূর্য ঢুকে যাবে। আর তারাটির ভর আরো বেশী হলে তার ভবিতব্য হল কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল। ব্ল্যাকহোল হল একধরণের স্পেসটাইম সিঙ্গুলারিটি যেখানে সমস্ত ভর কেন্দ্রীভূত থাকে একটা বিন্দুতে। ফলত ঘনত্ব ও স্পেসটাইম জ্যামিতির বক্রতা হয়ে দাঁড়ায় অসীম। ব্ল্যাকহোলের আশেপাশে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এমনই শক্তিশালী হয় যে কোন বস্তু এমনকি আলোও বেরিয়ে আসতে পারেনা তার আকর্ষণ থেকে।

সুতরাং নিউট্রন স্টার বা ব্ল্যাকহোল মহাকর্ষীয় তরঙ্গের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে। এরকম একজোড়া ব্ল্যাকহোল বা নিউট্রন স্টার যদি পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে তবে মহাকর্ষীয় বিকিরণ হবে। ফলত তাদের কক্ষের ব্যাসার্ধ কমবে আর ততই প্রদক্ষিণ বেগের মান বাড়তে থাকবে আর মহাকর্ষীয় বিকিরণের হারও বাড়তে থাকবে। এভাবে যখন তারা পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন বিকিরণের হার সবচেয়ে বেশী হবে। কিন্তু মুশকিল টা হল তরঙ্গ যত এগোয় তার তীব্রতা ব্যাস্তানুপাতে কমতে থাকে এবং এই ধরণের নিউট্রন স্টার বা ব্ল্যাকহোল পৃথিবী থেকে এত দূরে রয়েছে যে আমাদের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সে অতি দুর্বল হয়ে যায়। যদি হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটা রড নেওয়া হয়, মহাকর্ষীয় তরঙ্গের প্রভাবে তার দৈর্ঘ্যের হ্রাস বা বৃদ্ধি হবে একটা নিউক্লিয়াসের ব্যাসের চাইতেও কম। বলা বাহুল্য এত সূক্ষ্ম পরিমাপ করার মত যন্ত্র তৈরী করা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না। অথচ পরীক্ষামূলক প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা ধরেই নিয়েছিলেন মহাকর্ষীয় তরঙ্গ থাকতেই হবে। এর কারণ হল তড়িৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের সাদৃশ্য (analogy)। এই "সাদৃশ্য" জিনিসটা তাত্ত্বিক গবেষণায়

একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যখন একটা নতুন কোন তত্ত্ব বাজারে আসে, তখন দেখা হয় কোন সুপরিচিত পুরনো তত্ত্বের সঙ্গে তার মিল আছে কিনা; থাকলে সেই জানা তত্ত্বের সাহায্যে নতুন অজানা তত্ত্বকে বোঝার চেষ্টা হয়। যেমন রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন সৌরজগতের সঙ্গে সাদৃশ্য বের করে। এই সাদৃশ্য দিয়ে একটা অজানা বিষয়কে বোঝার সুবিধে হয় বটে কিন্তু মিলের পাশাপাশি দুটো বিষয়ের অমিল গুলোকে মাথায় না রাখলে বড়সড় ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ম্যাক্সওয়েল যখন বললেন আলো একধরণের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের সাদৃশ্য খোঁজা হয়েছিল সুপরিচিত শব্দ তরঙ্গের সঙ্গে। স্থিতিস্থাপক শব্দ তরঙ্গ মাধ্যম ছাড়া প্রবাহিত হতে পারেনা। অথচ সূর্য থেকে তো দিব্যি পৃথিবীতে আলো আসছে কোন মাধ্যম ছাড়াই! তাই কল্পনা করা হল এক ভুতুরে মাধ্যম ইথার ব্যাপ্ত রয়েছে সৌরজগতে। ইথারের অস্তিত্বের পক্ষে কোন প্রমাণ না মিললেও, মাইকেলসন ও মর্লীর পরীক্ষায় ইথারের দেখা পাওয়া না গেলেও প্রায় অর্ধ শতক ধরে বিজ্ঞানীরা ইথারকে ত্যাগ করতে পারেননি। শেষে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ ইথারের জল্পনা শেষ করল এবং নিশ্চিতভাবে জানা গেল কোন মাধ্যম ব্যাতিরেকেই তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রবাহিত হতে পারে।

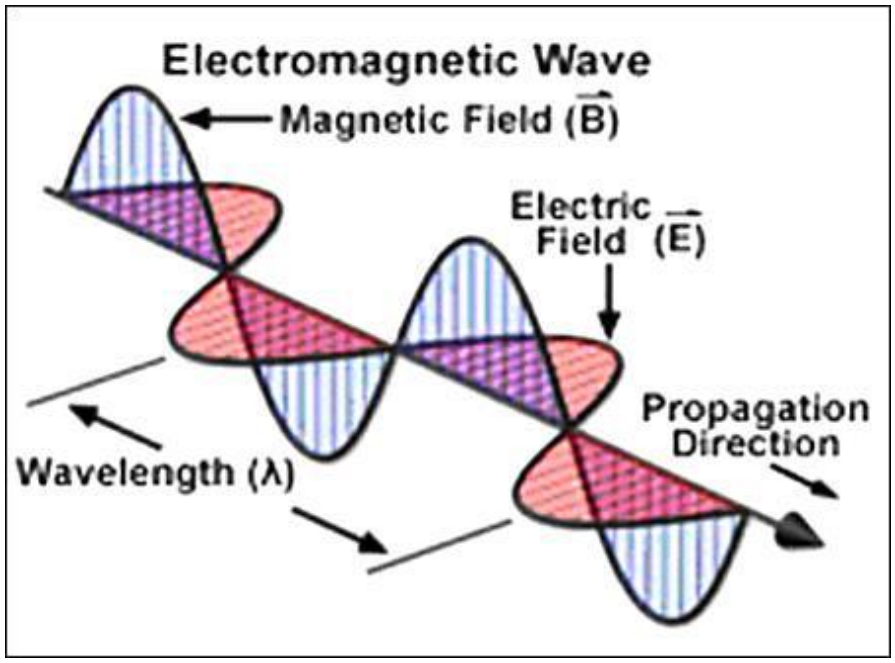

তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র তরঙ্গ প্রবাহের সঙ্গে লম্বভাবে স্পন্দিত হয়। এজন্য তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ হল তির্যক তরঙ্গ।

আরো বছর দশেক বাদে আইনস্টাইন যখন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ হাজির করলেন ততদিনে তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র ও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের কাজ কারবার মোটামুটি জানা হয়ে গেছে। কাজেই এই সাদৃশ্য অনুযায়ী মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের

সঙ্গে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব কল্পনা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা যেটা হল, ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণের তুলনায় আইনস্টাইনের সমীকরণ বহুগুণ জটিল। কাজেই ম্যাক্সওয়েল সমীকরণকে সমাধান করে যেভাবে সহজেই তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বের করা গেছিল আইনস্টাইন সমীকরণের বেলায় তা সম্ভব হল না। তবে দুর্বল মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের জন্য মহাকর্ষীয় তরঙ্গের একটা সরলীকৃত সমাধান আইনস্টাইন বের করে ফেললেন। দেখা গেল মহাকর্ষীয় তরঙ্গও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের মতই আলোর বেগে চলে। শব্দ তরঙ্গ ও তড়িৎ চুম্বকীয় একটা অন্যতম পার্থক্য হল শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে মাধ্যমের অণুগুলো তরঙ্গ প্রবাহের অভিমুখ বরাবর স্পন্দিত হয় আর তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র তরঙ্গ প্রবাহের সঙ্গে লম্বভাবে স্পন্দিত হয়।এজন্য শব্দকে বলা হয় অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ আর তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ হল তির্যক তরঙ্গ। এবার প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক মহাকর্ষীয় তরঙ্গের চরিত্র নিয়ে। আইনস্টাইনের সমীকরণ সমাধান করে অনুদৈর্ঘ্য ও তির্যক দুধরণের উপাংশ পাওয়া গেল। কিন্তু আইনস্টাইন অনতিবিলম্বেই উপলব্ধি করলেন অনুদৈর্ঘ্য উপাংশগুলোর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই, কাজেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গও কার্যত তির্যক তরঙ্গই। আসলে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মর্মই হল আমরা কি ধরণের স্কেল দিয়ে দৈর্ঘ্য মাপছি, কেমন ঘড়ি দিয়ে সময় মাপছি, স্থির আছি না গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছি, তার ওপর বস্তুজগতের নিয়মগুলো নির্ভর করে না। কিন্তু পরীক্ষা করার জন্য বা অঙ্ক করার জন্যেও আমাদের একটা স্কেল, একটা ঘড়ি, একটা গাড়ী বেছে নিতে হয়। আর এই বেছে নিতে গিয়ে এমন কিছু সমাধান বেরোয় যেগুলো বাস্তবে নেই। এডিংটন বলেছিলেন এই ভূতুড়ে তরঙ্গগুলো আলোর বেগে নয়, চিন্তার বেগে চলে।

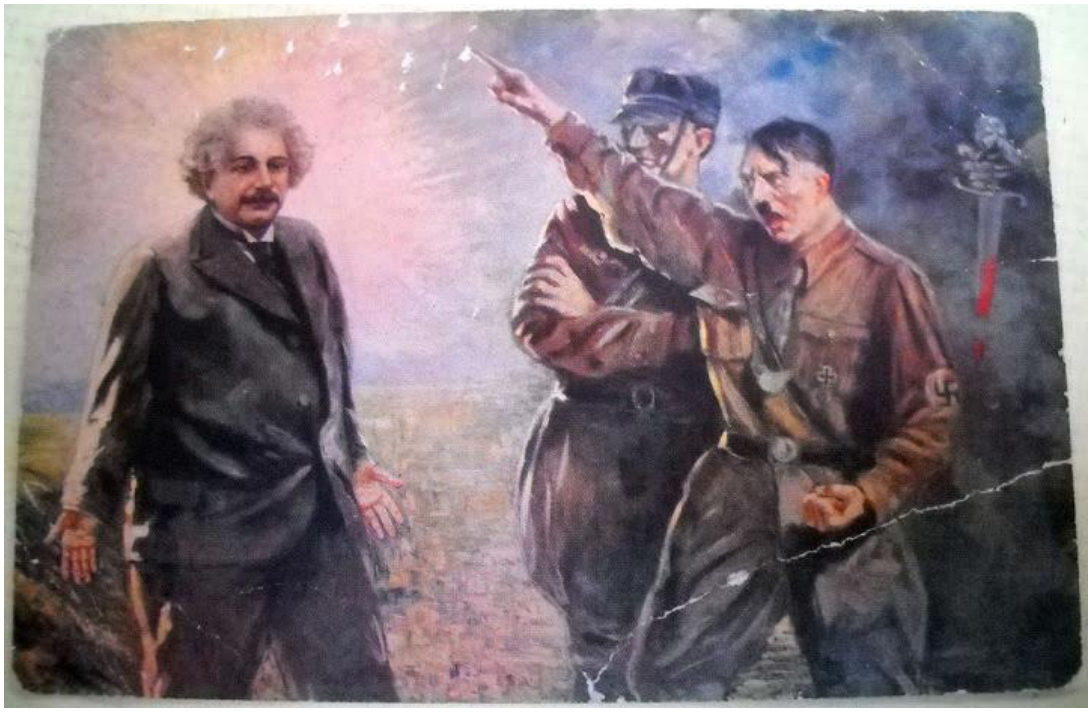

বিশ শতকের অসহিষ্ণুতা। "অ্যান্টি ন্যাশনাল" আইনস্টাইনকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন হিটলার। শিল্পী- মিখাইল ক্যালিফানো।

এই বিখ্যাত উক্তিটির জন্য অনেক সময় এডিংটনকে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের বিরোধী বলা হয়ে থাকে। আসলে এডিংটন তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্য থেকে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের চরিত্র নির্ণয়ের প্রক্রিয়াটিতে সন্দিহান ছিলেন। শুধু এডিংটন নয়, সন্দেহ গ্রাস করেছিল স্বয়ং আইনস্টাইনকেও। এবং এই সন্দেহের বশে তিনি একটা মারাত্মক ভুল করে বসেন। সেই সময় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও একটা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর দেশে উগ্রজাতীয়তাবাদী নাজি পার্টির দাপট। একে ইহুদি তায় শান্তিকামি, যুদ্ধবিরোধী - "অ্যান্টি ন্যাশনাল" হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল! জার্মানীর "আইনস্টাইন বিরোধী লীগ" প্রচার করছিল "আপেক্ষিকতা আর্যরাও জানত। আইনস্টাইন তার ওপর রঙ চড়িয়েছে। এটা অতি বিপজ্জনক ইহুদি চক্রান্ত।" ১৯৩৩ এ হিটলার ক্ষমতা দখল করার পর শুরু হল ইহুদি বিজ্ঞানীদের বিতাড়ন। আইনস্টাইনের বাড়ি ভাঙচুর হল, বই পোড়ানো হল, মাথার দাম ঘোষণা হল। দ্বিতীয় স্ত্রী এলসা তখন কিডনির গুরুতর সমস্যায় আক্রান্ত, তিন বছর পরই যাঁর মৃত্যু হবে। আইনস্টান বাধ্য হলেন জার্মানী ছেড়ে আমেরিকায় আশ্রয় নিতে। যোগ দিলেন প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজে। এখান থেকেই বন্ধু বিজ্ঞানী ম্যাক্স বর্নকে এক চিঠিতে তিনি লিখলেন, *"এক নতুন সহযোগীর সঙ্গে কাজ করে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের কোন অস্তিত্ব নেই।"*

এই নতুন সহযোগীটি ছিলেন নাথান রোজেন, যাঁর সঙ্গে যৌথভাবে তিনি ১৯৩৬ এর পয়লা জুন একটি লেখা পাঠান পদার্থবিদ্যার অন্যতম জার্নাল "ফিজিকাল রিভিউ"এ। লেখাটির নাম ছিল "Do gravitational waves exist?" লেখাটির প্রথম সংস্করণ পাওয়া না গেলেও বর্নকে লেখা উপরোক্ত চিঠিটা থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এই প্রশ্নের উত্তর ছিল "No"। এখন, বিজ্ঞানের জার্নালে কোন লেখা জমা পড়লে সম্পাদক সেটা প্রকাশ করার আগে কোন বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠান, যাঁকে রেফারি বলা হয়। রেফারি লেখাটি ছাপানোর সুপারিশ করতে পারেন বা বাতিল করতে পারেন অথবা লেখকের কাছে ফেরৎ পাঠাতে পারেন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিবর্ধনের পরামর্শ দিয়ে। এই রেফারির পরিচয় সম্পাদক ছাড়া কেউ জানতে পারেন না। আলোচ্য লেখাটি জমা পড়ার পৌনে দুমাসের মাথায় সম্পাদক জন টেট সেটা রেফারির সমালোচনা ও মন্তব্যসমেত আইনস্টাইনকে ফেরৎ পাঠান। আর এতেই বেদম চটে যান আইনস্টাইন। সম্পাদককে পালটা চিঠিতে লেখেন, *"আমি আপনাকে লেখাটা প্রকাশ করার জন্যে পাঠিয়েছিলাম, কোন বিশেষজ্ঞকে পড়ানোর জন্য নয়। আপনার এক্সপার্টের ভুলভাল মন্তব্যের জবাব দেওয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই। লেখাটি আমি অন্য জার্নালে পাঠাব।" ...* এ ঘটনার মাসখানেকের মধ্যেই প্রিন্সটনে পা রাখেন এক টগবগে, ঠোঁটকাটা যুবক, হাওয়ার্ড রবার্টসন। ততদিনে রোজেন চলে গেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নে। আইনস্টাইনের সহযোগী হিসেবে যোগ দিয়েছেন লিওপোল্ড ইনফেল্ড, যিনি নিজেও একজন ইহুদি, নাজি অধিকৃত পোল্যান্ড থেকে বিতাড়িত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছেন। রবার্টসন ইনফেল্ডকে জানান তিনি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বিষয়ে আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত মানেন না। ইনফেল্ড কথাটা তাঁর বসের কানে তুললে আইনস্টাইন বলেন কাকতালীয়ভাবে তিনি আগের রাতেই নিজের গণনার একটা ভুল চিহ্নিত করেছেন। আইনস্টাইন ভুল আঁকড়ে থাকার মানুষ ছিলেন

না। ফলতঃ কয়েক মাস বাদে জার্নাল অফ ফ্রাঙ্কলিন ইনস্টিটিউট এ "On gravitational waves" নামে আইনস্টাইন ও রোজেনের যে লেখাটি প্রকাশিত হয় তার প্রতিপাদ্য হয়ে দাঁড়ায় আগেরটার এক্কেবারে উল্টো, অর্থাৎ মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আছে। ... নাটকের অবশ্য এখানেই শেষ হয়নি। রাশিয়ায় বসে খবরের কাগজ পড়ে রোজেন জানতে পারেন তাঁদের লেখাটি সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্য এক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং একটা সোভিয়েত জার্নালে একটা লেখা ছাপান যেখানে তাঁদের পুরনো অবস্থান অর্থৎ মহাকর্ষীয় তরঙ্গ নেই এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টা অবশ্য সফল হয়নি। যুদ্ধের পর ফেলিক্স পিরানি, হারমান বন্ডি ও ইভর রবিনসনের গবেষণায় রোজেনের মত খারিজ হয়ে গেল। ... আর একটা তথ্য দিয়ে এই পর্বটা শেষ করি। ফিজিকাল রিভিউ-এর নথি থেকে জানা যায় সেই অজ্ঞাতপরিচয় রেফারি, যাঁর সমালোচনামূলক রিপোর্টে আইনস্টাইন খেপে গিয়েছিলেন তিনি আর কেউ না, স্বয়ং রবার্টসন। রেফারি হিসেবে তিনি আইনস্টাইনকে দিয়ে ভুল সংশোধন করাতে পারেননি, কিন্তু সহকর্মী হিসেবে সেই কাজটাই সাফল্যের সঙ্গে উতরে দিয়েছিলেন।

পদার্থবিজ্ঞানের যেকোন শাখাতেই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুটো দিকই গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্ব যেমন পরীক্ষা ও প্রয়োগের পথ দেখায়, ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণ থেকে তেমন তত্ত্বের পরিমার্জন/পরিবর্ধন বা নতুন তত্ত্ব খোঁজার মোটিভেশন পাওয়া যায়। এই মোটিভেশনটারই অভাব ছিল মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বা আরো বড় করে বলতে গেলে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে। বিংশ শতকের প্রথম চতুর্থার্ধেই যে দুটো আবিষ্কার বিজ্ঞানের জগতে আমূল বিপ্লব ঘটিয়েছিল তার একটা যদি কোয়ান্টাম মেকানিক্স হয় তো আরেকটা আপেক্ষিকতাবাদ। পরীক্ষা ও ব্যবহারিক প্রয়োগের বিস্তৃত ক্ষেত্র নিয়ে কোয়ান্টাম মেকানিক্স স্বাভাবিকভাবেই পদার্থবিজ্ঞানীদের অনেক বেশী আকৃষ্ট করেছিল। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের চর্চায় মেতে রইলেন হাতে গোনা কয়েকজন গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ। তাঁরা আবার ছড়িয়ে ছিলেন আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। তার ওপর বেজে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। কাগজ কলম ছেড়ে বন্দুক হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন অনেক গবেষক, অনেকে আবার নেমে পড়লেন প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গবেষণায়। যাঁরা রইলেন, তাঁদের কাছে তখন স্কাইপ বা ইমেল ছিল না যে যুদ্ধের বাজারে তিন মহাদেশে বসে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। ধংসের মধ্যেও অবশ্য বিজ্ঞানের সলতেটা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন ল্যান্ডাউএর নেতৃত্বে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। পরস্পরের চারদিকে ঘূর্ণায়মান নক্ষত্রজুড়ির মহাকর্ষীয় বিকিরণ তিনিই দেখিয়েছিলেন আরেক পদার্থবিদ লিফশিৎজের সাহায্যে। যুদ্ধ থামলে রাষ্ট্রনেতারা আবার সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ও তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য অর্থ খরচ করার কথা ভাবলেন। পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তরের দশকের শেষ পর্যন্ত সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের জন্য বরাদ্দ করা অর্থের একটা বড় অংশ এসেছিল আমেরিকান বায়ুসেনার তহবিল থেকে। ফিজিক্সের কোন তত্ত্ব যে কখন অস্ত্র বানানোর কাজে লেগে যায় তা নিয়ে রাজনীতিকরা নিশ্চিত ছিলেন না। হাজার হোক পরমাণুর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে বোমা বানানো যেতে পারে তার ইঙ্গিত তো বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ থেকেই এসেছিল!

মহাকর্ষীয় তরঙ্গের গবেষণায় নতুন জোয়ার এলো ১৯৫৫ সালে, যখন বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের ৫০ বছর ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ৪০ বছর উপলক্ষে সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে এক বিশেষ বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে মিলিত হলেন বিশ্বের তাবড় আপেক্ষবিদরা। বার্ন শহরটার একটা অন্য তাৎপর্যও আছে। ১৯০৫ এ এই শহরেরই এক পেটেন্ট অফিসের কেরানি ছিলেন আইনস্টাইন, এখানে বসেই বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের বিখ্যাত পেপারগুলো তিনি লিখেছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেবছরই অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে মারা গেলেন আইনস্টাইন। ফলত বার্ন সম্মেলনে তিনি ছিলেন না। তবে তাঁর প্রাক্তন সহযোগী রোজেন ছিলেন। তিনি তখনো মহাকর্ষীয় তরঙ্গের বাস্তবতা নিয়ে সন্দিহান। রোজেন তাঁর ভাষণে বললেন মহাকর্ষীয় তরঙ্গ কোন শক্তি বহন করে না। তাঁর বক্তব্য কার্যত আইনস্টাইনের সঙ্গে সেই ১৯৩৬ এর ছাপা না হওয়া লেখারই প্রতিফলন ছিল। রোজেনের যুক্তি অবশ্য ধোপে টিকল না। দু বছর পর আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা রাজ্যের চ্যাপেল হিলে সাধারণ আপেক্ষিকতা ও মহাকর্ষ নিয়ে আরেকটা সম্মেলনে এক কাল্পনিক পরীক্ষার সাহায্যে রোজেনের যুক্তি খারিজ করে দিয়েছিলেন রিচার্ড ফাইনম্যান। "কাল্পনিক পরীক্ষা", শুনেই বোঝা যাচ্ছে ল্যাবরেটারিতে সম্পন্ন করা হয় না। মনে মনে পরীক্ষাটির পরিকল্পনা করে, যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয় তার রেজাল্ট কি হতে পারে। সেই পরীক্ষার কথায় আসার আগে "সিওরলি ইউ আর জোকিং মিস্টার ফাইনম্যান" বই থেকে দেখে নিই ফাইনম্যান কিভাবে সম্মেলনস্থলে পৌঁছলেন।

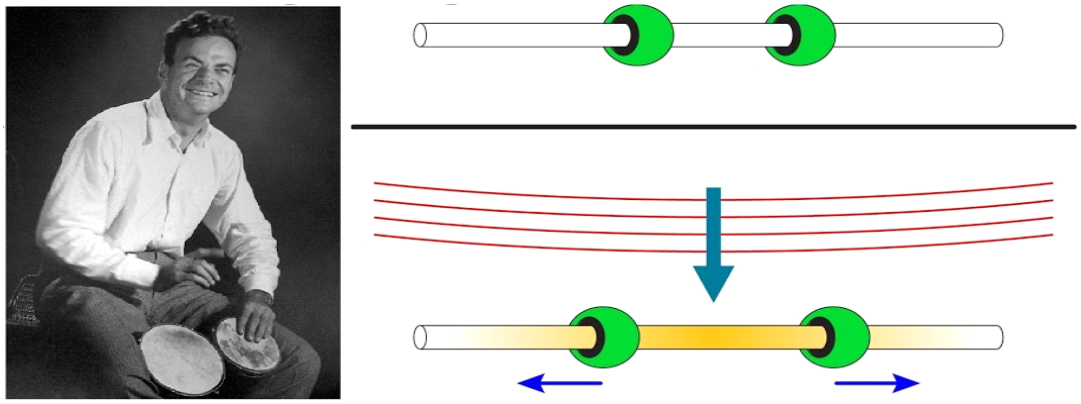

ফাইনম্যানের কাল্পনিক পরীক্ষা। একটা স্পেসটাইমের ঢেউ যদি রডটার দৈর্ঘ্যের সঙ্গে লম্বভাবে বেরিয়ে যায় তাহলে রিং দুটো রডের গা বেয়ে ওঠানামা করবে।

বরাবরের লেটলতিফ ফাইনম্যান নর্থ ক্যারোলিনার এয়ারপোর্টে নামলেন সম্মেলন শুরু হওয়ার একদিন পরে। সঙ্গে আর কেউ ছিল না, সবাই আগের দিন চলে গেছেন। বিমানবন্দরে নেমে তিনি ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গিয়ে স্মার্টলি বললেন ইউনিভার্সিটি যাব। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের তত্ত্বাবধায়ক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কোথায় যাবেন, চ্যাপেল হিলের *ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা* না কি র‍্যালের *স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা?*" বলা বাহুল্য এ প্রশ্নের

কোন জবাব ছিল না ফাইনম্যানের কাছে। এখানে যে দুটো ইউনিভার্সিটি আছে তাইই তিনি জানতেন না। তখন মোবাইল ছিল না যে কোন বন্ধুকে ফোন করে জেনে নেবেন! তবে তাঁর নাম ফাইনম্যান। একটা উপায় বের করে ফেললেন। তত্ত্বাবধায়ককে বললেন, "আচ্ছা গতকাল আপনি একদল আধপাআগলা বুড়োকে দেখেছেন, যারা কোনদিকে না তাকিয়ে খালি নিজেদের মধ্যে বকবক করছিল আর জি-মিউ-নিউ, জি-মিউ-নিউ আওড়াচ্ছিল?" এটুকু শুনেই তত্ত্বাবধায়ক একগাল হেসে বললেন, "বুঝে গেছি স্যার আর বলতে হবে না। এই এনাকে ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা নিয়ে যাও।" বলে রাখা যাক বড়হাতের জি-মিউ-নিউ ($G_{\mu\nu}$) হল আইনস্টাইন টেনসর আর ছোটহাতের জি-মিউ-নিউ ($g_{\mu\nu}$) হল মেট্রিক টেনসর। জেনারেল রিলেটিভিটি নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের ঐ মিউ-নিউ এর চক্করে না পড়ে উপায় থাকে না!

ফাইনম্যান তাঁর কাল্পনিক পরীক্ষায় একটা চোঙাকৃতি রড কল্পনা করেছিলেন। দুটো রিং রডটার সঙ্গে আঁটোসাঁটো ভাবে পরানো আছে। আগেই বলেছি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ তির্যক তরঙ্গ। অর্থাৎ তরঙ্গ যে দিক বরাবর এগোয় তার লম্ব দিকে স্পেস ক্রমান্বয়ে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। এখন এরকম একটা ঢেউ যদি ঐ রডটার দৈর্ঘ্যের সঙ্গে লম্বভাবে যায় তাহলে সে চেষ্টা করবে রডটাকে একবার লম্বা ও সরু আর একবার বেঁটে ও মোটা করতে। এখন রডটা যদি শক্তপোক্ত হয় তবে সে নিজের বিকৃতি আটকাতে পারবে, কিন্তু তখন ঐ রিং দুটো রডের গা বেয়ে ওঠানামা করবে। ফলে রড ও রিং এর মধ্যে ঘর্ষণজনিত তাপ উৎপন্ন হবে। কিন্তু শক্তির সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী এমনি এমনি তাপ তৈরী হতে পারে না। সুতরাং মহাকর্ষীয় তরঙ্গের শক্তিই তাপে রূপান্তরিত হয়েছে। ফাইনম্যান প্রস্তাবিত এই কাল্পনিক পরীক্ষাকে হাতিয়ার করে হারমান বন্ডি এবং আলাদাভাবে জন হুইলার ও জোসেফ ওয়েবার প্রমাণ করলেন রোজেন এবারো ভুল করেছেন, মহাকর্ষীয় তরঙ্গ শক্তিহীন নয়। রোজেন অবশ্য হার মানার পাত্র নন, সত্তর অবধি তাঁর মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বিরোধী জেহাদ চালিয়ে গেছেন।

মহাকর্ষীয় তরঙ্গের পরীক্ষামূলক গবেষণায় পথপ্রদর্শক ছিলেন যোসেফ ওয়েবার।

চ্যাপেল হিলের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৩৮ বছরের এক তরুণ জোসেফ ওয়েবার। মেধাবী এই ইঞ্জিনিয়ার সংসার টানার দায়ে নৌসেনায় চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণ তিনি সামনে থেকে দেখেছেন মার্কিন যুদ্ধজাহাজের লেক্সিটনের ডেক অফিসার হিসেবে। জাপানি দের গোলায় লেক্সিটনের সলিল সমাধি ঘটে, কোনক্রমে রক্ষা পান ওয়েবার। যুদ্ধ থামলে মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিংএর অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন। মাইক্রোওয়েভ স্পেক্ট্রোস্কোপিতে পিএইচডি করার পর তিনি জেনারেল রিলেটিভিটিতে আগ্রহী হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারছিলেন তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি মহাকর্ষীয় তরঙ্গকে হাতেনাতে ধরা দরকার। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মেরিল্যান্ডে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী ২মিটার লম্বা ও ১ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট অনেকগুলো অ্যান্টেনা বানালেন। অ্যান্টেনা থেকে কিছু পজিটিভ সিগন্যাল পেয়ে একটা অ্যান্টেনাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন হাজার কিলোমিটার দূরে শিকাগোতে। দুজায়গাতেই পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। অবশেষে ষাটের দশকের শেষদিকে তিনি ঘোষণা করলেন মহাকর্ষীয় তরঙ্গ পাওয়া গেছে এবং এই তরঙ্গ আসছে একটা নির্দিষ্ট দিক থেকে, যেদিকে কি না আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্র রয়েছে। হুলুস্থুল পড়ে গেল অপেক্ষবিদদের মধ্যে। ওয়েবারের নোবেলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা শুরু হল। অনেক গবেষক পৃথকভাবে ওয়েবার দণ্ড তৈরী করে মহাকর্ষীয় তরঙ্গকে ধরার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওয়েবারের মত রেজাল্ট কেউই পেলেন না। দেখা গেল ওয়েবারের কম্পিউটার প্রোগ্রামিংএ কিছু গোলমাল ছিল। তাছাড়া ওয়েবার ছিলেন আদতে একজন ইঞ্জিনিয়ার। পরীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যকে কিভাবে বিশ্লেষণ করতে হয় তা তিনি জানতেন না বলে অনেকে মনে করেন। সত্তরের দশকের শেষদিক নাগাদ মোটামুটি সকলেই নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে ওয়েবার কোন গ্র্যাভিটেশানাল ওয়েভ ধরতে পারেননি। একমাত্র ব্যাতিক্রম সম্ভবতঃ ওয়েবার নিজে, যিনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নিজের দাবীতে অনড় ছিলেন। ব্যর্থ হলেও একথা কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে ওয়েবারই প্রথম মহাকর্ষীয় তরঙ্গকে পাকড়াও করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর গবেষণার পথ ধরেই তৈরী হয় "লেজার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশানাল ওয়েভ অবজার্ভেটরি" বা "লাইগো" যা আরো অর্ধশতক পার করে সাফল্যের মুখ দেখবে। এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে লাইগো যখন ঘোষণা করল মহাকর্ষীয় তরঙ্গের প্রত্যক্ষ প্রমাণ তারা পেয়েছে তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ওয়েবারের স্ত্রী ভার্জিনিয়া ট্রিম্বল। যখন প্রশ্ন করা হয় তাঁর স্বামী সত্যিই গ্র্যাভিটেশানাল ওয়েভ দেখতে পেয়েছিলেন কি না, ট্রিম্বল বলেন, "আমি জানি না"। ওয়েবারের গবেষণায় অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। লাইগোর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কিপ থর্ণ দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেন, ওয়েবার ই তাঁদের পথপ্রদর্শক। লাইগোর প্রসঙ্গে আসার আগে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণের কথা বলে নিই।

সত্তরের দশকে ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটির দুজন বিজ্ঞানী রাসেল হালস এবং জোসেফ টেলর ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের পোর্তো রিকোয় ৩০০ মিটার ব্যাসের একটা রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে একটা পালসারের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ

করছিলেন। পালসার একধরণের নিউট্রন স্টার, তার ওপর একটা পেল্লায় চুম্বকও বটে। এই প্রচণ্ড শক্তিশালী ঘূর্ণায়মান চুম্বক নির্দিষ্ট সময় অন্তর তড়িৎ চুম্বকীয় পালস ছাড়ে।

জোসেফ টেলর এবং রাসেল হালস

এই তড়িৎ চুম্বকীয় পালস পৃথিবীর দিকে এলে টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখা যায় এবং পালস আসার সময়ের ব্যবধান থেকে বলে দেওয়া যায় ঐ পালসারটির বেগ কত। কারণ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক নির্ভর করে তরঙ্গের উৎস ও দর্শকের আপেক্ষিক বেগের ওপর। একে বলে ডপলার এফেক্ট। যেমন স্টেশনে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে স্রেফ ট্রেনের বাঁশি শুনে আমরা বলে দিতে পারি ট্রেনটা আমাদের দিকে আসছে না দূরে সরে যাচ্ছে। এইভাবে পালস মেপে হালস ও টেলর দেখলেন এই পালসারটা ১০ লক্ষ কিলোমিটার দূরত্বে প্রায় সমান ভরের আরেকটা নিউট্রন স্টারের সঙ্গে জুড়ি বেঁধে ঘুরছে এবং তাদের মধ্যের ব্যবধান ক্রমশ কমছে, বছরে সাড়ে ৩ মিটার করে। অঙ্ক কষে দেখা গেল কক্ষপথের এই সংকোচনের হার মহাকর্ষীয় বিকিরণের জন্য যা হওয়া উচিৎ তার সাথে এক্কেবারে মিলে যাচ্ছে। হালস ও টেলর এর এই পর্যবেক্ষণই মহাকর্ষীয় তরঙ্গের প্রথম প্রমাণ, যদিও পরোক্ষ। তাঁরা এজন্য ১৯৯৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। একটা তুলনার জন্য বলে রাখা যাক হালস টেলর জোড়ার মহাকর্ষীয় বিকিরণের হার ১ এর পিছনে ২৪ টা শূন্য বসালে যা হয় তত ওয়াট, অর্থাৎ সূর্যের তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের ২% এবং দুরত্ব কমিয়ে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এদের সময় লাগবে ৩০ কোটি বছর।

রেইনার ওয়েইস ও কিপ থর্ণ

হালস ও টেলরের পর্যবেক্ষণ মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব নিশ্চিত করেছিল। এবার বাকি রইল তাকে হাতেনাতে ধরা। কিন্তু গ্রাভিটেশানাল ওয়েভ নামক বেড়ালটার গলায় ঘন্টা কে বাঁধবেন? ওয়েবার সে কাজে সাহস করে এগিয়ে যেতেই আরো অনেকে হাত লাগালেন। তাঁদের একজন হলেন রেইনার ওয়েইস। বার্লিনের এক অভিজাত ইহুদি চিকিৎসক ও এক জার্মান অভিনেত্রীর সন্তান ছিলেন ওয়েইস। কিন্তু শৈশবেই তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মেও কমিউনিস্ট রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন ওয়েইসের পিতা। একে ইহুদি, কমিউনিস্ট, লাভ জিহাদ করে খাঁটি আর্যবংশীয় মহিলাকে বিয়ে করা, তার ওপর এক নাজি ডাক্তারের ভুল অপারেশানের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করলেন। "দেশদ্রোহী" হওয়ার জন্য আর কি চাই! তখনো হিটলার সরাসরি ক্ষমতা দখল করেনি। তাই প্রাণ নিয়ে চেকস্লোভাকিয়ায় পালিয়ে আসতে সক্ষম হন, সেখান থেকে আমেরিকায়। ওয়েইস প্রথমে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করলেও পরে ফিজিক্সের প্রতি আকৃষ্ট হন। দুটো বিশাল মাপের মহাজাগতিক পর্যবেক্ষণের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন ওয়েইস। একটা যদি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ হয় তো আরেকটা হল মহাজাগতিক ক্ষুদ্রতরঙ্গ পশ্চাৎপট বিকিরণ (cosmic microwave background radiation) বা সি এম বি আর, যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক বিশ্বতত্ত্ব (cosmology)। ষাটের দশকের শেষভাগে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে (এম আই টি) স্নাতকোত্তরের ছাত্রদের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ পড়াচ্ছিলেন ওয়েইস। কিন্তু ওয়েবারের লেখা বই থেকে মহাকর্ষীয় বিকিরণ পড়াতে গিয়ে মুশকিলে পড়লেন। ওয়েবারের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরার পদ্ধতি নিজেরই মাথায় ঢুকছিল না তো পড়াবেন কি? তাই বিকল্প পদ্ধতি নিয়ে নিজেই ভাবনাচিন্তা করতে লাগলেন। ওয়েইসের কল্পনাটা অনেক সহজ। ধরা যাক হাঁদা আর ভোঁদা মাথায় মাথা ঠেকিয়ে ইংরেজি এল অক্ষরের আকারে মাঠের ওপর শুয়ে আছে। এবারে পৃথিবী ফুঁড়ে যদি একটা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বেরিয়ে যায় তাহলে তরঙ্গের পর্যায়কালের এক অর্ধে হাঁদা লম্বা আর ভোঁদা বেঁটে হয়ে যাবে। অন্য অর্ধে ঠিক উল্টোটা ঘটবে। এখন দৈর্ঘ্যের এই অতিক্ষুদ্র হ্রাসবৃদ্ধি মাপা যাবে কিভাবে? এত সূক্ষ্ম পরিমাপ আলো ছাড়া কারো সাধ্য নয়। ১৯৬২ তেই অবশ্য দুই সোভিয়েত পদার্থবিদ গার্টেনস্টাইন ও পুস্তোভিৎ আলোর ব্যাতিচার (interference) ধর্মকে কাজে লাগিয়ে মহাকর্ষীয় তরঙ্গকে পাকড়াও করার দাওয়াই বাৎলেছিলেন।

অনেক বিজ্ঞানী অবশ্য মনে করতেন না যে আলোর ব্যাতিচারের সাহায্যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গকে ধরা যাবে। তাঁদের অন্যতম ছিলেন কিপ থর্ণ। ইন্টারস্টেলার খ্যাত ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (ক্যালটেক) এই অধ্যাপকের মত বদলায় ১৯৭৫ এ। ওয়েইস তখন তাঁর প্রস্তাবিত যন্ত্র তৈরীর জন্য দরবার করছেন মার্কিন সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কাজে। তাঁর দাবী বিবেচনার জন্য নাসার এক প্যানেলের সামনে বক্তব্য রাখতে ওয়েইসের আমন্ত্রণে ওয়াংশিংটন ডি সি তে হাজির হয়েছিলেন থর্ণ। শহরে থাকার মত হোটেল না পেয়ে তাঁরা দুজন একটা ঘর শেয়ার করেছিলেন। ওয়েইসের কথায়, *"সত্যি বলতে কি আমি একটু চিন্তায় ছিলাম, লোকটাকে তো আমি চিনতামই না। দেখে অবশ্য ভীষণ মজার মনে হয়েছিল। তারপর তো সারারাত তর্ক-বিতর্কে কেটে গেল। আমরা সে রাতে ভোর চারটের আগে ঘুমোইনি। থর্ণের মাথায় তখন ঘুরছিল, ক্যালটেকে গ্র্যাভিটি নিয়ে কি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যেতে পারে!*

শেষমেশ সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালো যে ব্যাতিচার মাপন (interferometry) পদ্ধতিতে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরার কাজই করতে হবে।"

থর্ণ একা নন, ব্যাতিচার মেপে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সনাক্তকরণ (interferometric gravitational wave detection) ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। এম আই টি ও ক্যালটেক ছাড়াও হাইন বিলিংএর নেতৃত্বে জার্মানীর গারচিং-এ এবং রোনাল্ড ড্রেভরের নেতৃত্বে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় তৈরী হল মডেল ইন্টারফেরোমিটার। অনেক ভাবনাচিন্তা, তর্ক-বিতর্ক, সেমিনারের পর ওয়েইস, থর্ণ ও ড্রেভর আমেরিকার ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের (এনএসএফ) কাছে লাইগো প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়ে ২৭২ মিলিয়ন ডলার অনুদান চাইলেন। অনুদানের অঙ্কের দিক দিয়ে এটাই ছিল এনএসএফের বৃহত্তম প্রকল্প। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন মহল থেকে বাধা এল। অন্যান্য ক্ষেত্রের গবেষকরা বিশেষতঃ জ্যোতির্বিদরা মনে করেছিলেন তাঁদের ভাগের অনুদানে টান পড়বে। অনেকের মতেই এটা ছিল স্রেফ অপচয়। ওয়েবারের ইতিবৃত্ত তাঁদের অবস্থানকে জোরালো করেছিল। থর্ণ-ওয়েইস-ড্রেভররা লড়াই চালিয়ে গেলেন। থর্ণ তো বাজিই ধরে বসলেন চলতি শতকের শেষেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরা যাবে! অনেক টালবাহানার পর এনএসএফের অনুমোদন মিলল। ১৯৯৪ সালে ওয়াশিংটন প্রদেশের হ্যানফোর্ডে আর একবছর পর লুইজিয়ানা প্রদেশের লিভিংস্টোনে প্রকল্পের ভিত খোঁড়া শুরু হল। ওয়েইসরা অবশ্য সতর্ক করে দিয়েছিলেন, প্রথম অবতারেই লাইগো তার কাজে সফল নাও হতে পারে। প্রথমবারের ভুল ত্রুটি মেরামত করে উন্নততর লাইগো তৈরী হবে।

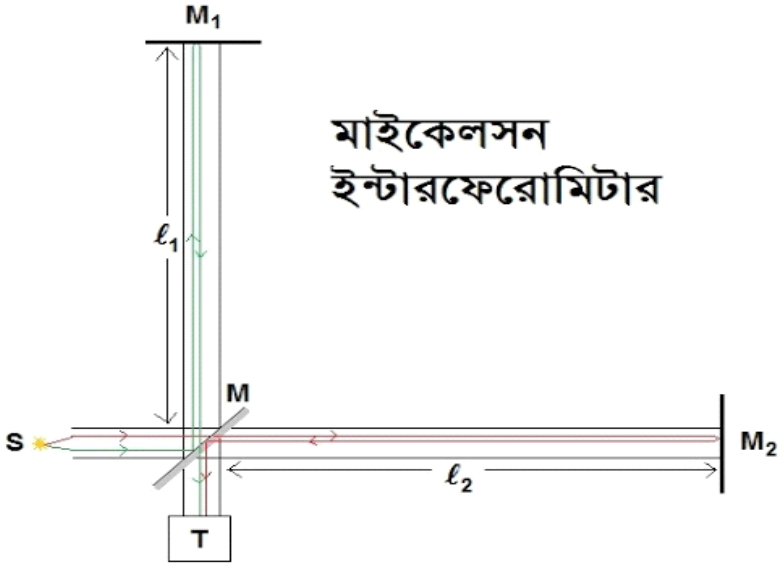

এইবার একটু লাইগোর ইন্টারফেরোমিটারের বর্ণনা দেওয়া যাক। ছবিতে দেখা যাচ্ছে L আকারের যন্ত্রটির দুটি বাহু রয়েছে যাদের দৈর্ঘ্য l_1 ও l_2 । M হল রশ্মিবিভাজক। ছোট্ট লেজার উৎস S থেকে আসা আলোকরশ্মিগুলি অর্ধেক প্রতিফলিত হয়ে M_1 আয়নার দিকে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে M হয়ে টেলিস্কোপ T তে পৌঁছচ্ছে। এরকম একটা রশ্মিকে সবুজ রঙে দেখানো হয়েছে। বাকি অর্ধেক রশ্মি M এর মধ্য দিয়ে প্রতিসৃত হয়ে দ্বিতীয় আয়না M_2 থেকে প্রতিফলিত হয়ে M থেকে ফের প্রতিফলিত হয়ে টেলিস্কোপে পৌছচ্ছে। এরকম একটা রশ্মিকে লাল রঙে দেখানো হয়েছে। টেলিস্কোপে চোখ রেখে এই দুই রশ্মির ব্যাতিচারের ধরণ থেকে বোঝা যায় রশ্মিদুটোর দশার পার্থক্য। দশা আবার নির্ভর করে আলোকরশ্মির অতিক্রান্ত পথের ওপর। দেখা যাচ্ছে সবুজ আর লাল রঙে চিহ্নিত রশ্মিটাদুটোর অতিক্রান্ত পথের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $2l_1$ ও $2l_2$ । এখন একটা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ যদি কম্পিউটার স্ক্রিনের সঙ্গে লম্বভাবে বেরিয়ে যায় তবে তরঙ্গের পর্যায়কালের এক অর্ধে l_1 কমে যাবে ও l_2 বেড়ে যাবে এবং পরের অর্ধে উল্টোটা হবে। তাহলে টেলিস্কোপে ব্যাতিচারের ধরণ বদল দেখেই তা ধরা পড়বে। এইরকম ইন্টারফেরোমিটার প্রথম বানিয়েছিলেন অ্যালবার্ট আব্রাহাম মাইকেলসন, উনিশ শতকে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে মাইকেলসন ইন্টারফেরোমিটার স্মরণীয় হয়ে আছে এডওয়ার্ড মর্লীর সঙ্গে সেই বিখ্যাত পরীক্ষার জন্য যাতে প্রমাণিত হয়েছিল "ইথার বলে কিছু নেই" এবং "আলোর বেগ দর্শকের গতির ওপর নির্ভর করে না"। মাইকেলসন ছিলেন প্রথম আমেরিকান যিনি বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। সওয়া শতক পরে হয়ত আরেকটা নোবেল আসতে চলেছে মাইকেলসনের নকশাকে কাজে লাগিয়ে।

আসল যন্ত্রটা অবশ্য ওপরে যা বলা হল তার চেয়ে অনেক বেশী জটিল। ইন্টারফেরোমিটারের ৪ কিলোমিটার লম্বা বাহুদুটোকে মাটি খুঁড়ে শোয়ানো হল। আগেই বলা হয়েছে পৃথিবীতে যদি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ পৌঁছায়ও তার শক্তি হবে অতি ক্ষীণ। সেই তরঙ্গকে চিহ্নিত করার কাজটাও তাহলে হতে হবে অতিশয় সূক্ষ্ম। হরেক রকম ছোটখাটো প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট ঘটনা পর্যবেক্ষণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। সমুদ্রের তুফান থেকে স্বল্পশক্তির ভূমিকম্প, রাস্তায় ভারী ট্রাকের ব্রেক কষা থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহে সামান্য উত্থান পতন - নানাবিধ কাণ্ডকে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সঙ্কেত বলে ভুল করার সম্ভাবনা সাড়ে পোনেরো আনা। কাজেই এই সমস্ত উপদ্রবের প্রভাব থেকে যন্ত্রকে আড়াল করতে হাজারটা ছোটখাট রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখতে হয়েছিল। তাছাড়া দুটো ইন্টারফেরোমিটার বসানো হয়েছিল, একটা হ্যানফোর্ডে, আরেকটা লিভিংস্টোনে। উড়োজাহাজে উঠলে একটা জায়গা থেকে আরেকটায় যেতে সময় লাগে সাড়ে তিনঘন্টা। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ অবশ্য এক সেকেণ্ডের দশ হাজার ভাগেরও কম সময়ে এই পথ পাড়ি দিতে পারে। তাহলে ঐ সময়ের ব্যবধানে দুটি যন্ত্রে যদি একই ধরণের সঙ্কেত পাওয়া যায় তবে তা নিশ্চিতভাবেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ, স্থানীয় উপদ্রব নয়। সুতরাং কর্মযজ্ঞটা যে ছোটখাটো কিছু ছিল না বেশ বোঝা যাচ্ছে। সব দিক সামলে ২০০১ সালে লাইগোর যাত্রা শুরু হল। ৯ বছর ধরে মহাকাশের দিকে চেয়ে থেকে ২০১০ এ ঝাঁপ ফেলল লাইগো, সাময়িকভাবে যদিও। যেমনটা বলা হয়ছিল এই সময়ে বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরিকল্পনার ভুলত্রুটি গুলো দেখলেন, এবং তাকে আরো

শক্তিশালী ও নিখুঁত করার ছক কষলেন। পাঁচবছর ধরে সে কাজ চলার পর উন্নততর লাইগোর উদ্বোধনের দিন ধার্য হল ২০১৫-র ১৮ই সেপ্টেম্বর। কিন্তু অতিথি কবেই বা তিথিনক্ষত্র মেনে এসেছে! উদ্বোধনের চারদিন আগে, যখন প্রস্তুতি সম্পূর্ণ, শেষবারের মত সবকিছু মিলিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে, তখনি দুই যন্ত্র থেকেই ধরা পড়ল সেই বহু আকাঙ্খিত সঙ্কেত। প্রথমটায় কেউ বিশ্বাস করেননি যে এটা আসলে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ।

লাইগো। আকাশ থেকে তোলা ছবি।

বিশ্বাস না করার কারণও ছিল। বছর দেড়েক আগে সি এম বি আর সনাক্তকরণে নিযুক্ত বাইসেপ ২ নামক রেডিও টেলিস্কোপটি ঘোষণা করে মহাবিস্ফোরণজাত আদিম মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সনাক্ত করা গেছে। বছরখানেকের মধ্যেই অবশ্য সে দাবী প্রত্যাহার করা হয়। যাকে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বলে ভুল করা হয়েছিল সেই সঙ্কেতের জন্য দায়ী নাকি কসমিক ডাস্ট। সন্দেহের আরেকটা কারণ হল "ব্লাইন্ড ইঞ্জেকশান গ্রুপ"। টিম লাইগোর মধ্যে এই গোষ্ঠীটির কাজ ছিল সোজা বাংলায় কাঠি করা। অর্থাৎ কৃত্তিম সঙ্কেত তৈরী করে গবেষকদের বিভ্রান্ত করা, তাঁরা সঙ্কেতটিকে কৃত্তিম বলে বুঝতে পারছেন কি না তার পরীক্ষা নেওয়া। প্রথম পর্যায়ের লাইগোর কাজ যখন শেষের মুখে তখনও এরকম একটা সঙ্কেত পাওয়া গিয়েছিল। কোন জায়গা থেকে ঐ "মহাকর্ষীয় তরঙ্গ" আসছে তাও চিহ্নিত করা গেছিল। তাঁদের রেজাল্ট জার্নালে প্রকাশের জন্য পাঠানো মুখে জানা গেল ঐ সঙ্কেত আসলে ব্লাইন্ড ইঞ্জেকশন গ্রুপের কীর্তি। এবারে অবশ্য তেনারা প্রথমেই হাত তুলে নিলেন। ইতিমধ্যে কয়েকটা ইউরোপীয় দেশের উদ্যোগে ইতালিতে "ভার্গো ইনটারফেরোমিটার" স্থাপিত হয়েছে। পরস্পরের তথ্য বিশ্লেষণের জন্য হাতে হাতে হাত মিলিয়েছে। পাঁচ মাস ধরে বিশ্লেষণের পর লাইগো ও ভার্গোর যৌথ টিম নিঃসন্দেহ হল ১৪ই সেপ্টেম্বরের সঙ্কেতটা "ডক্টরড" নয়। অবশেষে ২০১৬র ১১ই ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষিত হল মহাকর্ষীয়

তরঙ্গ ধরা পড়েছে। এই তরঙ্গের উৎপত্তি অবশ্য আজ নয়। ১৩০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে দুটো ব্ল্যাকহোল পরস্পরের চারদিকে পাক খেতে খেতে প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে মিশে গিয়ে একটা ভারী ব্ল্যাকহোল তৈরী করেছিল অতদিন আগে। সংঘর্ষের আগে ব্ল্যাকহোলদুটোর ভর ছিল সূর্যের ভরের ২৯ ও ৩৬ গুণ। আর যে নতুন ব্ল্যাকহোলটা তৈরী হল তার ভর সূর্যের ভরের ৬২ গুণ। বাকি ৩টে সূর্যের সমান ভর বেরিয়ে এলো মহাকর্ষীয় বিকিরণের আকারে। সেই বিকিরণ ১৩০ কোটি বছর মহাশূণ্যে পাড়ি দিয়ে আমাদের গ্রহে পৌঁছালো।

"মহাবিশ্বে, মহাকাশে, মহাকাল মাঝে,
আমি মানব একাকী বিস্ময়ে ভ্রমি বিস্ময়ে ..."

মানুষ অবশ্য শুধু বিস্ময়ে ভ্রমণ করেনি, সে জানতে চেয়েছে মহাবিশ্বকে, জয় করতে চেয়েছে মহাকাল কে। এতদিন মহাকাশকে দেখার জন্য তার চোখ ছিল, যা দিয়ে সে আলোর সঙ্কেত দেখতে পেত। এবার পেল কান, মহাকর্ষের সঙ্কেত শোনার জন্য। কিপ থর্ণের কথায়, "প্রথমবারের জন্য মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সনাক্ত করা কখনোই লাইগোর মূল লক্ষ্য ছিল না। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল মহাবিশ্বকে দেখার জন্য একটা নতুন জানালা খুলে দেওয়া।" যেমন ব্ল্যাকহোল জুড়ির পরিক্রমণ ও সংঘর্ষ, যা এতদিন তাত্ত্বিক গবেষণারই বিষয় ছিল, এবার তা প্রমাণিত হল মহাকর্ষীয় তরঙ্গের নিয়ে আসা বার্তায়। আমাদের দুটো কান মাথার দুপাশে রয়েছে যাতে আমরা শ্রবণক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারি। মহাবিশ্বের বার্তা আরো ভালো করে শোনার জন্যেও আমাদের অ্যান্টেনা গুলোকে দূরে দূরে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। আমেরিকার লাইগো ও ইতালির ভার্গো ছাড়াও একটা ইন্টারফেরোমিটার বসেছে জাপানে। আরেকটা ইন্টারফেরোমিটার লিসা (লেজার ইন্টারফেরোমিটার স্পেস অ্যান্টেনা) কে পাঠানো হয়েছে মহাকাশে। শিকে ছিঁড়েছে ভারতের কপালেও। আমরা যদি পৃথিবীর ম্যাপের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো আমেরিকার ঠিক উল্টোদিকে আছে আমাদের দেশ। তাই আমেরিকার দুটো লাইগোর মধ্যে একটাকে ভারতে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা চলছে। আমাদের দেশের কর্ণধারেরা এতদিন দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন আর গণেশের ঘাড়ে প্লাস্টিক সার্জারি করে হাতির মুণ্ডু লাগানোর দৃশ্য দেখছিলেন স্বপ্নে। লাইগোর ঘোষণার পর স্যোসাল মিডিয়ায় প্রবল হই হট্টগোলে তাঁদের কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল। তড়িঘড়ি লাইগো-ইণ্ডিয়া প্রকল্পে সবুজ সঙ্কেত দিয়ে দিলেন। ভারতীয় গবেষকরা মহাকর্ষীয় তরঙ্গের গবেষণায় বহুদিন থেকেই যুক্ত আছেন। ভি বিশ্বেশ্বর, সঞ্জীব ধুরন্ধর, তরুণ সৌরদীপরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। লাইগো-ইণ্ডিয়া বাস্তবায়িত হলে মহাবিশ্বের সাধনায় ভারতের আসনটা আরো পোক্ত হবে।

শেষ করব আইনস্টাইনকে দিয়েই। এই বছরেই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের একশো বছর হচ্ছে। ধরা যাক কিপ থর্ণ প্ল্যানচেট করে আইনস্টাইনকে ডেকেছেন। (প্ল্যানচেট বিজ্ঞানসম্মত কি না প্রশ্ন তুললে নাস্তিক বলে চাপাতি চালানো হবে) তাঁদের বার্তালাপটা নিচে তুলে দেওয়া হল -

কার্টুন - অনির্বাণ সেনগুপ্ত

কিপ থর্ণ: *হ্যালো মিস্টার আইনস্টাইন! আমরা গ্র্যাভিটেশানাল ওয়েভ খুঁজে পেয়েছি। জেনারেল রিলেটিভিটি যুগ যুগ জিও!*

আইনস্টাইন: *ওহ! কনগ্র্যাটস!*

কিপ থর্ণ: *আপনি এত কুল কেন বস? অ্যাত বড় একটা ব্যাপার ...*

আইনস্টাইন: *তোমাদের কাছে বড় হতে পারে ইয়ং ম্যান, আমার কাছে নয়।*

কিপ থর্ণ: *আচ্ছা যদি ধরুন একবছর পর বোঝা যায় আমরা ভুল? যে সিগন্যালটা পেয়েছি সেটা একটা ঢপ, গ্র্যাভিটেশানাল ওয়েভ পাওয়া যায়নি? তখন কি বলবেন?*

আইনস্টাইন: *দেন আই উইল বি সরি ফর দ্য ডিয়ার লর্ড। মাই থিয়োরি ইজ কারেক্ট!*

[হস্তীদার একটা ফেসবুক পোস্টে নবকলম ও আরো অনেকের সঙ্গে আলোচনার সময়ই বিষয়টা নিয়ে বাংলায় বিস্তারিতভাবে লেখার কথা মাথায় আসে। তারপর আমার মত হদ্দ কুঁড়ে যে জিনিসটা নামাতে মাস পার করে দেবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! এর মধ্যে এ নিয়ে অনেক কাগজে, পত্রিকায়, ইন্টারনেটে অনেক লেখালিখি হয়ে গেছে। তবু লিখে যখন ফেলেইছি আর প্রত্যয় আর সিংদা মাঝে মাঝে খোঁচা দিচ্ছে চর্যাপদে না লেখার জন্যে ... তাই লেখাটা দিয়েই দিলাম। লেখার জন্য অনেক বই, পত্রিকা, ওয়েবসাইটের সাহায্য নিয়েছি। কয়েকটা উল্লেখ করলাম। কিছু ভুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে নাজমূল হক ও প্রশান্ত কর। ছবিগুলো বেশীরভাগই ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করেছি। আর কার্টুনটা এঁকে দিয়েছে অনির্বাণ।]

১। উইকিপিডিয়ার বিভিন্ন পেজ, যেমন *Gravitational Waves, Sticky bead argument, LIGO.*

২। R. M. Wald, *General Relativity*, Pearson Education.

৩। অমল দাশগুপ্ত, *আলোর দিশারী আইনস্টাইন*, অয়ন পাবলিশার্স।

৪। F. W. Dyson, A. S. Eddington, C. Davison, *A determination of the deflection of light by the Sun's Gravitational Field from observations made at the Total Eclipse of May 29, 1919*, The Royal Soceity Publishing.

৫। Daniel Kennefick, *Travelling at the Speed of Thought: Einstein and the Quest for Gravitational Waves*, Princeton University Press.

৬। David Lindley, *Focus: A Fleeting Detection of Gravitational Waves*, Phys. Rev. Focus, 16, 19 (2005)

৭। Shirley K. Cohen, *Interview of Rainer Weiss*, California Institute of Technolodgy Archives (2000).

৮। Nicola Twilley, *Gravitational Wave Exists: The Inside Story of How Scientists Find Them*, The New Yorker (2016)

৯। Emanuele Berti, *The First Sounds of Merging Black Holes*, Physics (2016)

মিলির ইন্টারভিউ

অতিথি লেখক

মার্চ ২৭, ২০১৬

[এই পর্বে লিখছেন সীমা ব্যানার্জী-রায়। পেশায় পরিবেশ বিজ্ঞানী, নেশায় লেখিকা। তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং ওয়েবজিনে।]

মিলি এখন পুরোপুরি আঠারো বছরের এক যুবতী। সবে হাইয়ার সেকেন্ডারী পাশ করেছে। এক পিঠ কালো মেঘের মতন কোঁকড়ানো চুল আর পাতলা ছিপছিপে চেহারায় একটা খুব মিষ্টিসুলভ হাবভাব আছে। স্কুলের গণ্ডি পার হবার সাথে সাথে মায়ের সর্ব প্রথম চিন্তা শুরু হল - এখনই মেয়েকে ভালো পাত্রের হাতে তুলে দিতে হবে। যেখানে যত আত্মীয় স্বজন ছিল সবাইকে বলা হল ভালো পাত্র সন্ধানের জন্য। যদি তাদের সন্ধানে কোনো ভালো পাত্র থাকে তো তাঁদের যেন চটজলদি জানানো হয়। মিলি বিয়ের নামে কখনোই আপত্তি করেনি। কারণ সে জানত, বিয়ে না করলে মা-বাবার বোঝা হয়ে সারাজীবন থাকা মোটেই সুখের নয়। তার একটাই শুধু আপত্তি ছিল, বিয়ের পরে কলকাতার বাইরে না যাওয়ার।

মনে যদিও একটু ইচ্ছে ছিল বৈকি যে, অন্য বন্ধুদের মত সে ও অন্ততঃ কলেজের একটা ডিগ্রী হাতে পাক। মা - এর আসলে খুব চিন্তা ওর কালো রং এর জন্য। আজকালকার দিনেও মেয়েদের কালো রং নিয়ে কত চিন্তা ভাবনা করেন মা-বাবা ও বাড়ির পরিজনেরা। তার বাবা কিন্তু এরকম না। বাবার খুব গর্ব মিলিকে নিয়ে। রং কালো হলেও বাবা-কে বলতে শোনে, “আমার মিলির মুখের মতন একটা মুখ দেখাও দেখি। পারবে না। তার ওপরে অত সুন্দর সেতার বাজায় যখন আমরা নিজেদের মেয়েকেই দেখি অবাক হয়ে, কি গো দেখি না?”। বাবার জ্বলজ্বল করা মুখে মা কে এইসব কথা বলতে শুনে তার মনটা আনন্দে টই টুম্বুর হয়ে ওঠে। মা ও তো মেয়ে, তাও কেন যে সাত তাড়াতাড়ি নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে চান, সে বুঝে উঠতে পারে না একদম। কিন্তু বাবা একেবারে মা-এর উলটো মেরু। বাবা একেবারেই দলছুট। অনেক আশা ছিল ওকে নিয়ে ওর বাবার। তাই সে বাবাকে ছেড়ে দূরে কোথাও যেতে চাইত না। ওকে সবাই 'ড্যাডিস গার্ল' বলেই খ্যাপায়।

সবে কলেজে যেতে শুরু করেছে মিলি। তার প্রথম কলেজ জীবন; তাই বাড়ির ছাদে মা -বাবা ও আত্মীয়পরিজন মিলে বেশ একটা বড়সড় পার্টির ব্যবস্থা করেছেন। খোলা ছাদে ঝিরিঝিরি বসন্তের হাওয়া। বাঁধ ভেঙেছে চাঁদের হাসি, তার সঙ্গে মিশে গেছে অতিথিদের হাসি-মস্করা। রেলিং আর আলসের গায়ে ঝিকিমিকি টুনি বালবের তিরিক তিরিক নাচ। তার নাম লেখা বাহারি কেক কাটা হল। তারপর বিরিয়ানি- ফিস ফ্রাই-চিকেন কারি গন্ধে একেবারে ছাদের চারিদিক ম ম করছে। বেশ চলছিল দিনগুলো।

কিন্তু তারপরেই জীবনের প্রথম ইন্টারভিউ এলো ভবানীপুর থেকে । মিলি ভাবল- 'বাঁচা গেল', খুবই কাছে ওর বিয়ে হবে। যখন খুশী তখনই বাবা-মায়ের কাছে চলে আসতে পারবে। ইন্টারভিউর দিন চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ি ঘরে ঢুকে সকলকে নমস্কার জানিয়ে বসল। যাদের যা প্রশ্ন করার সবেরই উত্তর দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেদিন বেশ নার্ভাস লাগছিল মিলির। বাবার বেশ কিছু টাকাও গচ্চা গেল তাদের ডিশ ভরে মিষ্টি খাওয়াতে। এর কদিন পর মিলির বাবা-মা গেলেন পাত্রের বাড়ি। বাবার যদিও বা একটু পছন্দ হয়েছিল পাত্রের হাইলি কোয়ালিফিকেশন এর দিক থেকে কিন্তু মা একেবারেই বেঁকে বসলেন। বাড়িতে এসে বাবা -মায়ের তুমুল তর্ক শুরু হল। শেষে সবার কথার জেরায় বাবা সেই ঘর থেকে গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। তখন মা-এর মুখে পাত্রের বিবরণ শুনে সবার সাথে মিলিও হেসে কুটোপাটি হল। কাজেই সেটা বাতিল হয়ে গেল। মা আবার চাম্পিয়ানের ভূমিকায়। আবার দিন যায়, রাত আসে। দুপুরে মা-এর হাতে কড়কড়ে আনন্দবাজার পত্রিকার 'পাত্র-পাত্রী' তে চোখ রাখা এইসব চলছে... কারণ আজকাল আর কেউই জানাশোনা পাত্র বা পাত্রীর হদিশ দিতে চায় না। দিনকাল যা পড়েছে, এই ফেসবুকের যুগে, কার জন্য যে কে ঠিক হয়ে আছে কেউ জানতে পারে না।

কয়েক সপ্তাহ বাদে এল আরেকটা ইন্টারভিউ, কুচবিহার থেকে। মিলি বলল, “এত দূর দূর থেকে কেন আসছে, গো মা?” মা শুনে হাসি মুখে মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, “দেখতে আসলেই কি আর বিয়ে হয়ে যায়, নাকি রে? এমনি কথায় আছে, পাঁচ কথায় বিয়ে।” চুপ করে গেল মিলি। মা-এর সাথে তর্ক করা যায় না মোটেই।

মনে পড়ল তার স্বর্গীয়া ঠাম্মার কথা। মিলির চিরকালের অভ্যাস ছিল পা ছড়িয়ে বসে ভাত খাওয়া। ঠাম্মা-পিসন-দিদন কত বারণ করেছেন। বলতেন, “পা ছড়িয়ে খেতে বসলে নাকি দূরে শ্বশুরবাড়ি হয়। তখন কেঁদে ভাসালেও আর বাপের বাড়ি আসা হবে না, বুঝতে পারবি তখন। পা ছড়িয়ে খাওয়া বার হয়ে যাবে।” কারোর বারণেই মিলি তার অভ্যাস বদলায়নি। শেষে একদিন ঠাম্মা রেগে গিয়ে দিলেন পাখার বাট দিয়ে এক ঘা। সে এক কান্ড। মিলি কেঁদে রসাতল। কারণ ঠাম্মাকেই সে সব সুখ দুঃখের কথা বলে, আদর করে 'টুসকি সই' নামে ডাকে। আর সেই ঠাম্মাই কিনা তাকে সবার সামনে পাখার বাট মারলেন? ঠাম্মার আদরেই শেষে মানভঞ্জন হল মিলির।

আবার যথা সময়েই কুচবিহারের লোকেরা এল মিলিকে দেখতে । সেই একই নিয়ম কানুন। মিলি ঘরে ঢুকে পাত্রের মুখের দিকে তাকিয়েই ফিক করে হেসে ফেলেছে। হাসি কিছুতেই চাপতে পারছে না। সে কি অবস্থা। চেষ্টা করছে কত, কিন্তু কেন যে এরকম হচ্ছে বুঝতে পারছিল না। ছেলেটির ঠোঁটের কাছে ছিল একটা বড় লাল রঙের আঁচিল । সেটা দেখেই মিলি হেসে ফেলেছিল আর নিজের মনেই বলেছিল– ভগবান ছেলেটার সব সৌন্দর্যই মেরে দিয়েছেন ওই আঁচিলটা দিয়ে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দেনাপাওনাতে আটকাল বলে মিলিকে আর অত দূরে যেতে হল না। এই ভাবে নানান সম্বন্ধ আসতে লাগল দূর দূর থেকে- দিল্লী, এলাহাবাদ, নাগপুর, মুম্বাই। মিলির জোরাজুরিতে বাবা তাঁদের আপত্তি জানিয়ে চিঠি দিয়েই চলেছেন। মা কে প্রায়ই বলতে শোনে আজকাল, 'এই মেয়ের যে কিভাবে বিয়ে হবে জানা নেই, বাবা।' এরপর যা ঘটল- মিলিকে সেটা তার ওপরওয়ালার ইরাদা বলে মেনে নিতে হল।

সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে ভেসে ভেসে এল এক মিঞা -কি-মল্লার। মা বললেন, "ঘ্যান ঘ্যান করলে কী হবে? জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে- তিন বিধাতা নিয়ে। কাজেই যা হবে মেনে নিতেই হবে। এইভাবে দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে।" মিলি ভাত খেয়ে কলেজে যাবার জন্য সবে প্রস্তুত হচ্ছিল, হঠাত ফোন বেজে উঠল। মা কার সাথে বেশ খানিকক্ষণ কথা বললেন। ফোন রেখেই মিলির বৌদির সাথে কিছু গুরুতর ব্যাপারে যেন পরামর্শ করলেন। তারপরেই মিলিকে ডেকে বললেন, "আজ আর কলেজে যাস না, মিলি!" শুনে মিলি ত অবাক। যে মা স্কুল-কলেজ কামাই করা একদম পছন্দ করেন না। আর আজ তবে হল কি মায়ের? বৌদির দিকে তাকাতেই উনি চোখ মেরে বললেন, "আজ তোমাকে দেখতে আসবে গো, বুঝলে ননদিনী?" মা বেশ ধমকের সুরে বললেন, "পাশের বাড়ির বৌদিকে বলে আয় আজ বিকেলে ওর সাথে তুই সিনেমায় যেতে পারবি না। আজ বাড়িতে তোকে থাকতেই হবে। কথার নড়চড় যেন না হয়।" মায়ের আদেশ মানে মিলির কাছে ফতোয়া জারি। মিলির মুখ থমথমে হয়ে ওঠে।

সারাদিনের সমস্ত প্ল্যান বানচাল হয়ে গেল। রাগের চোটে সাপের মতন হিস হিস করতে করতে মিলি গিয়ে আছড়ে পরল বিছানায়। বিকেলে বৌদির ডাকেই ঘুম ভাঙল। সন্ধ্যেবেলা অভিবাসীর নায়ক ও তার আত্মীয় এসে উপস্থিত হল। ওখানে মিলি আর কোনো আপত্তি করেনি। জানে বেশি আপত্তি করলে, মা -এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া বড় ফেচাং। তার আপত্তি কোনমতেই ধোপ খাবে না। হয়ত এটাই তার কপালে ছিল। দুপক্ষেরই পছন্দ হল এবং মিলি বিয়ের সার্টিফিকেট পেয়ে বিদেশের পথে পা বাড়াল। প্লেনে উঠে ঠাম্মার কথা বড্ড যেন মনে পড়তে লাগল। প্লেন তো ছুটছে মেঘ সরিয়ে। ঘষা কাঁচের ভিতর দিয়ে অস্পষ্ট ছবির মতো তাদের বাড়ির পলাশ-রাঙা, হাসিতরল দিনগুলো চকিতে তার মনের পর্দায় ভেসে উঠে ফের মিলিয়ে যাচ্ছিল। ঠাম্মার কথা মনে এল হঠাত আর ফিক করে হেসে ফেলল। একটু ডাগর-ডোগরটি হবার পর থেকেই ঠাম্মার কাছ থেকে শুনে আসছে পতি পরম গুরু।

-"দিদিভাই, যতই পড়াশুনা করো না কেন, বিয়ে করে ফেললেই মেয়েদের আর কোন চিন্তা থাকে না। নয়ত চারিদিকের হায়নারা খুবলে খুবলে খাবে।"

- "বিয়ের পরেই যে হায়নারা খুবলে খাবে না, তার কি কোন প্রমাণ আছে? সই?" মিলি তার ঠাম্মার গালদুটো টিপে বলেছিল তখন। ফর্সা গাল লাল হতে দেখেছিল মিলি। কিন্তু ঠাম্মা কথা ঘুরিয়েই নাতনির মাথায় একটা চুমু খেয়ে বলেছিলেন, "চুপ কর তো ছুঁড়ি। আজকাল কার মেয়েগুলো বড্ড এঁচোড়ে পাকা।" ঠাম্মার কথাগুলো হাঁচোড় পাঁচোড় করছে হঠাৎ। মনে মনে বলে উঠল, "তোমার কথাই সত্যি হল যে সই। তুমি থাকলে আজ যে কী করতে, তা আমার ভালভাবেই জানা আছে।"

সারাদিন সংসারের কাজ আর বাড়ি সামলাতে সামলাতে মিলি ভাবে, এই জীবনটাকে কি সে টেনে নিয়ে যেতে পারবে শেষ দিন পর্যন্ত? তাও এই বিদেশের বাড়িতে পূজা-আহ্নিক ইত্যাদি সারা হবার পর দ্বিপ্রহরেই অতি যত্নে আহার্য প্রস্তুত করেছে মিলি। তারপর সোফায় গিয়ে বসে টিভির বাংলা চ্যানেলটা খুলে দিল। আজকাল তো বোতাম টিপলেই একেবারেই ঘরের মেয়ে হওয়া যায়। মুখ নিচু করেই সোফার ওপরে পা দুটো উঠিয়ে দিল। তারপর দুই হাঁটুর ভেতরে থুতনিটা গুঁজে বসে ভাবছিল মিলি, নিজের দেশটাই ছিল সবচেয়ে ভাল। এখানে যেন বড্ড টেনশন আর

ডিপ্রেশন। অনেকেই চাকরি করে। ঘরে বাইরে কেবল কাজ, আর কাজ। অবসর নেই কোন। হপ্তান্তে মাঝে মাঝেই গ্রুপ পার্টি তাই লেগেই থাকে। সেখানে দেখে যারা কাজ করে তারা কত সাবলীল। এসব দেখে মিলির চাকরি করার খুব সখ হল। এখানে অল্প বিদ্যেতেও চাকরি পাওয়া যায় শুনেছে বান্ধবীদের কাছে। এটা শোনার পর থেকেই ওর মনের শুকনো মাটিতে নববর্ষার কিঙ্কিণী, মনের নদীতে জলের ছলছলাৎ শব্দেরা নেচে উঠেছে। স্বামীর কাছে বেশ আবদার করেই তাই চাকরি করার কথাটা পাড়ল। স্বামীর মুখে নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠল। চোখ নাচিয়ে বলে উঠল, 'কত ধানে কত চাল জানো?'

মিলি ও তার তুরুক জবাব দিল, "মেপে দেখিনি তো, জানব কি ভাবে? আর আমার জেনেও দরকার নেই। কাজ করার ইচ্ছে হয়েছে তাই তোমায় জিগেস করছি।"

স্বামী হেসে বলল, "যাবে যাও। কাজ খোঁজো, ইন্টারভিউ দিতে থাকো। ডু ইওর বেস্ট। "

-কি রকম মানুষরে বাবা! মনে মনে বলে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিলি। মনে যে ছোট্ট ঘাসটা জন্ম নিয়েছিল, সেও কেমন যেন নেতিয়ে পড়ল। জীবনে এক -একটা সময় আসে যখন মানুষকে স্বীকার করে নিতেই হয়, প্রথম আর চলতির মধ্যে প্রথমটাই বেস্ট। আমাদের একজন বড় দার্শনিক বলেছেন- "ক্ষেতে জল দিতে হলে জলাধার থাকে উঁচু কোন যায়গায়, জলটা ক্ষেতে আসার চেষ্টা করে, একটা দরজা দিয়ে তাকে আটকে রাখা হয়। কিন্তু দরজা খোলামাত্র জল আপনধর্মে ছুটে যায়; পথে যদি ধুলো-কাদা থাকে, জল তা ধুয়ে চলে যায়। কিন্তু মানুষের এই স্বর্গীয় প্রকৃতি প্রকাশের কারণ বা ফল-কোনটাই ঐ ধুলো-কাদা নয়। এক আকস্মিক ঘটনামাত্র, অতএব এর সমাধান আছে।"

তাও আরেকবার ইন্টারভিউর নাম শুনে মিলি আবার আঁৎকে উঠল। ঘরের আশেপাশে কোথাও তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে ডেকে উঠল মকিংবার্ড।

'ওরে বাবা! ইন্টারভিউ?' মনে পড়ে গেল বিয়ের আগের ইন্টারভিউ-এর কথা। কত ইন্টারভিউ দিতে হয়েছে তাকে! তার পরেই তার রেজাল্ট-এর জন্য চিন্তা। বাবা-মা -এর উপাংশুকথন। নিজের মনেই প্রশ্ন করল, আচ্ছা এখানে এত প্রবাসী বাঙালি বধূ, এরা সবাই কী তাদের ঠাকুরমার কথা না শুনে পা ছড়িয়ে খেতে বসত নাকি? মনে পড়ল ওর বিয়ের জন্য মা-বাবার কত চিন্তা, কত খরচা, আড়ালে আবডালে ফিসফিসানি। অথচ এখানে অনেক বাবা-মাকেই বলতে শোনে, "ছেলে-মেয়ের জন্য চিন্তা করি না, ওদের যখন সময় হবে ওরা নিজেরাই নিজেদের সাথি বেছে নেবে। শুধু আমাদের শুনতে বাকি যে, "উই আর রেডি নাও। চার হাত এক করে দেওয়া আমাদের কাজ।" মা-বাবার মনে যেন কত শান্তি। বেশ গর্বের সাথেই কথাগুলো বলেন ওনারা কিন্তু! আমাদের বাবা-মা-এর সাথে অনেক তফাৎ এনাদের। শুধু তাই নয়, ঝক্কিও কম। দেশের মতো অত জলখাবারের জন্য ডলারও গচ্চা যায় না। এদিক ওদিক ছুটতেও হয় না পাত্র-পাত্রী খুঁজতে। মিলি নিজের মনেই ভাবতে লাগল, অনেক নিয়মই ত এখন পাল্টাচ্ছে! এটাই বা পাল্টাবে না কেন? হয়ত পালটিয়েছে-কিন্তু তার ক্ষেত্রে পালটায়নি।

এরকমও তো হতে পারে-পাত্রী যাবে পাত্রের ইন্টারভিউ নিতে ? আজকাল তো চাকরির ক্ষেত্রে অনেক মহিলারা পুরুষের ইন্টারভিউ নেন। চাকরির ইন্টারভিউ আর সম্পূর্ণ নতুন পরিবারে পদার্পণ করার যে ইন্টারভিউ মোটামুটি দুটোই তো প্রায় একই ধাঁচের। চাকরির ইন্টারভিউতে পাশ করলে পকেটে মা লক্ষ্মী(টাকা) বিরাজ করেন আর বিয়ের ইন্টারভিউ তে পাশ করলে ঘরে মা লক্ষ্মী(বৌ) বিরাজ করেন। এটাই শুধু যা ইন্টারভিউ এর ইসপার আর উসপার। যান্ত্রিক ডিজিটালের যুগে চলাফেরা করছি আমরা। কিন্তু আমাদের অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে অনেক সময়ে বহু মাইল পেছনে।

ইন্টারভিউ দেওয়া ও নেওয়ার পদ্ধতি যদিও প্রায় একই তবুও তার মধ্যে দুটো বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। একটাতে জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে যাওয়া আর একটাতে অভিভাবকদের জলখাবারের পয়সা বেশ কিছু গচ্চা যাওয়া। কাজ তাতে সফল হোক আর নাই হোক। 'এক দানে ছক্কা না হলেই অক্কা।' কথাটা মিলি রেগে গেলে নিজের মনে নিজে নিজে আওড়ায় ছন্দে মিলিয়ে। লুডো খেলার মত যতক্ষণ না ছক্কা পড়ে ততক্ষণ ঘুঁটি ঘর থেকে বের হয় না। ডাইস চেলে যেতে হয়। তেমনি যতক্ষণ না ইন্টারভিউতে পাশ করে রেজাল্ট পাওয়া যায় ততক্ষণই ইন্টারভিউ দিয়ে যেতে হয় নানান যায়গায়। পছন্দ মত হলে হায়ার তা না হলে জিরো টায়ার - রিজেক্ট।

সত্যি কথা বলতে কি ইন্টারভিউর নাম শুনলে নার্ভাস হয় নি, এরকম মানুষ কিন্তু খুব কমই শোনা যায়। কর্মক্ষেত্রের জন্যেও ইন্টারভিউ দিতে গেলে কিছু কিছু জিনিসের প্রতি সচেতন হতে হয় যেমন রেজুমে, কভার লেটার, সার্টিফিকেটস, হ্যান্ডশেক, স্মাইল, ড্রেসকোট, কোয়ালিফিকেশন, এ্যপিয়ারেন্স, এবং আরো কিছু। জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে গেলেও চট করে চাকরি পাওয়া সহজ হয় না, ম্যানার্স এর ঠেলায় অন্ধকার। যদিও মিলিকে তখনও পর্যন্ত জুতোর শুকতলা ক্ষোয়াতে হয় নি। বিদেশে আসতে যে ইন্টারভিউ দিতে হয়েছিল তাতেও এত ভুগতে হয়নি।

মিলি আজকাল সময় পেলেই একটার সাথে আর একটার তুলনা খোঁজে। খুঁজেও পায় তার সমাধান। বৈবাহিক ইন্টারভিউ-র কথাও তো এক পরিবার থেকে আরেক পরিবারে যাওয়ার ইন্টারভিউ। অনেকটা নতুন কাজে যুক্ত হওয়ার মতই। বাঙালির-অবাঙালির এই নীতি যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে। পালটানো সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আবহমান বাঙালি জীবন এখন যদিও গ্লোবাল, তাও তো শুনতে পাওয়া যায় এখনও বর্তমান নানান ঝক্কির এই ইন্টারভিউ। আজকালকার গ্লোবাল বাঙালির মেয়ে হয়েও মিলি কিন্তু তার থেকে রেহাই পায় নি। কে বা কারা পেয়েছে তারও হিসেব নিকেশ করার চুলচেরা বিচারের পক্ষপাতী সে নয় এখন। যদিও মিলি জানে ভবিষ্যৎ কথা বলিয়ে নেয়। যা সহজ, সরল, স্বাভাবিক, তাই তো চিরকালের। অস্বাভাবিক কোনকিছুই চিরকালের হয় না, হতে পারে না। তাও একটু রদ বদল হোক না ।

নাইটস্কোপ

নবকলম

ডিসেম্বর ২৫, ২০১৫

একাকিত্বের অধিকাংশ রাত

প্রবাসের নিঃসঙ্গতায় চিরন্তন হাতছানির সারমেয়ধ্বনি খোঁজে... নিরন্তর,

মন সড়কের আদিম, উন্নয়নহীন অলিগলিতে কান পাতে।

শ্বাপদকণ্ঠ পূত শঙ্খনাদে উত্তীর্ণ হয় এক অমোঘ মুহূর্তে ;

প্রার্থনায়, চাহিদায়।

নিজ গর্ভ থেকে উঁকি দিয়ে ভালো না বাসা,

ভালো না লাগা বহু জিনিসকে ক্রমশ আত্মস্মাৎ করে নিশীথ।

নিশ্চিত বর্জ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে, কালক্রমে স্বাস্থ্যও।

স্বাস্থ্যপানে ধমনী কর্মব্যস্ত হয়,

বা হয়তো কর্মব্যস্ততা ভ্রমেরই রুপভেদ মাত্র,

চারকোল – গ্রাফাইট তুতো সম্পর্ক, ধূসর কালো।

সন্তর্পণে ধমনীতে উঠোন আবছা করা সন্ধ্যে প্রবেশ করে,

এক সময় সন্ধেতে অতিথি হয় রাত্রি,

রাতের দরজাতে মৃদু টোকা যার, তিনি আগন্তুক ;

আগন্তুকে পরিপূর্ণ দুর্নিবার ক্লান্তি, ক্লান্তিতে অনিবার্যের নাম বিস্মৃতি।

শুধু মনে থাকে তিরতির শব্দ -

কখনো ক্ষীণ, কখনো বা খানিক জোরে,

জল, সময়, ঘটনা সবই প্রবাহিত হয়।

সেই ছিলো এক দিন আমাদের

যদুবাবু

অক্টোবর ২৩, ২০১৬

আমার পুরো ছোটোবেলা জুড়েই বাড়িতে একটা দারুণ ব্ল্যাক-অ্যান্ড-হোয়াইট টিভি ছিলো, আপট্রন কোম্পানির – তার সঙ্গী ছিলো ছাদের উপর একটা নড়বড়ে অ্যান্টেনা, তাতে কাক-পায়রা একসাথে বসে পাড়া পাহারা দিতো, আর মা বলতেন বাইরে বাজ চমকালেই দৌড়ে গিয়ে টিভি অফ করে দিতে – বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি না হলে ওই অ্যান্টেনা বেয়ে টিভিতে ঢুকে পড়বে যে কোনোদিন। সত্যি বলতে কোনোদিনই জানা হয়ে ওঠেনি, সত্যি ওর'ম হয় কিনা, তবে এখনো বাইরে বাজ-টাজ পড়লে অল্প-স্বল্প ভয় করে ওঠে।

আপট্রনের কৈবল্যপ্রাপ্তি আর কোনোদিনই হয়নি – শুধুই ডিডি ওয়ান, ডিডি টু আর মাঝে মাঝে টিভির কানটা আরো বেশ কয়েক ঘর মুলে দিলে ঝাপসা করে ডিডি থ্রি। আমাদের পাশের ঘর ভাড়াটেদের আবার বাংলাদেশের লাইন ছিলো, মাঝে মাঝে বিকেলের মলয় বাতাসে দুই অ্যান্টেনায় ঠোকাঠুকি লাগলে দিব্যি ঢাকার খবর শুনতে পেতাম, কিস্যু বুঝি আর না বুঝি – বেশ খানিকক্ষণ হাঁ করে দেখে নিতাম, এখন যেমন জুপিটারে নাসার পাঠানো প্রোবের তোলা ছবি দেখি অবাক বিস্ময়ে ...

ঠিক মাঝের ঘরে একটা মান্ধাতার আমলের পুরোনো টেবিল ছিল, তার উপরে রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের ছবি আর দুটো সাদা ফুলদানির মাঝে জ্বলজ্বল করতো আমাদের আপট্রন, মাথায় মায়ের বোনা নক্সা-করা কভার পরে। আর তার চিরসাথী ছিল তাপসদা, পাড়ার বেকার যুবক, এদিক-ওদিক অ্যাপ্লাই করে বেড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে পড়শিদের বাড়ি বাড়ি টিভি আর রেডিও সারাতো। মধ্যেমধ্যেই মাস ছয়েক কেঁপে কেঁপে, বাবার হাতের চড়-থাপ্পড় খেয়ে যেদিন আপট্রন দেহ রাখতো, আমার উপর হুকুম পড়তো – সারা পাড়া ঘুরে কোনো একটা রকের আড্ডা বা ক্যারমের বোর্ড থেকে তাপসদাকে ধরে আনা! গাঁইগুঁই করতে করতে তাপসদা আসতো, সারাদিন লেগে থেকে সন্ধ্যে সাতটার খবরের ঠিক আগে টিভি আবার জেগে উঠতো কি করে যেন, তাপসদা কি কি চার অক্ষর বলতে বলতে রকের আড্ডায় ফিরতো তা জানিনা, তবে আমি ভাবতাম লোকটা নির্ঘাত ম্যাজিক জানে... শেষের দিকে তাপসদা আর টিভি কেমন মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে গেছিলো, বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে তাপসদা চলে আসতো বাড়িতে, চা খেতে খেতে টিভির পেছন খুলে কিসব চিপ-ফিপ লাগিয়ে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে যেতো, পয়সাও নিতো কিনা কে জানে, সেদিন রাতে আপট্রনের আওয়াজে যেন একটু জোর পেতাম...

প্রাইমারী থেকে সবে সেকেন্ডারি উঠলাম, বিকেলে বাড়ি ফিরতাম স্কুলে বকুনি-প্যাঁদানি খেয়ে, কোনো-কোনোদিন আবার খাতায় গার্জেন-কলের চোখরাঙানি – ফিরেই মেট্রো চ্যানেলে শুরু হতো সুপার-হিউম্যান সামুরাই, সে এক অন্য লেভেলের ফিউচারিস্টিক শো, কম্পিউটারের তার বেয়ে কিছু ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া বাচ্চা গিয়ে ডাইনোরূপেণ

সংস্থিতা ভাইরাসদের কেলিয়ে আসতো, আমার বাংলা মিডিয়ামের বিদ্যেয় তাদের কথাবার্তা বুঝতাম না, কিন্তু ক্যালাকেলি দেখতাম রসিয়ে-রসিয়ে... গোগ্রাসে গিলতাম মহেশ ভাটের টার্নিং পয়েন্ট, আর মানেকা গান্ধীর শো 'হেডস অ্যান্ড টেলস', যার একটা এপিসোড দেখে প্রায় এক বছর নিরামিশাষী হয়ে গেছিলো সেই দশ-বারো বছরের আমি!

এসব হলো গিয়ে সেই শেষ নব্বুইয়ের কথা, তখনও জীবনে দফা ৩০২ আসেনি, ডেবোনেয়ার তখনও কীটসের কবিতার মধ্যে লালকালিতে দাগানো একটা শব্দ, যার মানেটা দিদিকে জিগ্যেস করে নিতে হবে একদিন – সেই সময় আমার জীবনে নিষিদ্ধ আনন্দের জানলা ওই ব্ল্যাক-অ্যান্ড-হোয়াইট আড়াই চ্যানেলের বোকাবাক্স। সেও এক রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। ওদিকে বিষ্যুদবার পৌনে আটটা বাজবো বাজবো করছে, বাবা মুখের সামনে আনন্দবাজার বা লাইব্রেরী থেকে আনা শঙ্কু মহারাজের ভ্রমণকাহিনী ধরে একটার পর একটা সিগারেট টানছে আর মা রান্নাঘরে তিন-চারটে রোবিন্দোসঙ্গীত আর অতুলপ্রসাদী ম্যাশ-আপ করে একটা মেলোড্রামাটিক ভজন গাইতে গাইতে রুটি বেলছে, আমার আর দিদির তো আর বীজগণিতে মন নেই, চিত্রহারে নিশ্চয়ই এতক্ষণে আর্ধেক শেষ – এমনি সময় deuce ex machina-র মতন অব্যর্থ কলিং বেল, নিতাইকাকু ওষুধ নিতে এসেছে – অর্থাৎ বাবার থাবা মিনিট দশেকের জন্য অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে – সত্যি বলছি, ঐ যে শেষ হতে হতে, কোনোরকমে ভল্যুমটা আস্তে করে লাস্ট দুটো গান শুনে নেওয়ার যে তৃপ্তি, টাকা দিয়ে কনসার্টে গিয়েও পাইনি আর কোনোদিন...

বাবা ঠিক করে দিতেন কোনগুলো বাচ্চাদের উপযুক্ত শো, আর কোনগুলো এক্কেরে নৈব-নৈব চ। যেমন ধরুন আপনি রোববার সক্কালে টিভি খুলে বসে গেলেন, টেলস্পিন চলেগা, ডাকটেলস-ও চলেগা, কিন্তু চন্দ্রকান্তা-কি-কাহানি? নোপ! ওদিকে মহাভারত, রামায়ণ, স্বপ্নিল যোশির শ্রীকৃষ্ণ চলতে পারে, মাঝদুপুরে জননী, সন্ধ্যে পড়লেই জন্মভূমি, কিন্তু সি-হক্স দেখলে চ্যানেল ঘুরিয়ে দেওয়া হবেই হবে, আর সুপারহিট মুকাবিলা? ভাবাই যায় না... সে যখন নাম পালটে হয়ে গেলো আওয়াল নাম্বার, লুকিয়ে-চুরিয়ে দেড় মিনিটের গান শোনার আশায় কত মিনিট যে বাবা সায়গলকে সয়েছি, ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে...

তাও বিদ্রোহ তো হতোই, নীলাঞ্জনা যদি নচিকেতার হন, আমার তবে নিকি অনেজা, আর দিদির তবে আধাআধি করে এদিকে রাঘবন, ওদিকে ক্যাপ্টেন ভ্যোম, মিলিন্দ সোমান। আর বিকেল হলে মা যখন একটু গড়িয়ে নিচ্ছে, সেই ফাঁকে অকথ্য বাংলায় ডাব করা সোওয়াভিমান... প্লটের মাথামুন্ডু কিচ্ছু বুঝতাম না, হাঁ করে কিটু গিদোয়ানিকে দেখতাম...

রোব্বারের বিকেলে বাংলা সিনেমাটা চলতো বটে, মাঝেসাঝে পাড়ার দু-একটা কাকা-জ্যেঠা শুদ্ধু হই-হই ব্যাপার, তবে সেন্সর-সমেত, যেই না বৃষ্টির রাত্রে দেবশ্রী ছাদে উঠে গান ধরলেন, 'আর কত রাত একা থাকবো?', বাবার চোয়াল অমনি কঠিন হলো, আর তক্ষুণি জানা গেলো শীতলা-মন্দিরের পাশে চপ ভাজা হচ্ছে, দু মিনিট দেরি হলেও একটাও কচুরি থাকবে না আমাদের জন্য...

যে দুটো জিনিষ এইসবের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসতো অক্ষত দেহে, একটা হলো খেলা, আর এক ছিলো ডিটেক্টিভ সিরিজ, আর ছিলোও সেসব দারুণ দারুণ, কুচো বয়সে রজিত কাপুরের ব্যোমকেশ, তারপর এলো শেখর সুমনের রিপোর্টার, সুদেশ বেরির সুরাগ... সুরাগ কিন্তু এর মধ্যে একটা মাস্টারপিস, যারা দেখেননি, তারা জানেনও না সে কি জিনিষ, সুদেশ বেরি ঠিক লাস্ট মোমেন্টে এসে খুনীকে ধরবেন, আর ধরার পরেই সেই মুখের সবকটা মাসল কাঁপিয়ে সেই অমর ডায়লগঃ দিস ইস চেক, মেট!

বাংলাও অবিশ্যি পিছিয়ে ছিলো না, দুপুরের দিকে হতো এক-শুন্য-শুন্য, আর সপ্তাহে একদিন (?) রাত্রে 'আবার যখের ধন', যাতে আবার একটা গোরিমান-টাইপের কস্টিউম পরা ঘটোৎকচ এদিক-ওদিক ঘাড় মটকে বেড়াতো, আর দ্বিজেন বন্দ্যো যেই বলতেন 'বিমলবাবু ভাই', সব্বাই হেসে গড়িয়ে পড়তো ... (অনেক, অনেক পরে বাংলায় একবার ব্যোমকেশ হয়েছিলো, সুদীপ মুখার্জীকে দিয়ে, সে যাকে বলে চাঁদেও দ, আর পোঁদেও দ, দেখতে দেখতে মনে হতো দিই এক ঠাস করে!), আর ছিলেন পঙ্কজ সাহা, বিকেলে আসতেন দর্শকের দরবারে, আর সেইসব একলা বৈশাখের দিন নববর্ষের বৈঠক নিয়ে...

এর মধ্যে কোত্থেকে যেনো হুহু করে বাজারে ছেয়ে গেলো কেবল লাইন, আর সে 'অনির্বচনীয় হুন্ডি শুধু দু-একজনের হাতে'... স্কুলের বাসেই তখন আসল ক্লাসটা হয়, যাদের কেবল, তাঁদের কারুর কারুর আবার কুল বাপমা, বাসে যেতে যেতে সবাই জুলজুল করে শুনতাম রাত্রে রেন্দেজভ্যুস-এ সিমি গারেওয়াল কি কি বল্লেন, আর জি-তে কি সিনেমা আসবে সে সপ্তায়...

আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলাম, আমি আর সব বন্ধুরাই, নাইন-টেনে উঠতে উঠতে বুঝলাম, ডিডি-ওয়ান আর টু ততদিনে ডাইনোসরেরও প্রপিতামহ, বন্ধুরা বড়দের সামনে ইএস্পিএন, ডিসকভারি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এবং আড়ালে এফ-টিভি আর রেন টিভির গল্প করতো, আগের সপ্তাহে কারা লুকিয়ে বেওয়াচ দেখেছে, আর আমরা, বাকিরা টিভির দোকানের সামনে জমা ভিড়কে জিজ্ঞেস করে নিতাম, 'দাদা, ক'টা উইকেট পড়লো?', আর পরের দিনের আনন্দবাজারে খেলার পাতাটা পড়তে পড়তে ভাবতাম শালা একদিন আমাদেরও দিন আসবে...

আমাদেরও দিন এসেছিলো, তবে কেবল লাইন দিয়ে নয়, সেই দুরদর্শনেই, সে এক আশ্চর্য schadenfreude, নরেন্দ্রপুরে ঢুকে দেখলাম বড়োসড়ো খেলা বাদে টিভি চলে না, খালি একচিলতে রোদ্দুর শুক্রবারের রাত, একবাটি মাংসের ঝোল আর একটা হিন্দি সিনেমা – একটা গোটা হোস্টেল একটা পঁচিশ ইঞ্চির টিভিতে হাঁ করে সুনীল শেঠঠির 'ভাই' কি সানি দেওলের 'ঘায়েল' দেখছে, এমনকি চোর চুরি করতে এসে চুরি ভুলে বোঁচকা পাশে রেখে হাত্তালি দিয়ে উঠছে, এ দৃশ্য যদি দেখতে চান, সোজা চলে আসুন কলকাতা – ১০৩-এ!

টিভির সাথে সম্পর্কটা সেখান থেকেই আস্তে আস্তে ফুরিয়ে এলো, নরেন্দ্রপুর শেষ করলাম, আই-এস-আইতে এসে দেখলাম একটা টিভি লাউঞ্জ আছে বটে, তবে কেউ না কেউ সবসময়ই বসে কিছু না কিছু খেলা দেখে – আর কখনো কখনো বনহুগলির মোড় থেকে ভাড়া করে আনা সিডি। এক বন্ধুর কাছ থেকে ফ্রেন্ডস দেখা শিখলাম, সেখানে

দেখলাম কেউ মজার কথা বল্লেই নেপথ্যে হাসির রোল পড়ে যায়, কেমন জানি কথামৃত মনে পড়ে গেল, ঠিক যেন ঠাকুর বসে পিজে মারছেন, আর শ্রীম ব্র্যাকেটে লিখে রাখছেন "পার্ষদবৃন্দের হাস্য"... আর যে গার্লফ্রেন্ড ছিলো তখন, তার বাড়িতে গেলেই দেখতাম একঘরে তার মা বসে কিউঁকি দেখছেন, আরেক ঘরে তার বাপ বসে সিএনবিসির ফুটনোট!

তারপর সে যেন কয়েকশো বছর পেরিয়ে গেলো কি করে, সিনেমায় নামার শখ চেপে চেপে একদিন একটা স্টেজে উঠে পড়লাম, দেখলাম উইংসের ধার থেকে কেমন মায়ামাখানো লাগে অডিয়েন্সের আবছা অস্তিত্ব, সে এক অন্য বসন্ত আমাদের – কমলকুমার এলেন জীবনে, ক্রমে আলো এলো, আগুন, মুখোশ, পরচুলা ইত্যাদি নিয়ে এলেন সন্দীপন, একদিন একটা রিহার্সালে গৌরবদা অ্যাক্টিং করতে করতে মেঝেয় ঠুকে ঠুকে পা-টাই ভেঙ্গে ফেললো – নাটক-ক্লাব শুরু হয়েও বন্ধ হতে হতে, এসে পড়লো আমাদের হাতের তালুতে... টিভি তখন সময়-নষ্টের নামান্তর!

এই তো পরশু-দিন ভারত ক্রিকেটে একদম লাস্ট ওভারে গিয়ে হেরে যাওয়ার পর এক জুনিয়রের পোস্ট দেখে মনে পড়লো দশ, না কুড়ি বছর আগের এক রাতের কথা, ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ, আমাদের সব ব্যাটসম্যান আউট, মা-বাবা মন-খারাপ করে বাইরের ঘরে বসে আছে যাতে টিভিতে হেরে যাওয়াটা দেখতে না হয়, আমার তো বৃথা আশা মরিতে মরিতেও মরে না... এমনি সময় জ্বলে উঠলেন কুম্বলে আর শ্রীনাথ, স্টিভ ওয়া-র বলে একটা বিশাল উঁচু শট আর অম্নি আপট্রন অন্ধকার, আমার চিৎকার শুনে বাবা দৌড়ে এসে এক চড় কষালেন টিভির পাশে, আর একটা বিশাল ছক্কা গিয়ে পড়লো চিন্নাস্বামীর গ্যালারিতে, আহ নস্ট্যালজিয়া!

তারপর অনেক কষ্টেও মনে করতে পারলাম না, শেষমেশ কি হলো সেই টিভিটার? তাপসদাই কি শেষে একদিন এসে নিয়ে গেছিলো না সকাল আটটার কর্পোরেশনের বাঁশির আওয়াজে একদিন রাস্তার ধারে নামিয়ে দিয়ে এসেছিলাম আমি-ই? মনে পড়লো না! মনে পড়লো তাপসদাকে দেখে দেখে আমার বাবাও টিভির কলকব্জা শিখে গেছিলেন দিব্যি, মাঝে মাঝে একটা ইস্ক্রুপ ড্রাইভার নিয়ে টিভি খুলে বসে পড়তেন, ঠোঁট থেকে ঝুলতো উইলস ফ্লেক! আমরা তখন মনে মনে প্রমাদ গণতাম... এই গেলো বুঝি!

সত্যি বলতে গেলে খুব রাগ হতো, পাশের বাড়ির টুবলুদাই কেবল টিভির ডিস্ট্রিবিউটার, তাও নেবে না - ওরা অবশ্য ভাবতো ওইটা নেই বলেই না আমরা ফি বছর ব্যাগভর্তি নম্বর নিয়ে বাড়ি ঢুকছি আর দেশের-দশের মুখ উজ্জ্বল করছি -

বললে পেত্যয় যাবেন না, দেশের না'হক পাড়ার মুখ প্রায় উজ্জ্বল হয়ে গেছিলো আরেকটু হলেই, সেবার জয়েন্টে নরেন্দ্রপুরের সবাই স্ট্যান্ড-ফ্যাণ্ড করে ফাটিয়ে দিয়েছি, আর চ্যানেলে চ্যানেলে বেমক্কা ব্যাচের লোকজনের ইন্টারভিউ দেখাচ্ছে – অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়েও আপট্রন সেদিন কিছুই দেখালো না, সন্ধ্যে ছটার খাস-খবর খুলেই লাফিয়ে উঠলো বাবা, কিন্তু টাইটেলেই যে টাইপো– দত্তকে কে যেন দানা করে দিয়েছে, একবার নয়, দু-দুবার! ছানার শোক, না দানার শক কোনটা বাপের গায়ে বেশী লেগেছিলো সে জানিনা, কিন্তু আপট্রনের গল্পের ইতি সেইখানেই...

পরমাণু ও একটি অন্য যুদ্ধের গল্প

সৌমেন পাত্র

জুন ২৮, ২০১৬

পরমাণু বললেই অনেক সময় আমাদের মনে যুদ্ধের কথাটা চলে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আমরা দেখেছি পরমাণু বোমার বীভৎসতা। তারপর থেকে আর কোনও হিরোশিমা বা নাগাসাকি না ঘটলেও আমরা প্রতি মুহূর্তেই একটি পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্কের মধ্যে কাটাচ্ছি, এমন কথা হয়তো অত্যুক্তি মনে হতে পারে, তবে কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো অবস্থাতেও বোধহয় আমরা নেই! প্রকাশ্যে অথবা গোপনে বহু দেশের হাতে আজ পারমাণবিক অস্ত্রের সম্ভার। কিন্তু পরমাণু নিয়ে সম্পূর্ণ অন্যরকম একটি যুদ্ধ যে ঘটে গেছে এই গ্রহের বুকে, এটা আমরা অনেকেই হয়তো জানি না। এ যুদ্ধে কোনও রক্তপাত হয়নি, একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে কোনও প্রাণনাশও হয়নি, তবু এ যুদ্ধের তীব্রতা কোনও অংশে কম ছিল না। সর্বোপরি এই যুদ্ধ সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘতম যুদ্ধ! ইতিহাসে আমরা সপ্তবর্ষের যুদ্ধ, তিরিশ বছরের যুদ্ধ, এমনকি শতবর্ষের যুদ্ধের (যা আবার প্রকৃতপক্ষে চলেছিল ১১৬ বছর ধরে) কথা শুনেছি। কিন্তু একটি যুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে মাত্রই গত শতাব্দীর প্রারম্ভে, এমন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কথা সম্ভবত অতি বড়ো ঐতিহাসিকও কল্পনা করতে পারবেন না!

ভূমিকা না বাড়িয়ে এবার আসল কথা বলা যাক। পরমাণুতত্ত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আজকের দিনে প্রায় প্রত্যেকেরই আছে। এই তত্ত্ব অনুসারে বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি বস্তু অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি। এই কণাগুলিকে পরমাণু বা অ্যাটম বলে। দুই বা ততোধিক পরমাণু নিজেদের মধ্যে জোট বেঁধে তৈরি করে অণু বা মলিকুল অণু বা পরমাণু এতই ছোট যে এদের চোখে দেখা তো দূরের কথা, সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না। কিন্তু এদের অস্তিত্ব নিয়ে বিজ্ঞানী বা সাধারণ মানুষের কোনও সংশয় নেই। অথচ ভাবলে বিস্ময় জাগে, যে পরমাণুকে আজ আমরা এত সহজে মেনে নিচ্ছি, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পূর্বপুরুষরা তাকে মোটেই সহজে মানতে চাননি। বহু সন্দেহের বেড়াজাল টপকে, বহু প্রশ্নের জবাব দিয়ে পরমাণুকে জায়গা করে নিতে হয়েছে মানুষের চিন্তাজগতে। পরমাণুর ধারণার ক্রমপরিণতির সেই ইতিহাস কোনও রোমহর্ষক যুদ্ধকাহিনীর চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক নয়।

এই কাহিনীর সূত্রপাত প্রাচীন গ্রীস দেশে, যে দেশ আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম জন্মভূমি। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা – সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথিবীকে পথ দেখিয়েছে ইউরোপের এই ছোট্ট দেশটি। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সেই গ্রীস দেশের এক দার্শনিক ও তাঁর শিষ্য – তাঁদের নাম লিউসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাস – তাঁরা প্রথম বললেন পরমাণুর কথা। তাঁরা বিজ্ঞানী ছিলেন না, কোনও পরীক্ষানিরীক্ষা করে তাঁরা পরমাণুর খোঁজ পেয়েছিলেন এমন নয়। বরং এ ছিল একান্তই তাঁদের চিন্তাপ্রসূত ধারণা। তাঁরা বললেন, সমস্ত বস্তু অসংখ্য অতিক্ষুদ্র, অবিভাজ্য

পরমাণু দিয়ে তৈরি। এইসব পরমাণুর সৃষ্টিও নেই, ধ্বংসও নেই। অনন্তকাল ধরে তারা শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি করছে। এই অবস্থায় মাঝে মাঝে তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। তখন কিছু পরমাণু মিলিত হয়ে বস্তুর সৃষ্টি করে। আবার অন্য এক ঝাঁক পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষে সেই বস্তু ধ্বংস হয়ে যায় বাহ্যিক জগতের যা-কিছু পরিবর্তন আমরা দেখি, তা সবই এই পরমাণুদের অন্ধ ছোটাছুটির ফল।

লিউসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাসের এই মতবাদ কিন্তু তখনকার অধিকাংশ গ্রীক দার্শনিক সহজে মানতে পারলেন না। প্রাচীনকাল থেকে তাঁদের ধারণা ছিল, মহাবিশ্ব পদার্থ দ্বারা নিশ্ছিদ্র ভাবে পরিপূর্ণ, সেখানে কোথাও কোনও শূন্যস্থান নেই। কিন্তু মহাবিশ্ব যদি পরমাণু দ্বারা গঠিত হয়, তাহলে তো পরমাণুদের মাঝে ফাঁক বা শূন্যস্থান থাকবে। এই শূন্যস্থান ব্যাপারটা তাঁরা ঠিক মানতে পারতেন না। পরমাণুবাদ না মানার আরেকটা প্রধান কারণ ছিল এই তত্ত্বের মধ্যে নিরীশ্বরবাদের গন্ধ। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে (বা তাদের বিশ্বাস করানো হয়েছে), ঈশ্বর মানুষের জন্য এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের মঙ্গলের জন্যই তিনি একে ঠিকঠিক ভাবে চালনা করছেন। সুতরাং মানুষের উচিত ঈশ্বরকে তুষ্ট করা আর তার উপায় হল মর্ত্যলোকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি পুরোহিত সম্প্রদায় ও তাদের সাগরেদ শাসক সম্প্রদায়কে তুষ্ট করা, তারা যা বলবে তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা। এদিকে পরমাণুবাদ বলছে কিনা পরমাণুদের কেউ সৃষ্টিও করেনি, কেউ চালনাও করছে না, তারা নিজেরাই অনন্তকাল ধরে অন্ধের মতো ছোটাছুটি করছে, আর তাতেই নাকি জগতটা চলছে। সুতরাং বেশির ভাগ দার্শনিক, যারা আসলে শাসক ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের ধামাধরা ছিলেন, তাঁরা যে পরমাণুবাদকে উড়িয়ে দেবেন তাতে আর আশ্চর্য কী?

তবুও মুষ্টিমেয় কিছু দার্শনিকের মধ্যে পরমাণুবাদ টিকে ছিল। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এই মতবাদকে চরম আঘাত হানলেন গ্রীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক অ্যারিস্টটল। তিনি তাঁর গতির তত্ত্ব দিয়ে শূন্যস্থানকে নাকচ করে দিলেন। অ্যারিস্টটলের মতে সমস্ত গতির জন্য একজন চালকের প্রয়োজন হয়। ঘোড়ায় রথ টানে, মাঝি দাঁড় টেনে নৌকা চালায়। তাহলে ধনুক থেকে ছিটকে বেরনো তীরকে কে টেনে নিয়ে যায়? অ্যারিস্টটল বললেন, বাতাস! তীরের সামনের বাতাস বিদীর্ণ হয়ে পথ করে দেয় আর তীরটি এগিয়ে গেলে পিছনের বাতাস সেই ফাঁক ভরাট করে দেয়। এইভাবে বাতাসই তীরটিকে চালিয়ে নিয়ে যায়। তাহলে গতির জন্য যদি বাতাসের প্রয়োজন হয় আর সব জায়গাতেই যেহেতু গতি সম্ভব, সুতরাং বায়ুশূন্য স্থান কোথাও থাকবে না। কারণ সেখানে চালকের অভাবে গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে পরমাণুদের ছোটাছুটির তত্ত্ব একেবারে খারিজ হয়ে গেল।

আজকে আমরা জানি, অ্যারিস্টটল পুরোপুরি ভুল বলেছিলেন। গতির জন্য বাতাসের প্রয়োজন হয় না, বরং বাতাস গতিকে বাধা দেয়। বাতাস ছাড়া গতি সম্ভব না হলে আমরা চাঁদে রকেট পাঠাতে পারতাম না, কারণ পৃথিবী ও চাঁদের মাঝখানে বেশির ভাগ জায়গাই তো বায়ুশূন্য। কিন্তু সেযুগে এবং তার পরবর্তী প্রায় দুহাজার বছর ধরে অ্যারিস্টটলের এমনই প্রভাব ছিল যে, তাঁর ভুল ভাঙার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে গ্যালিলিওর কাল পর্যন্ত। অ্যারিস্টটলের কিছু পরবর্তী অন্য একজন দার্শনিক এপিকিউরাস পরমাণুবাদের কিছু পরিবর্তন করে তাকে আবার প্রচার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে পরমাণুবাদ ধীরে ধীরে মানুষের মন থেকে মুছে যায়।

গ্রীস থেকে এবার প্রাচীন সভ্যতার আরেক পীঠস্থান ভারতবর্ষের দিকে চোখ ফেরানো যাক। "হিন্দু" দর্শনের ছয়টি শাখার মধ্যে অন্যতম দুটি হল ন্যায় ও বৈশেষিক। ন্যায় দর্শনের রচয়িতা গৌতম এবং বৈশেষিক দর্শনের রচয়িতা কণাদ ভারতে পরমাণুবাদের অবতারণা করেন। তাঁদের মতবাদের সঙ্গে গ্রীক মতবাদের কিছু পার্থক্য থাকলেও মূল বক্তব্য মোটামুটি একই ছিল। তবে গৌতম ও কণাদের সময়কাল লিউসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাসের আগে না পরে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ফলে ভারতীয় মতবাদ গ্রীক মতবাদকে প্রভাবিত করেছিল, না গ্রীক মতবাদ ভারতীয় মতবাদকে প্রভাবিত করেছিল, নাকি দুটি মতবাদই স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়েছিল, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। যাইহোক, গৌতম ও কণাদের মতবাদ তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। আধুনিক ভারত তাঁদের উত্তরাধিকার বহন করতে পারেনি। নইলে হয়তো আমাদের দেশ থেকেই একজন ডালটনের জন্ম হত।

ইউরোপের ক্ষেত্রে কিন্তু এমনটা হয়নি। অ্যারিস্টটলের আঘাতে দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে থাকার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে পরমাণুবাদের পুনর্জাগরণ হয়েছে। দুজন ফরাসী দার্শনিক রেনে দেকার্ত ও পিয়ের গ্যাসেন্দি দুরকম ভাবে এই পুনর্জাগরণ ঘটালেন।

দেকার্তকে অনেক সময় আধুনিক দর্শনের জনক বলা হয়। তিনি পরমাণুবাদকে কিছুটা পরিবরতিত করে নিলেন। এই পরিবর্তিত মতবাদকে কণিকাবাদ বা করপাসকুলারিয়ানিজম বলা হয়। তাঁর মতে পরমাণু অবিভাজ্য নয়, তাকে ভাঙা যায়। তাই তাকে পরমাণু বা অ্যাটম বলা ঠিক নয়, কারণ অ্যাটম কথাটা এসেছে গ্রীক অ্যাটোমোস শব্দ থেকে, যার অর্থ অবিভাজ্য। সুতরাং দেকার্ত পরমাণু না বলে বললেন করপাসল বা কণিকা। পরমাণুবাদের বিরুদ্ধে যেটা প্রধান অভিযোগ, সেই শূন্যস্থান বা ভ্যাকুয়ামকে বাদ দিয়েই তিনি তাঁর মতবাদকে সাজাতে চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, এই অতিসূক্ষ্ম কণিকাগুলি ঘূর্ণির আকারে একস্থান থেকে অন্যস্থানে এমনভাবে ধেয়ে চলেছে যাতে কোথাও শূন্যস্থান না থাকে। অর্থাৎ একটি কণিকা সরে গিয়ে তার পিছনের কণিকাকে জায়গা করে দিচ্ছে, সে আবার জায়গা করে দিচ্ছে তার পিছনের কণিকাকে। এইভাবে চক্রাকারে চলছে।

অন্যদিকে গ্যাসেন্দি কিন্তু এপিকিউরাসের পরমাণুবাদকেই প্রায় অবিকৃত আকারে মেনে নিলেন। তিনি শুধু ওই মতবাদের নিরীশ্বরবাদের বদনাম ঘোচানোর চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, পরমাণুগুলি অনন্তকাল ধরে ছোটাছুটি করছে না। ঈশ্বর বিশ্বসৃষ্টির সময় সেগুলিকে তৈরি করে ঠেলে দিয়েছিলেন। সেই ঐশ্বরিক ঠেলার জোরেই তারা ছুটে চলেছে। একে আমরা বলতে পারি পরমাণুবাদের একটা "ডেইস্ট" ভাষ্য। এই ভাষ্যের ফলে সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। আর শূন্যস্থান সংক্রান্ত অভিযোগের উত্তর দেওয়ার জন্য গ্যাসেন্দি সমসাময়িক পদার্থবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করলেন। 1643 সালে গ্যালিলিওর ছাত্র টরিসেলি বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্র ব্যারোমিটার আবিষ্কার করেছেন। ব্যারোমিটার আসলে একটা মিটার খানেক লম্বা একমুখ খোলা কাচের নল। এই নলকে পারদ দিয়ে ভর্তি করে অন্য একটা পারদপূর্ণ গামলার মধ্যে নলের খোলা মুখটা ডুবিয়ে রাখা হয়। এর ফলে নলের পারদ প্রথমে আপন ভারে নামতে থাকে। এইভাবে নামতে নামতে যখনই নলের পারদস্তম্ভের দৈর্ঘ্য 76 সেন্টিমিটার হয়, তখন পারদ আর না নেমে স্থির অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। টরিসেলি বললেন, এর কারণ হল বায়ুমণ্ডলের চাপ। বায়ুমণ্ডলের চাপ 76 সেন্টিমিটার

দীর্ঘ পারদস্তম্ভের চাপের সমান, তাই বায়ুমণ্ডল অতটা দীর্ঘ পারদস্তম্ভকে ধরে রাখে। ভালো কথা। আর পারদস্তম্ভের উপরে নলের যে ফাঁকা জায়গাটা রয়েছে? ওখানে কী আছে? টরিসেলি পরীক্ষা করে দেখালেন, ওখানে কিচ্ছুটি নেই, এমনকি বাতাসও না। অর্থাৎ সেই শূন্যস্থান, যা কিনা বহু শতাব্দী আগে অ্যারিস্টটল যুক্তি দিয়ে নাকচ করে দিয়েছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম স্থায়ী শূন্যস্থান বা ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করে দেখালেন টরিসেলি (প্রকৃতপক্ষে "টরিসেলির শূন্যস্থান" পুরোপুরি শূন্য নয়, সেখানে সামান্য পারদবাস্প থাকে, তবে তার পরিমাণ নগণ্য)। তাঁর দেশ ইতালি থেকে এই আশ্চর্য সংবাদ সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সে বসে গ্যাসেন্দিও পেলেন সেই সংবাদ। আর সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুবাদের বিরুদ্ধে ওঠা প্রধান অভিযোগটির জুতসই জবাব পেয়ে গেলেন তিনি। এতদিন বলা হত, যেহেতু প্রকৃতিতে শূন্যস্থানের অস্তিত্ব নেই, তাই পরমাণুরও অস্তিত্ব নেই। এখন শূন্যস্থানের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়ে গেছে। সুতরাং পরমাণুকে মানতে আর অসুবিধা কোথায়?

গ্যাসেন্দি 1687 সালে তাঁর পরমাণুবাদ প্রচার করলেন। সেইসঙ্গে করে দেখালেন টরিসেলির পরীক্ষাটি। তাঁর মতবাদ দেকার্তের মতবাদ থেকে আলাদা হওয়ায় দেকার্তের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক শুরু হল। শেষ পর্যন্ত যেসব দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা দেকার্তের কষ্টকল্পিত ঘূর্ণির তত্ত্বকে মানতে পারেন নি, তাঁরা গ্যাসেন্দির মতকেই বরণ করে নিলেন। খ্রিস্টধর্মের কেষ্টবিষ্টুরাও আপত্তি করলেন না। কিন্তু পরমাণুবাদের বিপদ একেবারে কেটে গেল, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। সবে যুদ্ধের প্রথম ধাপটা সে পার হয়েছে। এখনও অনেক পথ বাকি। সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের অনেকে পরমাণুবাদ মেনে নিলেন, কিন্তু অনেকেই মানলেন না। তাঁদের বক্তব্য, পরমাণুবাদ নিছক একটি দার্শনিক মতবাদ। কোনও পরীক্ষানিরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এই মতবাদ নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত। এরকম কল্পনার মূল্য দর্শনে থাকতে পারে, বিজ্ঞানে এর মূল্য কোথায়?

এই যখন পরিস্থিতি, তখন একটা ঘটনা ঘটল। 1738 সালে ড্যানিয়েল বারনৌলি নামে একজন সুইশ পদার্থবিজ্ঞানী এমন একটি কাজ করলেন যাতে পরমাণুবাদ সামান্য হলেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পেল। আমরা জানি, কোনও গ্যাসকে একটা পাত্রের মধ্যে রাখলে গ্যাসটি পাত্রের দেওয়ালে চাপ দেয়। বেলুন ফোলানোর সময় গ্যাসের এই চাপের প্রমাণ পাওয়া যায়। বারনৌলি বললেন, এই চাপের কারণ হল গ্যাসের পরমাণুগুলোর গতি। পরমাণুগুলো ছোটাছুটি করতে করতে পাত্রের দেওয়ালে অনবরত ধাক্কা দেয় আর তার ফলেই চাপের সৃষ্টি হয়। এখন কোনও বস্তুকণা একটি দেওয়ালে ধাক্কা দিলে কতটা বল প্রয়োগ করবে, তা নির্ণয়ের উপায় অর্ধশতাব্দী আগে আইজ্যাক নিউটন বলে গিয়েছিলেন। বারনৌলি নিউটনের সূত্র কাজে লাগিয়ে অঙ্ক কষে বের করলেন গ্যাসের চাপ। তিনি দেখলেন যে, গ্যাসের আয়তন বাড়লে চাপ কমে আর আয়তন কমলে চাপ বাড়ে। ঠিক এই কথাটাই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করে গিয়েছিলেন নিউটনের সমসাময়িক আরেক ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল। এবার বারনৌলির অঙ্ক কষে পাওয়া সূত্র বয়েলের পরীক্ষালব্ধ সূত্রের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় পরমাণুবাদ যে নির্ভুল এটাই প্রমাণ হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, বারনৌলির কাজ যে-কারণেই হোক, সেকালের অন্য সব বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ গ্রাহ্য হল না। ফলে পরমাণুবাদ যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রইল।

এর পরের ঘটনা 1799 সালে। ফরাসী রসায়নবিদ জোসেফ প্রাউস্ট একটা নতুন কথা বললেন। আমাদের চারপাশে আমরা যে অজস্র পদার্থ দেখি, বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে সেগুলো আসলে মাত্র কয়েকটা পদার্থের সমন্বয়ের ফসল। এই কয়েকটা পদার্থই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবে নিজেদের মধ্যে যুক্ত হয়ে তৈরি করে অন্য সব পদার্থ। এই পদার্থগুলোকে বলা হয় মৌলিক পদার্থ বা মৌল, আর এরা যুক্ত হয়ে যেসব পদার্থ তৈরি করে তারা হল যৌগিক পদার্থ বা যৌগ। যেমন – হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন হল মৌলিক পদার্থ, আর এরা যুক্ত হয়ে যে জল তৈরি করে তা হল যৌগিক পদার্থ। এখন প্রাউস্ট নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করে বললেন, একটা যৌগিক পদার্থে তার উপাদান মৌলগুলির ওজনের অনুপাত একেবারে নির্দিষ্ট। যেমন – আটভাগ ওজনের অক্সিজেনের সঙ্গে একভাগ ওজনের হাইড্রোজেন মিশে জল হয়। এখন আপনি পৃথিবীর যেখান থেকেই জল আনুন না কেন (অবশ্য সেটা বিশুদ্ধ হতে হবে), তাতে ওই ওজনের অনুপাত একই থাকবে। আবার হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিশিয়ে জল তৈরি করতে হলেও তাদের ঠিক ওই অনুপাতেই মেশাতে হবে। সামান্য ইতরবিশেষ হলেও চলবে না।

জন ডালটন নামে একজন ইংরেজ রসায়নবিদ প্রাউস্টের সূত্র নিয়ে ভাবতে বসলেন। প্রাউস্টের সূত্র কেন সত্যি হয়? কেন একটা যৌগিক পদার্থ সবসময় A মৌলের 8 ভাগ ও B মৌলের 1 ভাগ মিলেই তৈরি হয়? কেন কখনোই A মৌলের 8.1 ভাগ বা 7.9 ভাগ আর B মৌলের 1 ভাগ মিলে তৈরি হয় না? পদার্থ যদি অবিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে তো এরকম হওয়ার কথা নয়। কিন্তু পদার্থ যদি অসংখ্য ছোট ছোট পরমাণু দিয়ে তৈরি হয়? ধরা যাক, A-এর একটি পরমাণু ও B-এর একটি পরমাণু যুক্ত হয়ে একটি যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা বা অণু তৈরি করে। আরও ধরা যাক, A-এর একটি পরমাণু B-এর একটি পরমাণুর চেয়ে 8 গুণ ভারি। তাহলে যৌগিক পদার্থটির মধ্যে ঠিক A-এর 8 ভাগ ওজন ও B-এর 1 ভাগ ওজনই থাকবে। এই অনুপাতটিকে পাল্টাতে হলে B-এর একটি পরমাণুর সঙ্গে A-এর একটি পরমাণুর চেয়ে সামান্য বেশি বা কম অংশ যুক্ত করতে হবে। কিন্তু পরমাণুকে ভাঙা যায় না বলে সেটা সম্ভব নয়। সুতরাং ডালটন দেখলেন, পদার্থ পরমাণু দিয়ে তৈরি বলে ধরে নিলে প্রাউস্টের সূত্র তার একটা স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসেবেই এসে পড়ে। 1808 সালে ডালটন তাঁর পরমাণুতত্ত্ব প্রকাশ করলেন। এই প্রথম পরমাণুবাদ দর্শনের মোড়ক থেকে বেরিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হল।

ডালটনের পরমাণুতত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে রসায়নবিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে পদার্থের পারমাণবিক গঠনে বিশ্বাস করতে শুরু করলেন। এই বিষয়ে তাঁরা অনেক কাজও করতে লাগলেন। হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন এক ধরে তার সাপেক্ষে তাঁরা অন্যান্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুর আপেক্ষিক ওজন নির্ণয় করলেন (পরমাণু এতই ক্ষুদ্র যে তার প্রকৃত ওজন নির্ণয় করার কথা তখন কল্পনাও করা যেত না)। এই কাজ ডালটন শুরু করলেও বার্জিলিয়াস পরে অনেক নিখুঁতভাবে এটি সম্পন্ন করেছিলেন। এছাড়া বার্জিলিয়াস পদার্থের পারমাণবিক গঠন অনুযায়ী তার সংকেত লেখার প্রচলন করেন। তাঁর দেখানো পথেই আজও আমরা জলের সংকেত লিখি – অর্থাৎ দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু মিলে জলের একটি অণু তৈরি হয়।

ওদিকে পদার্থবিজ্ঞানীদের অধিকাংশই কিন্তু তখনও পরমাণুকে কাল্পনিক ধারণা বলেই মনে করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে অল্প কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী – হয়তো রসায়ন বিজ্ঞানীদের কাজ দেখে উৎসাহিত হয়েই – একশো বছর আগের ড্যানিয়েল বারনৌলির দেখানো পথে হাঁটতে শুরু করলেন। অর্থাৎ পরমাণুর ধারণা থেকে পদার্থের বাহ্যিক ধর্ম আবিষ্কার করতে চাইলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন তিনজন – জার্মানির রুডলফ ক্লসিয়াস, স্কটল্যান্ডের জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, এবং অস্ট্রিয়ার লুডভিগ বোলজম্যান। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন মূলত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী। এঁদের গাণিতিক দক্ষতা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের। এঁদের গবেষণার ফলে জন্ম নিল পদার্থবিদ্যার দুটি নতুন শাখা – কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসেস এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স। প্রথমটির জন্মদাতা ক্লসিয়াস ও ম্যাক্সওয়েল, দ্বিতীয়টি মূলত বোলজম্যানের মানসসন্তান।

এইসব তত্ত্বের মূলকথা হল, বস্তুজগতের দুটো দিক আছে। একটা হল তার বাইরের দিক, সেটা আমরা দেখতে পাই আর সেখানে অবিরত ঘটে চলেছে নানা বিচিত্র ঘটনা। এটা হল ম্যাক্রোস্কোপিক বা দৃশ্য জগত। কিন্তু এই বাহ্যিক জগত ছাড়াও আরেকটা অদৃশ্য জগত আছে বস্তুসমূহের অভ্যন্তরে। সেটা হল অণু-পরমাণুর জগত বা মাইক্রোস্কোপিক জগত। চাঁদের একটা পিঠের মতো আমরা শুধু ম্যাক্রোস্কোপিক জগতটাকেই দেখতে পাই, মাইক্রোস্কোপিক জগতটা থেকে যায় আমাদের দৃষ্টির বাইরে। কাইনেটিক থিওরি বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সের কাজ হল এই দুই জগতের মেলবন্ধন ঘটানো। অর্থাৎ অণু-পরমাণুর গতির সাহায্যে পদার্থের বাহ্যিক ধর্মকে আবিষ্কার করা। এ যেন বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন – সমুদ্রের প্রতিটি জলের ফোঁটাকে দেখে সমুদ্রের বাইরের রূপটাকে বোঝার চেষ্টা করা। এই তুলনা থেকেই বোঝা যায়, কাজটা কতটা কঠিন। আর এই কঠিন কাজটা ওই বিজ্ঞানীরা করতে পেরেছিলেন তাঁদের গাণিতিক দক্ষতার সাহায্যে। প্রোব্যাবিলিটি বা সম্ভাবনা তত্ত্ব আর স্ট্যাটিস্টিক্স বা পরিসংখ্যান তত্ত্ব – গণিতশাস্ত্রের এই দুই শক্তিশালী অস্ত্রের সাহায্যে তাঁরা আবিষ্কার করলেন পদার্থের বিভিন্ন বাহ্যিক ধর্ম। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তাঁদের এইসব অঙ্ক কষে পাওয়া ফলাফল একেবারে মিলে গেল হাতেকলমে পরীক্ষা করে পাওয়া ফলাফলের সঙ্গে। ফলে তাঁদের তত্ত্ব যে শুধু সঠিক প্রমাণিত হল তাই নয়, সেইসঙ্গে প্রমাণিত হল অণু-পরমাণুর অস্তিত্বও।

কিন্তু তবুও একদল বিজ্ঞানী ও দার্শনিক এইসব তত্ত্বের বিরোধিতা করতে লাগলেন। এঁদের নেতৃত্বে ছিলেন অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ তথা দার্শনিক আর্নেস্ট ম্যাখ এবং জার্মান রসায়নবিদ উইলহেম অসওয়াল্ড। এঁরা "ভিয়েনা সার্কেল" নামে একটি "পজিটিভিস্ট" দার্শনিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এঁদের বক্তব্য ছিল এই যে, বিজ্ঞানে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা যায় না, এমন ধারণার কোনও স্থান নেই। পরমাণুর অস্তিত্বকে ধরে নিয়ে কাইনেটিক থিওরি বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স যতই কেন সঠিক ফলাফল বের করুক, যতদিন পর্যন্ত কেউ সরাসরি পরীক্ষার সাহায্যে পরমাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে না পারছে, ততদিন বিজ্ঞানে তার কোনও স্থান নেই।

ম্যাখ ও অসওয়াল্ডের এই সমালোচনা যাকে সবচেয়ে বেশি বিব্রত করেছিল, তিনি হলেন বোলজম্যান। কুড়ি বছর বয়সে তিনি যখন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন তাঁর অধ্যাপক তাঁকে পড়তে দিয়েছিলেন কাইনেটিক থিওরির উপর লেখা ম্যাক্সওয়েলের কিছু পেপার বা গবেষণাপত্র। সেই পেপার পড়ে তরুণ বোলজম্যান এতটাই অভিভূত

হলেন যে, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সারাজীবন ওই বিষয় নিয়েই গবেষণা করবেন। আর করলেনও তাই। শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা সাধারণত একাধিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। কিন্তু বোলজম্যান সারাজীবনে যা-কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন, সব ওই একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে – স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স, তাঁর মানসসন্তান। এহেন স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স আক্রান্ত হওয়ায় পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে বোলজম্যানের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ল। জীবনের শেষের দিকে বোলজম্যান নতুন কোনও গবেষণা করেন নি, তখন তাঁর একমাত্র কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছিল অন্যান্য বিজ্ঞানীদের পরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করানো। এমনকি পরমাণুতত্ত্বের সপক্ষে দার্শনিক যুক্তিটা পোক্ত করার জন্য তিনি বৃদ্ধ বয়সে দর্শন পড়তেও শুরু করেছিলেন। কিন্তু এত করেও কিছু হল না। 1904 সালে পদার্থবিদ্যার একটি সম্মেলনে অধিকাংশ বিজ্ঞানী স্পষ্টভাবে পরমাণুকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এমনকি ওই সম্মেলনে বোলজম্যানকে পদার্থবিদ্যা বিভাগে আমন্ত্রণ করা হল না, তাঁর জায়গা হল ফলিত গণিত বিভাগে।

বোলজম্যান এমনিতেই ছিলেন মানসিক অবসাদের রোগী, তাঁর পক্ষে এসব আঘাত সহ্য করা সম্ভব হল না। কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর 1906 সালে স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে ছুটি কাটাতে গিয়ে তিনি আত্মহত্যা করলেন। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা তখন সুইমিং পুলে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন, ছাদ থেকে ঝুলছে অবসাদগ্রস্ত, বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর নিথর দেহ। দৃশ্য ও অদৃশ্য লোকের মধ্যে যিনি সেতুবন্ধন করার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি চলে গেলেন অন্য এক সুদূর অদৃশ্য লোকে। বোলজম্যানের সমাধির উপর খোদিত আছে তাঁর আবিষ্কৃত একটি ছোট্ট সমীকরণ, যা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সের স্তম্ভ রূপে বিবেচিত হয় :

$$S = k \log W$$

বোলজম্যান হয়তো জানতেন না, তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে 1905 সালে পদার্থবিদ্যার একটি জার্নালে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। লেখক সুইশ পেটেন্ট অফিসের একজন অখ্যাতনামা ক্লার্ক, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, যিনি পরে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জন্য জগদ্বিখ্যাত হবেন। গবেষণার বিষয় হল ব্রাউনীয় গতি যা ব্রিটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন 1827 সালে আবিষ্কার করেছিলেন। ব্রাউন জলে ভাসমান কিছু পরাগরেণুকে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। মাইক্রোস্কোপে চোখ রেখে তিনি একটা অদ্ভূত দৃশ্য দেখলেন। পরাগরেণুগুলো অনবরত এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। এই এলোমেলো গতির যেন কোনও শেষ নেই। অথচ পাত্রের জল দৃশ্যত স্থির। শুধু পরাগরেণু নয়, পরে তিনি অজৈব সূক্ষ্ম কণা নিয়ে পরীক্ষা করেও একই দৃশ্য দেখলেন। এই রহস্যময় ঘটনাটি ব্রাউনীয় গতি নামে বিখ্যাত হয়, যদিও ব্রাউন বা অন্য কেউ এর কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। 1905 সালের ওই পেপারে আইনস্টাইন দাবি করলেন, ব্রাউনীয় গতি আসলে অণু-পরমাণুর অস্তিত্বকেই নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করছে। জলের অণুগুলি নিরন্তর ছোটাছুটি করার সময় পরাগরেণুগুলিকে যে ধাক্কা দিচ্ছে, তার জন্যই তাদের এই গতি। নির্ভুল গাণিতিক যুক্তির সাহায্যে আইনস্টাইন তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করলেন।

কিন্তু গণিত ও তত্ত্ব কোনদিনই বিজ্ঞানে শেষ কথা নয়। পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই হলে তবেই কোনও তত্ত্ব সঠিক বলে গৃহীত হয়। এখন আইনস্টাইনের তত্ত্ব পরীক্ষার সাহায্যে যাচাই করা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু ফরাসী

বিজ্ঞানী জ্যাঁ-ব্যাপতিস্তে পেরিন 1908 থেকে 1913 সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করলেন। একাজে তিনি ফটোগ্রাফিকে ব্যবহার করেছিলেন। সূক্ষ্মকণা মিশ্রিত এক ফোঁটা জলের হাজার হাজার আলোকচিত্র নিলেন তিনি। তিনি যে শুধু অণু ও পরমাণুর অস্তিত্বই প্রমাণ করলেন তা নয়, সেইসঙ্গে তিনি অণুর আকার এবং কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ পদার্থে উপস্থিত অণুর সংখ্যাও নির্ণয় করলেন। 1913 সালে প্রকাশিত তাঁর বই "দি অ্যাটমস" পরমাণুর অস্তিত্ব নিয়ে দুই সহস্রাব্দ ব্যাপী যাবতীয় বাদানুবাদের উপর স্থায়ী যবনিকা টেনে দিল। শুধু একটাই দুঃখ, সেদিন পেরিনের কাজের প্রশংসা করার জন্য কোনও বোলজম্যান ছিলেন না। নিঃসন্দেহে বলা যায়, বেঁচে থাকলে পেরিনের কাজ দেখে তিনিই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন।

না, জ্যাঁ-ব্যাপতিস্তে পেরিন বাঁচাতে পারেন নি লুডভিগ বোলজম্যানকে, কিন্তু বাঁচিয়ে দিলেন তাঁর মানসসন্তান স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সকে। আর কে না জানে, সন্তানের মধ্যেই বেঁচে থাকেন সন্তানের পিতা। তাইতো লুডভিগ বোলজম্যান আজও বেঁচে আছেন সেইসব মানুষের মনে যারা তাঁরই মতো বিজ্ঞানের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

হোয়াটস্যাপ

হযবরল

আগস্ট ২২, ২০১৬

এক একেকটা দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই অফিসে না যাওয়ার ইচ্ছেটা প্রচন্ড বিটকেল ভাবে জাঁকিয়ে বসে। শনিবারে সপ্তাহান্তে সেই ইচ্ছেটা তীব্র থেকে আরো তীব্রতর হয়ে যায়। পুরোনো নোকিয়ার ৩৩১০ এর কর্কশ অ্যালার্ম সকালে বাজতেই সুদীপ্তও খানিকটা সেরকম বোধ করলো। শনিবার মানেই তো সেই টিম মিটিং ও নেকড়েসম সেলসের বড়কত্তাদের মূষিকপ্রায় এক্সেকিউটিভদের ধরে ধরে মা বাপান্ত করা। ধুসস এর চেয়ে আলিপুর চিড়িয়াখানার ওরাং ওটাংদের জীবন অনেক ভালো। টার্গেট নেই , দুধ, খবর কাগজ, ফোন, কাজের মাসি, কেব্‌ল টিভি, রেশন, বাজার, এলআইসি, ওষুধ, ছেলের পড়াশুনা কোনোকিছুর জন্যেই কোনো টেনশন নেই। এর ওপর আজ নববর্ষ কাল পুজো পরশু গিন্নির বেড়াতে যাওয়ার বায়না – নাঃ পরের জন্মে আলিপুরেই জন্মাবো – হয় অট্টালিকাগুলোর ভেতর আর নাহলে খাঁচায়! এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো সুদীপ্ত। এই বিশাল নগরে ক্ষুদ্র এক নাগরিকের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে ঘুম থেকে উঠে অফিস যাওয়াটা আজ কিরকম জানি একটা সমবেত বদভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর গিন্নির ‘এটা লাগবে’, ‘ওটা ফুরিয়ে গেছে, আজ আনতে ভুলবে না’ ইত্যাদি মগজে রেজিস্টার করতে করতে প্রাতঃকৃত্য সারা। পুরো সপ্তাহের পচা ঘামের গন্ধ ঢাকতে জামায় সস্তার ডিও মেরে ছেলেকে স্কুলের জন্য তৈরী করা। ব্রেকফাস্ট মানেই তো সেই বাসি রুটি আর আলু ভাজা নাহলে কপাল ভালো থাকলে পাউরুটি স্যাকা আর ডিম। আধ কাপ চা দিয়ে সেটা সেরেই হুড়মুড় করে বাইকে চেপে প্রথমে ছেলেকে স্কুলে ছাড়া ও তারপর এক ঘন্টা জ্যাম সামলে অফিস দেরিতে পৌঁছানো। মিটিং শুরু হয়ে গেছে! রিয়েল এস্টেটের বাজারে ভীষণ মন্দা আর সুদীপ্তদের কোম্পানির অবস্থা অন্যদের তুলনায় নাকি আরো খারাপ। মুখ কাঁচুমাচু করে বোর্ডরুমে ঢুকে কোণের চেয়ারটা টেনে বসতেই এরিয়া ম্যানেজার মিঃ দত্ত শ্লেষযুক্ত বাক্যটি সুদীপ্তের উদ্দেশ্যে ছুড়লেন, “শুক্কুরবার রাতে কি সন্তোষী-মার জন্য রাত্রি জাগরণ করতে হচ্ছে?”

“নাঃ মানে স্যার, চিৎপুরের দিকটা আজ অস্বাভাবিক জ্যাম ছিল, মানে কোনোদিন এরকম দেখিনি..” সুদীপ্তর মুখটা হোমওয়ার্ক না করা ক্লাস ফোরের ছাত্রের চেয়েও করুণ দেখালো। পর পর তিন মাস টার্গেট ফেল করেছে সুদীপ্তদের সেলস টীম। স্বাভাবিক তার পর দেরিতে আসার এরকম ক্লিশে অজুহাত শুনে বস নিশ্চই চুক চুক শব্দ করে সমবেদনা জানাবে না। তাই মিঃ দত্ত আবার শুরু করলেন, “হুম, এবারে দেখছি চিৎপুরের ফ্লাইওভারটা না তৈরী করলেই নয়, দেখি মেয়রের সাথে কথা বলে কিছু করা যায় কি না! ঘোষ (সুদীপ্তর পদবি ধরেই বস ডেকে থাকে তাকে) তোমাকে হোয়াটস্যাপে পাচ্ছি না কেন?” হোয়াটস্যাপ!! সুদীপ্তর কার্জন জমানার মোবাইলে সাদা কালো এসএমএস আর ওই খেয়ে খেয়ে সাপ লম্বা হওয়া খেলাটা ছাড়া আর কিছুই যে নেই। তাই সে বললো, “স্যার আমার ফোনটা একটু

পুরোনো তো বোধহয় তাই পাচ্ছেন না।" বস এতক্ষন ঠান্ডা মাথায় কথা বলছিলেন ,এবারে টেবিল চাপড়ে চিল্লিয়ে উঠলো, "তবে সেটা ফেলে দাও। গেট এ স্মার্টফোন, ইনস্টল হোয়াটস্যাপ। কানেক্ট উইথ দা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড এন্ড গেট সাম ক্লায়েন্টস ইউ ডাম্বঅ্যাস। এ ভাবে চললে পরের মাস থেকে তোমাকে কেন আমাকেও আর এই অফিসে আসতে হবে না।"

ঝাড়টা যদিও পুরো টিমের জন্যই ছিলো কিন্ত বন্দুকটা ছিল এই দফায় সুদীপ্তর ঘাড়ে। পাশের কিউবিক্লে বসা অরুনাভ ছেলেটি বেশ চালাক চতুর, আগের মাসে এই মাগ্গির বাজারেও দুটো প্রপার্টি সেল করেছে তাও আবার তার মধ্যে একটা কমার্শিয়াল। কানাঘুষো শোনা যায় যে ও নাকি অন্যের ক্লায়েন্টকে অফিসের বাইরে থেকে পাকড়াও করে কাফে-কফিডেতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বাড়তি ডিসকাউন্ট দিয়ে সেলস ক্লোস করে। বস ও এই মন্দায় বাড়তি ডিসকাউন্টের ব্যাপারে সেরকম একটা মাইন্ড করেনা। একবার তো এই ছোকরা নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে প্রপার্টি অ্যাড দিয়েছিলো ক্লাসিফাইড কলামে, রবিবারে সবার ছুটি থাকে তাই সেদিন অনেকেই ফ্ল্যাট দেখতে বেরোয়। ওর সেই অ্যাডে ছিল সাইটে এলেই প্রচুর ছাড়ের স্পট অফার। তারপর যখন বাকিরা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে অরুনাভ তখন চুপি চুপি ক্লায়েন্টদের সাইট দেখিয়ে জনৈক রেস্তোরাঁয় এগ্রিমেন্ট সই করিয়ে নিচ্ছিলো। সুদীপ্ত ওকেই জিজ্ঞেস করলো, "তোমার ফোনটা কি মডেল গো?" কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে চোখ না সরিয়েই সে উত্তর দিলো, "স্যামসুং গ্যালাক্সি ৩"। সুদীপ্ত অতসত কিছু বোঝেনা তাই সে আবার জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা এটা দেড় দুইএর মধ্যে কি পাওয়া যাবে, মানে সেকেন্ড হ্যান্ড।" এবারে অরুনাভ ঘাড়টা ঘোড়ালো, "আমারটা কোনোদিন ড্রেনে পড়ে গেলে তোমাকে আমি এমনিতেই দিয়ে দেবো। ওরে বাবা এতো টেনশন নিচ্ছ কেন? ওই নতুন রিসেপশনিস্ট কাম এইচ আর ম্যানেজারটাকে দেখো না। চাম্পু মাল, দুটো ফোন চারটে সিম আবার প্রত্যেক মাসে কমদামিটা বদলে লেটেস্ট মডেল হাতে চলে আসছে। এই বাজারে এই মাইনেতে তা কিভাবে সম্ভব সেটা আবার আমার কাছে জানতে চেয়ো না। যাও ওকেই জিজ্ঞেস করো যদি এই মাসেরটা তোমাকে কমসম করে বেচে।" সুদীপ্তর আর সেই সাহস হয়ে ওঠেনি, এমনিতে বেচুবাবুরা কেনার বেলায় বেজায় আনাড়ি হয় সেটা সবাই জানে। নাঃ আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। ফেরার পথে সুদীপ্ত পাড়ায় হুলোর চায়ের দোকানে ঢুঁ মারলো, ওখানে এইসব সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল হ্যান্ড টু হ্যান্ড কেনা বেচা হয়। ফ্ল্যাটবাড়িতে মেস করে থাকা প্রাইভেট কলেজের ছাত্ররা মূল খদ্দের। হুলো কাকে যেন মনোযোগ দিয়ে ঠিকানা বাতলে দিচ্ছিলো আর বেঞ্চিতে দুটো ছোকরা গোছের ছেলে কানে স্পিকার গুঁজে তাদের মোবাইলে খুট খাট করছিলো। সুদীপ্তর দিকে নজর পড়তেই হুলো জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার স্যার, আজকে কি পথ ভুলে?" সুদীপ্ত একটু হাসি দিয়ে বললো, "না রে কাজের যা চাপ বাড়ি ঢুকতে ঢুকতেই তো বেরোনোর সময় হয়ে যায়। বলছি শোননা একটা ভালো স্মার্টফোন হবে, সস্তায় কাজ চালাবার মতো?"

হুলো ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, "বাজেট কত?"

"এই ধর দেড় থেকে দুই।"

"হুম হবে তবে ব্র্যান্ডেড নয়, চাইনিজ মাল চলবে?"

“ফোনটা চললেই আমার চলবে মানে গান, সিনেমা কিছু চাই না শুধু মেইল আর হোয়াটস্যাপ হলেই হবে।”

“আরে বাবা মেল ফিমেল সব আছে, তবে ১৭০০ এর কমে এক পয়সা দিতে পারবোনা।” এই বলে হুলো তাকের ওপর থেকে একটা ইয়া পেল্লায় স্ক্রিনওয়ালা একখানি ফোন বার করলো। পেছনের দিকটা ঘষে মেজে সব উঠে গেছে আর চার্জারটাও অদ্ভুত গোছের। নিচের দিকটা হালকা করে চীনা ভাষায় কি একটা লেখা আছে। সুদীপ্ত এবার নিজের সিমটা ওটাতে ভরে স্ক্রিনে আঙ্গুল বোলাতে বোলাতে হুলোর কাছ থেকে প্রথম টাচফোনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জেনে নিতে থাকলো। কি জটিল রে বাবা! এর চেয়ে আগেরটার বোতাম সিস্টেম অনেক ভালো ছিল। যাই হোক হুলোকে এবারে সুদীপ্ত তার প্রাচীন সেটটা দেখিয়ে বলল, “এটা তুই রেখে দে আর ২০০ টাকা কম নে।”

“২০০ টাকা! তোমার মাথা ফাথা পুরো গেছে, ওটা কে নেবে? তুমি বরঞ্চ ১৬৫০ আর তোমার দাদু সেটটা দাও, ওটা আমার ওই বাসন যে মাজে সেই ছেলেটাকে দিয়ে দেব। “যাই হোক ১৬০০য় রফা হলো ও স্মার্টফোন বাগিয়ে সুদীপ্ত স্মার্ট কায়দায় বাড়ির দিকে রওনা দিলো। গিন্নি তো এমনিতেই টং হয়ে ছিল দেরি করে আসার জন্য তার ওপর আবার যা যা আনতে বলেছিলো সেগুলো একটাও আনেনি সুদীপ্ত। আর এই ফোনটা বার করতেই গৃহস্থ জীবনের পরপম্পরা মেনে ভীষণ এক আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়লো, “তোমার কাণ্ডজ্ঞান কোনোদিনই ছিল না, এখন তো দেখছি তোমার সাধারণ বুদ্ধিটাও পুরোপুরি গেছে! মাসের শেষে সংসার সামলাতে আমি এদিকে হিমশিম খাচ্ছি, বুবলুর স্কুলের মাইনে বাকি, একটা ছাতা কিনে আনতে বললে আনো না – আর দুম করে একটা নাম না জানা কোম্পানির ফোন কিনে বসলেন উনি। না বস বলেছে। তা ল্যাপটপ, ডাটা কার্ড কোম্পানি দিলে ফোনটাও তো ওরা দিতে পারে।” সুদীপ্ত একবার একটু চেষ্টা করেছিল বুঝিয়ে বলার যে কোম্পানির যা অবস্থা তাতে একটা পেন কিনতে রিফিল ফোরায় তো ওর মতো আন্ডারপারফরমারকে স্মার্টফোন দিতে গেলে তো ওরই চেয়ার টেবিল বেচতে হবে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! শনিবারের রাতের শেষ পরিচ্ছেদটা “থাকো তুমি এই পোড়া সংসার নিয়ে ,আমি যেদিক দু চোখ চায় চলে যাবো।” মার্কা উপসংহারীয় হুঙ্কার দিয়ে ইতি হলো।

পরের দিন রবিবার, মানে বাঙালির জীবনে সপ্তাহের সব থেকে আকাঙ্খিত দিন। সুদীপ্তর সকালটা কাটলো বাজারে গুঁতো খেতে খেতে ত্যাড়াব্যাঁকা সবজি ও ফরমালিন মারা মাছের ডেডবডি কিনতে কিনতে। গিন্নি কথা বলছে না, বলবেও না, তাই সুদীপ্ত গুটি গুটি পায়ে বাজারটা রান্নাঘরে রেখে নতুন ফোনটা নিয়ে তদারকি করতে বসলো। বুবলু ইতিমধ্যে বাবার ল্যাপটপ খুলে বাবার কার্ড ব্যবহার করে ফোনে ইন্টারনেট প্যাক ভরিয়ে দিয়েছে। হোয়াটস্যাপ ইন্সটল করে অনেককে মেসেজও পাঠিয়ে দিয়েছে। সাধে বলে পরের জেনারেশন স্মার্টার দ্যান দা প্রিভিয়াস! সুদীপ্ত বুবলুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, “আর কি কি লাগে রে ওই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্ট করতে?” বুবলু কি বুঝলো কে জানে, নিজের পড়াশুনা মগডালে তুলে গম্ভীর ভাবে গুছিয়ে বসলো ওর পাঞ্জার চেয়ে বড় ওই যন্ত্রটিকে নিয়ে। একটু ঘাঁটে আর বাবাকে শেখায়, “এগুলোকে বলে ইমোটিকন আর এইভাবে তুমি স্ক্রিনশট নিতে পারো।” বাবা অবাক বিস্ময়ে দেখে যায় তার উত্তরসূরির মগজের দৌড়! হঠাৎ এক জায়গায় বুবলু থমকে গিয়ে বলে, “এখানে ফ্লাইট মোড, সাইলেন্ট মোড ছাড়াও আরেকটা কি মোড আছে। দেখোনা বাবা কি ভাষায় লেখা আমি বুঝতে পারছি

না।" সুদীপ্ত ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলো সত্যি চীনা ভাষায় কি একটা লেখা ও তার পাশে মোড কথাটা ইংরেজিতে। গুগল খুলে এই শব্দটার মানে জানলেই তো হয়ে যাবে। কিন্তু চীন হরফ টাইপ করবে কি করে? এমন সময় বুবলুর মা ঘরে ঢুকে ঠান্ডা গলায় বললো, "বুবলু চান করে খেয়ে নাও। টেবিলে তোমার ও বাবার খাবার ঢাকা দেওয়া আছে।" সুদীপ্ত গিন্নির পারা খানিকটা নেমেছে দেখে একটু খুশি মনেই ঝটপট চান সেরে পুত্রকে নিয়ে কোনোরকমে দুটি গিলে আবার পরে গেলো ফোনটার পেছনে। এবারে বিছানায় গাটা এলিয়ে বাবা ঘাঁটাঘাঁটি করে আর পাশে শুয়ে ছেলে ঢুলুঢুলু চোখে চেয়ে দেখে। জিমেইলটা এখানেই সেট করতে হবে, ফেসবুকও করা যাবে। কিন্তু আবার সেই অজানা মোডটা যে কি সেই কৌতূহলটাই সুদীপ্তর মনে খচখচ করতে থাকে। বুবলু ঘুমিয়ে পড়েছে, গিন্নি টিভিতে সিরিয়াল দেখছে। বিকেলে চা করে মুখের কাছে ধরে মান ভাঙাতে হবে। অলস দুপুর, কাজ কর্ম নেই, ভরা পেটে একটু নতুন ফোন কাঁটাছেঁড়া করতে অসুবিধে কি? নাঃ সেই মোডটা এবার টাচ করে এক্টিভেট করলো সুদীপ্ত , সঙ্গে সঙ্গে ফোন জিজ্ঞেস করলো 'ল্যাঙ্গুয়েজে'? সুদীপ্ত হাফ ছেড়ে বাঁচলো কিন্ত চুজ করতে গিয়ে দেখলো ইংলিশ বলে কোনো অপশনই নেই, সবই চীনা জাপানি বা হিব্রুর মতো ঠেকছে । সে চীনা ভাষার মতো কিছু একটা বেছে নিতেই এবারে অদ্ভুত একটা স্ক্রিন এলো – ফরওয়ার্ড আর ব্যাকওয়ার্ড বোতামের মতন দুটো অপসন ও নিচে সেই চীনা ভাষায় কি যেন একটা লেখা। সুদীপ্ত ব্যাক বাটনটা ছুঁতেই একটা ক্যালেন্ডার মতন ইন্টারফেস এলো যাতে সাল ও তারিখগুলো ইংরেজি হরফেই দেখাচ্ছে। এবারে সুদীপ্ত বেছে নিলো ১৯৭৭ সালের ১৬ই এপ্রিল ও ডান টাচ করতেই তার মাথা বোঁবোঁ করে ঘুরতে লাগলো, গলা শুকিয়ে আসছে, ঝড়তিপড়তি পৈতৃক বাড়িটা নতুন নতুন ঠেকছে। খানিকটা জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়ে এবারে সে চারপাশটা ঠিক করে দেখতে লাগলো। একি! এ তো সে ৪০-৫০ বছর পিছিয়ে গেছে মনে হচ্ছে। রাস্তায় বেড়িয়ে মাথাটা কিরকম আরো বেশি বোঁবোঁ করতে লাগলো। মোড়ের দোকানে ক্যাটক্যাটে হলুদ রঙের গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেটটার দাম বলছে সাড়ে তিন টাকা, দশ টাকার নোট দিলে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে দোকানদার, যেন বলছে এটা কোন দেশের টাকা? সালা চিনে ফোনটা কি তাহলে টাইম মেশিন নাকি? কথায় বলে না ওই ক্ষুদে চক্ষুগুলো সব পারে! চায়ের দোকানে পড়ে থাকা একটা খবর কাগজে চোখ পড়তেই সুদীপ্ত দেখলো গাভাস্কার ওয়েস্ট ইন্ডিজে নাকি হেব্বি পেঁদিয়ে সেঞ্চুরি বানিয়েছে, কি প্রশংসা। কাগজটা তুলে প্রথম পাতার নিচে দেখলো সোনার দাম লেখা আছে ৪৮৬ টাকা ভরি, ওপরে তারিখটা সেই ইংরেজিতে ১৬ই এপ্রিল ১৯৭৭ ও বাংলায় ৩রা বৈশাখ ১৩৮৪! আনন্দে প্রায় চোখে জল চলে এলো সুদীপ্তর! এবারে ৪৮৬ টাকায় কিছু সোনা কিনে সোজা ২০৩০ তে গিয়ে বেচে নোটের বান্ডিল গুটিয়ে নিয়ে বসের মুখে ইস্তফাটা ছুড়ে মারবে সে। শুধু পুরোনো কয়েক গাছি নোট জোগাড় করতে হবে, সাথে পুরোনো কিছু জামা কাপড় আর চুলটা একটু বড় করে রেখে টেরি কেটে নিলেই কেল্লা ফতে। পুরোনো নোটের জন্য দশ বছর করে পিছিয়ে যেতে যেতে কালেকশন করলেই হবে। পুরোনো জামা মানে বাবার পুরোনো পাঞ্জাবি পায়জামাতো আছে, বেশি বেগ পেতে হবে না। চুল কাটাতো ব্যক্তিগত ব্যাপার, ও চিৎপুরের আব্দুলকে বললেই দিব্য ম্যানেজ করে নেবে। প্রথমে একটা ভালো ফ্রিজ কিনবে ভাবলো সুদীপ্ত তারপর একটা আর-ও লাগাবে রান্নাঘরে, বুবলুকে ডিপিএসে ভর্তি করাবে -যা ডোনেশন লাগে তার দুগুণ দেবে , তারপর ব্যাংকক পাট্টায়া টুর পুজোর সময় ..... টুইন ট্যং টিং ট্যাঁও....টুইন ট্যং টিং ট্যাঁও....টুইন ট্যং টিং ট্যাঁও.... একি ফোনটা

এরকম আওয়াজ করছে কেন? বিগড়োলো নাকি, ফিরবো কি করে? প্রায় দম বন্ধ হতে হতে সুদীপ্ত ছিটকে উঠলো। পাশে বুবলু অকাতরে ঘুমোচ্ছে। বাইরের ঘর থেকে টিভির আওয়াজ আসছে। ফোনটা সেই বেজে চলেছে টুইন ট্যং টিং ট্যাঁও.... টুইন ট্যং টিং ট্যাঁও...করে। নতুন ফোন কোনো নম্বর সেভ নেই তাই ফোনটা তুলতেই ওপার থেকে চেনা গলায় শব্দ ভেসে আসলো, "কি হে, হোয়াটস্যাপ তো নাহয় লাগালে, এবার সেটা ঘন ঘন চেক কে করবে? দুটো লিড দিয়েছি, একটার ক্লোসিং আমার কালকের মধ্যে চাই-চাই। এক্ষনি ফোন করে কালকে ফার্স্ট হাফে মিটিং সেট করো!"

গ্রীষ্মের প্রলাপ

শাক্য মুনি

এপ্রিল ১১, ২০১৬

আলো ফোটার সময় হয়ে এলো। অন্ধকার আকাশের গায়ে ঝাপসা দাগ। প্রতিবেশীর অ্যালার্ম ঘড়িটা প্রস্তুত হচ্ছে বেজে ওঠার জন্য। খুব ভোরে তাদের দিন শুরু হয়। যেমন শুরু হয়েছে কোকিলটার। গত দশ মিনিট ধরে তারস্বরে ডেকে চলেছে শিমূল গাছের ডালে বসে। আমার জীবনে কোকিলের ডাকের মত বিষণ্ণতা আর কিছু নেই। কোকিলের ডাক মানেই অ্যানুয়াল পরীক্ষার ঘণ্টা... সেই স্মৃতির ভূত তাড়া করে আজও গ্রীষ্মের শুনশান দুপুরগুলোতে! বাচ্চাবাচ্চা ছেলেমেয়েরা ভেজা চুল টেরি কেটে কপালে দই এর ফোঁটা মেখে প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে দেখলে স্যাডিস্টিক আনন্দ হয়! মনটা হালকা হয়ে আসে তখন। আনন্দে বিড়ি ধরাতে ইচ্ছে করে। তারপর গায়ে লাগে বসন্তের দখিনা পবন। অহো! ললিত বসন্ত বিলাসে কে আসে এই মধুর পিয়াসে... বড় হয়ে ওঠার মত আনন্দ আর কিছুতে নেই। যারা ছোটবেলাটাই ভালো ছিল ইত্যাদি নেকুপুশু আদিখ্যেতা করে করে ফেসবুকের দেওয়াল ভরিয়ে ফেলে তারা আসলে জোচ্চোর এবং অসৎ।

আমার জীবনে ছোটবেলার মত বোরিং পিরিয়ড আর নেই। বিশেষ করে ইস্কুল জীবন। ওহ কি অসহ্য সেই ১১ টা থেকে ৪টে পর্যন্ত ইস্কুল নামক নরকের কড়াইতে ভাজা ভাজা হওয়া। আমাদের স্কুলটা ছিল একটা বহু প্রাচীন সরকারী স্কুল। ফলে দু' একজন বাদে অধিকাংশ মাষ্টারমশাইরা মানুষ হিসাবে ছিলেন আদ্যান্ত বোরিং এবং ক্লান্ত। সরকারী চাকরীর কর্মহীন সংস্কৃতি আর নিজেদের জীবনের নানাবিধ ফ্রাস্ট্রেশান তাদের চাল চলনে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রতি মুহূর্তে প্রতীয়মান হয়ে উঠত। তাদের মুখমণ্ডলের কুঞ্চিত বলিরেখায় ফুটে উঠতো জীবনের প্রতি এক তীব্র বিতৃষ্ণা। ছাত্রদেরকে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং স্কুলপাঠ্য বইয়ের জগতের বাইরেও যে একটা অন্য জগত রয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য নিজেদের যে পরিমাণ অধ্যাবসায় ও এন্থুসিয়াসম প্রয়োজন হয় তার কোনটাই বেশীরভাগ মাষ্টারদের মধ্যে ছিলোনা। ফলত তাঁরা যখন ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে থোড় বড়ি খাড়া অঙ্ক বা বিজ্ঞান ঘষতেন বা ইতিহাসের কোনও একটা বিবর্ণ অধ্যায় রিডিং পড়তে বলে বসে বসে ঢুলতেন তখন আমার চোখ চলে যেত জানলার বাইরে দিয়ে রাস্তার ওপারের বাড়ির কার্নিশে বসে থাকা বেড়ালটার দিকে। বেড়ালটার চোখের মধ্যে দুটো কাঁচের গুলি ছিল, যা থেকে নানা রঙের আবছা ও নরম আলো প্রতিফলিত হয়ে এসে পড়তো আমার অঙ্ক খাতার সাদা ক্যানভাসে। আর আমি এক অদ্ভুত অচেনা বিস্ময়ে ক্যাবলার মত সেই সব নাম না জানা আলোদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। এক সময় স্যার এসে কান মুলে বা মাথায় চাঁটি মেরে আমার নেশা কাটাতেন। ক্লাস ভর্তি ছাত্ররা হেসে উঠতো হো হো করে। বেড়ালটাও হাসতো। আমি বলতাম, "দেখুন স্যার বেড়াল টা কেমন হাসছে"। স্যার দেখতে পেতেন না। ঘন হলদেটে সবুজ থকথকে পিচুটিতে ঢাকা চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকাতেন।

“বেড়ালটা হাসছে, তাই না? জানোয়ার ছেলে...” বলতে বলতে শুরু হত কিল চড় ঘুষি বর্ষণ। বখাটে ছাত্রের ফচকেমিতে এমব্যারাসড মাষ্টারমশাই এর তখন গোটা ক্লাসের সামনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান বাঁচানোর লড়াই! সময় মত ডিএ না পাওয়ার যন্ত্রনা, কলিগ এর কোচিং ক্লাসের পসারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, স্ত্রী কে বিছানায় সুখী করতে না পারার হতাশা, পুরনো স্টাফ কোয়ার্টারের ফুটো ছাত থেকে জল পড়ার বিরক্তি, এই সমস্ত বঞ্চনার জমে থাকা ক্ষোভ যেন এই বখাটে স্কুল ছাত্রের ফচকেমিতে আগুনে ঘি দেওয়ার মত অব্যর্থ ভাবে আউটবার্স্ট করতো। ছোটবেলায় প্রচুর খেলাধুলো করার ফলে আমার সহনশক্তি কিঞ্চিৎ বেশী ছিল, ফলে আমি প্রায় নির্বিকার মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে মার খেয়ে যেতে পারতাম। আর এর ফলে স্যারের ফ্রাস্ট্রেশান আরো বৃদ্ধি পেত, মারের টেম্পার ক্রমশ বাড়তে থাকতো। কিন্তু এই মারের চোটে আমার যত না কষ্ট হত তার চেয়েও বেশী খারাপ লাগতো স্যারের জন্য। মনে হত প্রেমিকার মত কোলের উষ্ণ উদ্দীপনায় শুইয়ে বিলি কেটে দিই ওই অর্ধেক পেকে যাওয়া চুলের গোড়ায়। শীতল পাটির স্নেহ-সজ্জায় শুইয়ে হোমো সোহাগে ভরিয়ে দিই ওই বুভুক্ষু শরীরের প্রতিটি ব্যর্থ গ্রন্থি কে। কতদিন মানুষের ভালোবাসা পায়নি ওই হৃদয়, আহা! কতদিন পৃথিবীর সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত ওই প্রাণ, হায়! একটা অদ্ভুত মায়া হত। এখনও হয়।

***

এপ্রিলের শুরুতেই এ বছর ভয়ানক দাবদাহের চোটে সকলের অবস্থা ঢিলে। যদিও আমার গরম খুব একটা খারাপ লাগেনা। বস্তুত আমি গরম ভালোবাসি বললেও খুব একটা ভুল বলা হয়না। গরমের দুপুর গুলো আমার চিরকাল বেশ হ্যালুসিনেটিং মনে হয়। চারিদিক গরমে থমথম করছে, রাস্তায় জনপ্রাণী নেই, পশু পাখি সব ছায়ার আশ্রয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে, এরকম সময়গুলো আমার বিশেষ প্রিয়। বারান্দায় দাঁড়ালে মনে হয় যেন কোনও পরিত্যক্ত ডেসার্টেড শহরকে দেখছি। মরুভূমিতে বেড়াতে যাওয়া আমার হয়নি, কিন্তু এই সময়গুলো মার্কেজ এর গল্পের অদ্ভুত রুক্ষ মরু শহরগুলোর কথা মনে পড়ে। যেন একটা কঠিন রোগের প্রকোপে গোটা শহরের সব লোক মারা গেছে, আর তাদের ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর জীবনের আজন্মলালিত ছেঁড়া খোঁড়া স্বপ্ন গুলোর মধ্যে আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। উল্টো দিকের ফ্ল্যাটের বারান্দার দড়িতে দুটো সায়া আর একটা গেঞ্জি কেচে ঝুলিয়ে দেওয়া আছে। হয়ত বাথরুমের এক কোণে জড়ো করা সার্ফের প্যাকেটটাও এখনও রাখা আছে, কাচার পরে যেমন রাখা হয়েছিল। সায়ার দড়িতে ভুলবশত একটা গিঁট পড়ে রয়েছে, যেটা হয়ত এক সময় কেউ খোলবার চেষ্টা করেছিল ও ব্যর্থ হয়েছিল। মাঝে মধ্যে ছুটে আসা গরমের হল্কা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে কাগজের টুকরো, ঠোঙা। ঠোঙার গায়ে ছাপার অক্ষরে প্রতি টা শব্দ যেন নৈর্ব্যক্তিক, মুক্ত প্রাণ। মানুষের প্রয়োজনে অর্থ ভারে অন্তঃসত্বা হয়ে ওঠার দায় নেই আর তাদের। দেওয়ালে পশ্চিম বঙ্গের বিধানসভা ভোটের দেওয়াল-লিখনের রঙ চঙে আঁকাজোকা গুলো যেন মানবেতিহাসের সুদীর্ঘ চিত্রনাট্যে এক ঝলক কমিক রিলিফ! হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা ভোগের ইতিহাসে আরও কিছু মৃত নাম, মৃত শহরের দেওয়ালে লেগে রয়েছে স্বাদগন্ধহীন পরিত্যক্ত চুইংগামের মত! ফ্ল্যাটের সারি সারি ঘরগুলোর প্রতিটা জানলা কালো কাচে ঢাকা, কেননা মৃত্যুর পরেও আমাদের সম্পত্তি আমাদেরই থেকে যায়। তাই মৃত্যুর আগে

মানুষ বন্ধ করে রেখে যায় তার সমস্ত জানালা। জীবন্ত মানুষ চায় সেই মৃত জানলায় উঁকি দিয়ে দেখে নিতে। কিন্তু তারা আসলে ভয় পায় সেই জানালা খুলতে। অথচ তারা জানেনা যে জানালা বন্ধ করে রেখে মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। আমাদের ঠাকুর ঘরের বেদীতে আমার মৃত ঠাকুরদা'র এক জোড়া চটি রাখা আছে এখনও। যদিও ঠাকুরদা মৃত, কিন্তু চটি গুলো আজও ঠাকুরদা'র-ই। এভাবেই বন্ধ জানালার এপারেও মৃত্যু আমাদের সঙ্গেই রয়ে যায় ছায়ার মত। প্রতিদিন সকলের অলক্ষ্যে আদায় করে নেয় বাতাসা ও জল।

***

বেসিক্যালি আমার জীবনটা একটা শূন্য থেকে শুরু করে আরো একটা বিশাল শূন্যের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু তার জন্য কোনো ক্ষোভ বা হতাশা যে আছে তা বলা যায় না। আলস্য আমার অঙ্গের ছাল, অপদার্থতা আমার মস্তকের তাজ, ব্যর্থতা আমার হস্তের আয়ুধ। এখন বসে আছি আমার অন্ধকার ঘরটাতে, পিছন থেকে একটা টেবিল ফ্যান ঘরঘর শব্দ করে আমার ভার্জিন নিতম্বে ঠাণ্ডা হাওয়া যুগিয়ে চলেছে, আর আমি এই প্রায় বারো বছরের বুড়ো কম্পিউটারের স্ক্রিনে চোখ রেখে যা মনে হচ্ছে টাইপ করছি। আজ আটাশে চৈত্র, শুক্লা চতুর্থী, রাত তিনটে কুড়ি। সন্ধ্যের দিকে আমার বাড়ির পশ্চিমে দুটো সুপুরি গাছের পিছন থেকে একটা কাস্তের মত চাঁদ উঠেছিল, এখন সেটার মধ্য গগনে থাকার কথা।

চারিদিকের পরিবেশ পরিস্থিতি বেশ গোলমেলে। সে সব নিয়ে তাই আজকাল আর ভাবিনা। যা হচ্ছে হোক, মরুগগে যাক! কোনও এক প্রকারে নিজের বরাদ্দ সময়টাকে কাটিয়ে যাওয়াটাই একমাত্র উদ্দেশ্য। কে যেন বলেছিল বেঁচে থাকতে গেলে নাকি একটা ছাপ রেখে যেতে হয়। কিন্তু আমার ছাপ রেখে যাওয়ার কোনও দায় নেই। কাফকা নাকি মরবার সময় নিজের সব লেখাপত্র পুড়িয়ে দিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ম্যাক্স ব্রড কাফকার কথা রাখেনি। সে সব কিছু পাবলিশ করে দিলো। অনেকে বলে ম্যাক্স ব্রড পৃথিবীর সাহিত্যকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেসলো। আমার তো মনে হয় পুড়িয়ে দিলেই ভালো হত। কারণ মৃত্যুর পরেও কাফকার লেখা কাফকারই সম্পত্তি। একজন মানুষ মৃত বলেই তার সঙ্গে এভাবে কথার খেলাপ করাটা মোটেই ভালো কাজ নয়। কাফকা চায়নি কোনও ছাপ রেখে যেতে। পৃথিবীর মানুষের প্রতি কোনও দায় তার ছিলোনা, না থাকাই স্বাভাবিক। যেমন একজন মুক্তকচ্ছ সন্ন্যাসী একদিন সংসারের পাট চুকিয়ে দিয়ে হিমালয়ের পথে চলে যায়। আর কেউ খোঁজ পায় না তার। অথচ তথাগতকে ফিরে আসতে হয়েছিল। কিসের টানে? ধর্মসংস্থাপনার্থায়? নাকি ছাপ রেখে যাওয়ার তীব্র বাসনা? কাফকা পেরেছিলেন নৈর্ব্যক্তিক শূন্যতায় পৌছতে, বুদ্ধ পারেননি।

আসলে গরম পড়লেই আমার মাথার ভিতরে এইসব নানাবিধ ভুলভাল চিন্তা ভাবনা ঘুরতে শুরু করে। কোনটার সঙ্গে কোনটার কোনো যোগাযোগ নেইও, আবার আছেও, আবার আছেও এবং নেইও, আবার এ দুটোর কোনটাই নয়! আমি জোর করে চেষ্টা করি সবাইকে এক সূত্রে গেঁথে নিজস্ব প্রকৃতি রচনা করার। কিছুই হয় না বুঝতে পারি, কারণ কিছুই আসলে হওয়ার নেই। শূন্য থেকে শূন্য গেলে শূন্যই পড়ে থাকে। তাই সব ছেড়ে জানলার দিকে তাকিয়ে শুয়ে

শুয়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করি। জানালার বাইরে অন্ধকার রাত দেখতে পাই। দেখতে পাই গ্রীষ্মের দাবদাহে হিমায়িত মৃত শহরটাকে। আর দেখতে পাই জানলার বাইরে শূন্যে লটকে থাকা সেই বেড়ালের হাসিটা!

হিমঘরে দুজন

তৃতীয় পাণ্ডব

জানুয়ারী ১৮, ২০১৬

শতদ্রু-র কথা

এখন কেউ কেমন আছো জিজ্ঞেস করলেই,

কেমন যেন খুন চাপে মাথায়...

সেই অফিস-CAB গুলোর পিছনের কাঁচে

HOW AM I DRIVING, সাথে একটা দাঁত-ক্যালানো SMILEY?

অনেকটা সেরকম লাগে নিজেকে।

ভালো তো থাকতেই হবে,

আর পাঁচজনের থেকে।

নইলে কেন এই অবিরাম ছুটে চলা,

নিরন্তর সিঁড়ি ভাঙা?

খেলবো না বললেও চলবে না...

মাঠ থেকে ফেরার রাস্তাটাই ভুলে মেরে দিয়েছি!

এ ছোটা দিগন্তের দিকে নয়।

দিগন্ত টানে না আর

ঘর ও না...

বাড়ির নাম ভালো-বাসা

আরেক অন্তহীন ন্যাকামি...

ইঁট, পাথর, সিমেন্ট, বালির জঙ্গলে

বহুদিন আগে মরে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া একটা লাশ,

ঘুরে ফিরে বেড়ায়।

ইচ্ছে করে, না দেখার ভান করি,

সপ্তাহান্তে কথাও বলে দুএকটা...

মনে পড়িয়ে দেয় এক কালে গানও গাইতো

কোন প্রস্তর-যুগে, কে জানে!

যখন ছোট ছিলাম...

আমি কে, কোথা থেকে এলাম

কোথায় যাব, এ জীবনের পরে

ভাবনা গুলো কুরে কুরে খেত।

অনন্তের মাঝে বিন্দু-সম অস্তিত্বের ভার নিতে না চেয়ে

একছুটে মায়ের আঁচলে লুকোতাম

পৃথিবীর সবথেকে নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় ভেবে...

বড় হলাম, আশ্রয় বদল হল।

কলেজ, বন্ধু, প্রেম, বিয়ে

ভুলেই গেছিলাম ভয় পেতে – বহুদিন।

এখন আবার, ভয়-টা ফিরে আসছে...

বৃত্ত সম্পূর্ণ হল।

ঋতুজার কথা

দুপুর গুলো কাটতে চায় না আর

একা একা কথা বলি, আরও ফাঁকা হয়ে যাই...

খাঁ খাঁ গলি রোদে পুড়ছে – ভালোবেসে।

ফেরিওয়ালার হাঁক,

পাশের গাছে চড়াই-এর কিচিরমিচির

নিজের হাতের চুড়িগুলোর ঠুনঠুন

...সব এক লাগে।

এ ঘর ও ঘর করি,

গীতাঞ্জলী-র পাতা উলটাই,

আখতারী বেগম গজল শোনায়,

মন ভালো করার চেষ্টায়।

মাঝে মাঝে হঠাৎ-কালো-মেঘও

একসাথে ভেজার ডাক দেয়...

ছাতের দরজা হাট করে খুলে দেয় কালবৈশাখী।

কিন্তু আমি যে জীবাশ্ম হয়ে গেছি ...

এরকম এক দুপুরেই, তোতন আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল,

শতদ্রু তখন অফিস টুরে, দিল্লীতে...

দুদিনের জ্বর এসে, নিয়ে গেল ওকে

কত আলোকবর্ষ দূরে, কে জানে!

বছর-কয়েক পরে

ডিভোর্সটা নিয়েই নিলাম শতদ্রু-র থেকে

বিছানা আলাদা আগেই...

মন দুটো তো আরও আগে।

কেমন যেন পালিয়ে বেড়াত শেষদিকে

আমিও তো দূরে, ক্রমে দূরে সরে গেছি

তাই, একেবারে মুক্তি নিয়ে

এখন আমি কালিম্পং-এ

কচিকাঁচা গুলোর আঁকার দিদিমণি।

দিনের বেলাটা বেশ কাটে

ওদের ফুল, পাতা, পাখী চেনাতে, আঁকাতে

ছুটির পরে কোনওদিন উমার সাথে,

কোনওদিন একাই -

হাঁটি, পাহাড়ের বাঁক চিনি

শীতটাকে জড়িয়ে নিই গায়ে

মেঘ কুয়াশার লুকোচুরি দেখি

অলস নিরুদ্দেশ পায়ে...

সূর্য যখন পাহাড়ের কোলে টুপ করে ডুবে যায়

ঘরে ফিরি অনিচ্ছুক।

সেই এক ঘর, এক রাত্রি

এক আলো, এক অন্ধকার

প্রতিটা কোণ এত চেনা যে, চোখ বন্ধ করে

বলে দিতে পারি, কোথায় কি আছে

ফাঁকা ঘরটা যেন গিলতে আসে...

শতদ্রু দূরে ছিল, তবু ছিল তো,

এখন আমি আর আমার একলা অন্ধকার

রাতে ঘুমের মধ্যে বড্ড চেনা হিমঘরটাকে খুঁজি,

খুঁজি একটা ঠাণ্ডা ছায়ামানুষকে

হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চাই,

হোক না দূরত্ব সহস্র মাইল।

ভয় পেয়ে ঘুম ভাঙে...

একা অন্ধকারে।

পাখী ডাকছে, ভোর হল বলে।

ছোট্ট দুটি গল্প

পাগলা দাশু

নভেম্বর ২৮, ২০১৫

[বহুদিন কিছু লেখা হয়নি, মানে কাজের চাপে আর তালেগোলে একেবারেই সময় করে ওঠা হয় না। এদিকে অনেক কিছু লেখার প্ল্যান করে রেখেছি। আস্তে আস্তে আবার লেখার অভ্যেসটা ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই ভাবলাম আজ ছোট্ট দুটো গল্প দিয়েই শুরু করি। ঠিক গল্প নয় যদিও, সত্যি ঘটনা।

দুটো ঘটনাই শিকাগো নিয়ে। সেরকম মারাত্মক স্পেশ্যাল কিছু নয়। তবে কয়েকদিন আগেই জানতে পারলাম এই দুটো ঘটনার কথা, আর আমার মনে হয় বাকিদের জানানোটাও একটা কর্তব্য। আজ আমরা যা করব, তা যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ এটা।]

গল্প ১

বিখ্যাত (বা কুখ্যাত) ক্রিমিনাল আল কাপোনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। একসময় শিকাগোর সর্বেসর্বা ছিলেন এই মাফিয়া। যেকোনো রকমের ক্রাইমেই তাঁর সুনাম আর পারদর্শিতা দুইই ছিল। খুন, জখম, রাহাজানি থেকে শুরু করে ড্রাগ বা মেয়ে পাচারের ব্যবসা সবেতেই সমান ছিলেন আল কাপোনে। আর এই করে করে প্রচুর বড়লোক হয়ে গিয়েছিলেন। খুবই স্বাভাবিক, নয় কি?

তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে কোনোদিন আইনের কাছে পরাস্ত হননি আল কাপোনে। পুলিশ তাকে ধরলেও বিচারকের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে সবসময়ই ফাঁক খুঁজে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন এই দুর্ধর্ষ গ্যাংস্টার। আর এর সমস্ত কৃতিত্বের দাবীদার হলেন তাঁর উকিল – 'ইজি এডি' নামেই যিনি পরিচিত ছিলেন। এই গল্প আজ তাকে নিয়েই।

শোনা যায়, এডি নিজের পেশায় ছিলেন অদ্বিতীয়। ক্রিমিনাল লইয়ার হিসেবে তাঁর জুড়ি মেলা ছিল ভার। আইন যত পোক্তই হোক না কেন, ঠিক তাঁর কোনও একটা খুঁত বের করে সেটাকে কাজে লাগাতেন এই ভদ্রলোক। আর তাঁর দক্ষতাতেই কাপোনেকে দীর্ঘদিন পুলিশ জেলে ঢোকাতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই কাপোনে প্রচুর মাইনে দিতেন এই উকিলকে। শুধু তাই নয়, এর সাথে আরও প্রচুর সুযোগ ভোগ করতেন এডি। টাকার অভাব ছিল না আল কাপোনের। তাঁর উকিলকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার জন্য তাই বিশাল একটি ম্যানসন বানিয়ে দিয়েছিলেন। শিকাগোর বুকে এই ম্যানসন প্রায় একটু পুরো ব্লক নিয়ে ছিল। যারা ব্লক সম্পর্কে খুব ভালো জানেন না, সাধারণত এক একটি ব্লক ১৬০,০০০ বর্গফুট নিয়ে থাকে। বুঝতেই পারছেন এডি এবং তাঁর পরিবার কিরকম সুখে থাকতেন।

কিন্তু এই বিশাল টাকায় মোড়া আপাত সুখী জীবনের মোহ একদিন অবশেষে কাটল এডির। ক্রিমিনাল লইয়ার হিসেবে সারাদিন আইনবিরুদ্ধ কাজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হলেও এডি সবসময় চেয়েছিলেন নিজের ছেলেকে ঠিক-ভুলের ফারাক শেখাতে। পৃথিবীর অন্যতম সেরা গ্যাংস্টারের উকিল বলেই বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি তিনি বুঝেছিলেন ছেলেকে এর থেকে বাইরে রাখাটাই শ্রেয়।

আর এই মনোভাবই শেষ অবধি কাল হয়ে দাঁড়ায় এডির কাছে। সমস্ত ভুল সংশোধন করার উদ্দেশ্যে একদিন পুলিশের কাছে গিয়ে সব ঘটনাই খুলে বলেন এই ভদ্রলোক। আল কাপোনে ঘুণাক্ষরেও টের পাননি যে এরকম ঘটতে চলেছে। যখন পেলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

তবে এর শোধ নিতে দেরি করেননি কাপোনে। স্বীকারোক্তি দেওয়ার কিছু বছরের মধ্যে শিকাগোর এক শুনশান রাস্তায় অবিরাম গুলিবর্ষণ হয় ইজি এডির ওপর। পুলিশ যখন তাঁর রক্তাক্ত দেহ খুঁজে পায় তখন এডি ইহলোকের মায়া কাটিয়েছেন। এডির পকেট থেকে পাওয়া গিয়েছিল রবার্ট স্মিথের একটি কবিতা,

“The clock of life is wound but once,

And no man has the power

To tell just when the hands will stop

At late or early hour.

To lose one's wealth is sad indeed,

To lose one's health is more,

To lose one's soul is such a loss

That no man can restore.

The present only is our own,

So live, love, toil with a will,

Place no faith in "Tomorrow,"

For the Clock may then be still.”

গল্প ২

এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ঘটনা। আমেরিকার একজন লেফটেন্যান্ট ছিলেন বুচ ওহেয়ার। আরও একটু বিশদে বলতে গেলে তিনি ছিলেন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার লেক্সিংটনের এক ফাইটার প্লেনের পাইলট।

একদিন বুচ এবং তাঁর পুরো স্কোয়াড্রনকে একসাথে পাঠানো হয় এক মিশনে, কিন্তু আকাশে উড়েই বুচ লক্ষ্য করেন যে একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গিয়েছে। পুরো মিশন শেষ করে আসার মত জ্বালানী নেই প্লেনে। যার ওপর সেই দায়িত্ব ছিল, তাঁর ভুলেই এই গণ্ডগোল। অন্য কোনও উপায় না দেখে বুচ পিছু হটতে বাধ্য হন, আর বেসক্যাম্পের দিকে রওনা দেন।

হঠাৎ ফিরতিপথে বুচের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। তিনি দেখেন যে একদল জাপানী ফাইটার প্লেন উড়ে চলেছে আমেরিকান ফ্লিটের উদ্দেশ্যে। বুচের অভিজ্ঞতা নিমেষে বুঝিয়ে দেয় যে এ এক উভয়সংকট – আগেভাগে গিয়ে ফ্লিটকে সতর্ক করা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেরকম অসম্ভব, সেরকমই অসম্ভব স্কোয়াড্রনকে খবর দিয়ে তাদের নিয়ে এসে জাপানীদের আক্রমণ করা। এক মুহূর্তের অপেক্ষা, তারপরই বুচ সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন কি করা উচিত তার।

নিজের কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে প্লেন নিয়ে তিনি একাই আক্রমণ করেন পুরো জাপানী স্কোয়াড্রনের দিকে। প্রচণ্ড দক্ষতার সাথে এদিক থেকে ওদিকে উড়তে উড়তে একের পর এক গুলি চালাতে থাকেন সবকটা প্লেনের দিকে। হতচকিত জাপানী পাইলটেরা কি করবে বুঝে ওঠার আগেই উপর্যুপরি গুলি আসতে থাকে তাদের দিকে।

বলা বাহুল্য, বুচের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। এই হঠাৎ আক্রমণে পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জাপানী স্কোয়াড্রন। এমনকি গুলি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বিন্দুমাত্র না দমে বুচ নিজের প্লেন নিয়ে সোজা গিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করছিলেন শত্রু প্লেনের গায়ে। আর এই পুরো সময়টাতেই অসামান্য দক্ষতায় নিজেকে এবং নিজের প্লেনকে অক্ষত রেখেছিলেন তিনি। শেষ অবধি তিনি পাঁচটি জাপানী এয়ারক্রাফটকে ধ্বংস করতে পেরেছিলেন। খুবই স্বাভাবিকভাবে, কিছুক্ষণ পর রণে ভঙ্গ দিয়ে ফেরত যায় বিপর্যস্ত জাপানী স্কোয়াড্রন।

বুচ নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যান ফ্লিটে আর গিয়ে সবই জানান। প্লেনের গায়ে বসানো ক্যামেরা থেকে পুরো ঘটনাটাই দেখতে পান বাকি অফিসারেরা। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই আমেরিকান নেভির হয়ে প্রথম WWII Flying Ace হওয়ার গৌরব অর্জন করেন তিনি। মেডেল অফ অনারও দেওয়া হয় বুচকে।

এক বছর পর মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করেন এই পাইলট। তাঁর এই সাহসী জীবনের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি তিনি পান তাঁর শহরের লোকেদের থেকে। শিকাগোর বাসিন্দা লেফটেন্যান্ট বুচ ওহেয়ারের নামেই এই শহরের ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের নাম ওহেয়ার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট।

পুনশ্চ: বলতে ভুলে গেছি, বুচ ওহেয়ারের বাবার নাম ছিল এডওয়ার্ড জে ওহেয়ার, যাকে সবাই 'ইজি এডি' বলেই চিনত। শেষ জীবনে ভদ্রলোকের সৎ হওয়ার চেষ্টা বৃথা যায়নি, কি বলেন?

ভূত-ভবিষ্যৎ

তৃতীয় পাণ্ডব

জুন ৩, ২০১৬

পৃথিবীতে আজ দিন নেই, রাত নেই। অদ্ভুত আবছা আঁধার সব সময়। শুনশান ফাঁকা সরীসৃপের মতো পিচরাস্তা। হলুদ চাঁদের ল্যাম্পপোস্ট পাহারা দিচ্ছে তার মৃতদেহ। হাওয়ার নামগন্ধ নেই চারপাশে। গাছের পাতা নড়ছে না, কিন্তু গরমও নেই খুব একটা। হঠাৎ করে যেন সব ঘড়ি থেমে গেছে, নিমেষে। একটা অতিবুড়ো ফোকলা তেঁতুল গাছের মগডাল থেকে, কোত্থেকে একটা প্যাঁচা উড়ে গেল, ডানা ঝাপটে। আলপিন-পতন নিঃশব্দ একটু হলেও চমকে গেল, মুহূর্তের জন্যে। আবার যেই কে সেই, আগের মতো, দেওয়ালে ঝোলানো ছবির মতো। গাছের নিচু একটা ডালে বসে, পা দোলাতে দোলাতে পুরোনো কথা ভাবছিল, বলরাম সাঁপুইয়ের ভূত। কোন সাল এটা? মনে করতে পারে না। জীবনে একবার করা চোলাইয়ের নেশাটাকে যেন কেউ, মাথার চোরা-কুঠুরীতে আটকে চাবিটা হারিয়ে ফেলেছে। একটা স্বপ্নের ঘুম ভাঙে আরেকটা স্বপ্নে। নাকি এটাই অন্য কারও দীর্ঘ না-শেষ স্বপ্নধাঁধা একটা? যেখানে সে ঢুকে তো পড়েছে, কিন্তু বেরোনোর রাস্তা ভুলে মেরে দিয়েছে, বেমালুম।

এতসব গুরুগম্ভীর চিন্তার মাঝে, হঠাৎ মাথার চুলে টান পড়ল বলরামের। উফফ্, চমকে উঠে আরেকটু হলেই নিচে পড়ত, সটাং। পেছন ফিরে দেখে, মধুমিতা। একহাত জিব কাটল তাড়াতাড়ি। দেখেছো, একদম ভুলে মেরে দিয়েছে। কিন্তু, কি যে ছাতার মাথা ভুলেছে, সেটা আর মনে করতে পারছে কই? কেমন মাথার মধ্যেটা, কলকাতার শীতের খুব-সকালের ধোঁয়াশাতে হাঁকু-পাকু। মেয়েটার নাম স্পষ্ট ঘাই মেরে উঠল। কিন্তু, তার সাথে কোন জন্মের সম্পর্ক, ভূত-জন্ম, নাকি তার আগের মানুষ-জন্মের? সেটা মনের গলি-ঘুঁজি, তস্য কোণঠাসা বাঁক ঘেটেও, মনে করতে পারল না সে।

- সঙের মতো এখানে বসে আছো কোন আক্কেলে, শুনি! পাঁচদিন ধরে বলদ-খোঁজা খুঁজে যাচ্ছি। বলি, শুনতে পাচ্ছো?!

রীতিমতো ঝাঁঝালো মেজাজ। এতো বড্ড মুশকিল হল! নাম যখন মনে আছে, ভালোই চেনে, ধরা যায়। অপ্রস্তুত হওয়ার থেকে বাঁচতে, ডাল থেকে একলাফে নিচে নেমে লম্বা, সিড়িঙ্গে পা দুটো চালিয়ে হাওয়া হল সেখান থেকে। মরুক গে, পরে মনে পড়লে, সামলে নেওয়া যাবে।

হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে গিয়ে ল্যাণ্ড করল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাথায়। শ্বেতপাথরের পরীটার কাঁধে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে সতর্ক-দৃষ্টি চালালো চারদিকে। নাঃ, দৃষ্টি-সীমার মধ্যে একটা মানুষের ছায়া নেই। কানাঘুষো শুনতে পায়, মানুষ ব্যাপারটাই নাকি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে। কি যেন এক ছাতার মাথা, মহামারিতে একের পর এক মরছে টপটপ করে। সবাই যদিও ভূত হয়না, তাও অবস্থা এমনই, চার পাঁচ মাইলে এক-আধজনের সাথে ধাক্কা লেগেই

যাচ্ছে। অথচ, কিছুদিন আগে পর্যন্তও অবস্থা এত খারাপ ছিল না। আচ্ছা, পৃথিবীটা কি ভূতের রাজ্য হয়ে যাবে এবার? আর মানুষের ভয়ে, গাছের কোটরে পিঁপড়েদের সাথে, কারখানার চিমনিতে কালিঝুলি মেখে, পুরোনো ভুলে যাওয়া ডায়েরির পাতায় চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে থাকতে হবে না! বেশ হয় কিন্তু, তাহলে। আনন্দের চোটে, হাওয়ার মধ্যেই চরকি-পাক নেচে নিল বলরাম।

মনের উত্তেজনাটা থিতোলে, চারদিকটা ভালো করে দেখল সে। একটু একটু করে কুয়াশা চিরে রোদ বেরোনোর মত, মনে পড়ছে যেন অনেককিছু। কিন্তু টুকরো ছবি, ছেঁড়া ছেঁড়া। এখানে অনেক লোকজন আসত একসময়। গাড়ি, ঘোড়া, মানুষজনে সব সময় সরগরম থাকতো জায়গাটা। চকিতে কয়েকটা স্মৃতি অস্তিত্ব জানান দিল, বায়োস্কোপের মতো। বিয়ের পর নতুন বৌ কে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখাতে এনেছিল সে। গাঁয়ের মেয়ে, বাপের জন্মে কলকাতা শহর চোখে দেখেনি। হাত ধরে রাস্তা পার করাচ্ছে, মাথায় ঘোমটা বোকা হাবা অবাক চোখ মেয়েটাকে। একটু দূরে একটা গঙ্গার ঘাট ও আছে, হাওয়া দিত খুব। বৌ এর মুখটা মনে পড়ছে না তেমনভাবে, কিন্তু ভাব ভালবাসার অভাব ছিল না তখনকার পৃথিবীতে।

হঠাৎ, একটা খিটকেল হাসিতে ঘোর ভাঙে বলরামের। চেয়ে দেখে, এক ফোকলা দাঁত বুড়ো মিচকে হাসছে, তার দিকে তাকিয়ে।

- কি হে সাঁপুইয়ের পো? সেই কখন থেকে পাশটিতে বসে আছি, গেরাহ্যই করছ না তো।

- কি, চিনতে পারলে না তো? না চেনারই কথা। ভাগ্নীটা যখন এসে কেঁদে পড়ল, তুমি নাকি তাকে দেখেই পগারপার দিয়েছ, তখনি বুঝেছি। তা, নিজের দুনিয়া তে থাকলেই হবে? ওদিকে বৌটা যে তোমার চিন্তায় পাগল হওয়ার জোগাড়!

আচ্ছা, মধুমিতাই তাহলে তার বোকা হাবা বৌটা। কিন্তু ঠিক মেলাতে পারছে কই? কাঁচা ঘুম ভাঙা চোখে একটু আগে দেখা স্বপ্ন গুলোর মত জট পাকানো সব।

- বলি, এবার এট্টু সংসারে মন দাও। এই বুড়ো, থুত্থুড়ে পৃথিবীটা আর বেশিদিন নেই। মহামারি গ্রাম শহর সব উজাড় করে ছেড়েছে। যদ্দিন আছ, পুরনো সময়ে আটকে না থেকে, ভূতজীবনটার মজা লোটো।

- চার পাশের অবস্থা তো দেখছ। হাওয়া চলে কিনা বোঝার জো নেই। সুয্যি ওঠে না। আবার করে মরার তো ভয় নেই! তালে অত চিন্তা কিসের? অবশ্যি, গ্রহটা হুট করে একদিন না থাকলে, আমাদের কি গতি হবে, সেটা তর্কসাপেক্ষ আর ধোঁয়াটে ব্যাপার। বলি, কথাগুলো কানে যাচ্ছে?

বুড়োর এই বদঅভ্যেস! সুযোগ পেলে জ্ঞান দেবেই। মনে পড়ছে অনেক কিছু। কারখানা লক-আউটের পর যখন না খেতে পেয়ে পথে বসার জোগাড়, কালীঘাটের এই মামাশ্বশুরের কাছেই তার বাবুদের বাড়ি সিঁদ কাটার হাতে খড়ি। বৌ অনেক করে না করেছিল। একদিন বৃষ্টিতে মাঝরাতে চুরি করতে গিয়ে, গোপাল নস্করের বুড়ি মাকে জাগিয়ে

ফেলল ভুল করে। বুড়ি তখন চিল-চিৎকার করে পাড়া মাথায় করে আর কি! পালাতে গিয়ে পা পিছলে সোজা ঘোষেদের দীঘির সাইজের পুকুরে! ছোট বেলা থেকে কোনও দিন সাঁতারটা না শেখার জন্য, বেশ আফসোস হচ্ছিল ডুবতে ডুবতে।

আকাশের দিকে তাকাল বলরাম। ঈশাণ কোণে বেশ মেঘ জমেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে থেকে থেকে। বজ্রগর্ভ কয়লা-কালো মেঘে আকাশটা দেখাচ্ছে একটা উপুড় করা বিশাল কালো পাথরবাটির মত। বৃষ্টি এল চরাচর জুড়ে। ফাঁকা রাস্তার ধারে গাছগুলো উপুর চুপুর ভিজছে, ভালোবেসে। মনে পড়ে, বৌটাও খুব ভালোবাসত ভিজতে। মেঘ ডাকলেই, টানাটানি করত ছাতে যাওয়ার জন্যে। হালকা করে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল, মনে মনে। নাঃ, বুড়ো ঠিকই বলেছে! তারই ভিমরতি ধরেছে। দেখা যাক, সেই পুরনো নতুন বৌটাকে খুঁজে পায় কিনা! নন্দকিশোর এখনও বকে চলেছে, নিজের খেয়ালে, অঝোর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে। বুড়োর চোখ এড়িয়ে, পরীর মাথার ওপর থেকে, সাট্ করে হাওয়া হল বলরাম সাঁপুই।

খোদার ওপর খোদকারি

প্রত্যয়

ফেব্রুয়ারী ৫, ২০১৬

জিনোম এডিটিং নিয়ে সম্প্রতি একটা সেমিনার শুনতে শুনতে খেয়াল হল খোদার ওপর খোদকারিতে কতটা এগিয়ে গেছি আমরা। জিনোম এডিটিং নিয়ে গবেষণা নতুন নয়, কিন্তু CRISPR নামক টেকনোলজির উদ্ভাবনের পর তা হয়ে গেছে অত্যন্ত সহজ এবং সস্তা। সত্যি কথা বলতে CRISPR আসার পরও হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন, তার চেয়েও উন্নত টেকনোলজিও শিগগিরই আসছে বলে শোনা যাচ্ছে।

ওপর ওপর বললে এর অর্থ আমাদের কারো জিনে কোনো গোলযোগ দেখা দিলে সেটাকে এডিট করে ঠিক করে দেওয়া যাবে হয়তো ভবিষ্যতে। অদূর ভবিষ্যতেই মানবভ্রূণের জেনেটিক গোলমাল ঠিক করা সম্ভব হবে। বংশ পরম্পরায় চলে আসা জেনেটিক অসুখ ভ্রূণ অবস্থাতেই মুছে দেওয়া যাবে এডিট করে। শুধু গোলমালই বা কেন? ধরা যাক আমরা জানতে পারলাম অমুক অমুক জিনগুলি লম্বা হবার জন্য দায়ী, তখন কোনো বাবা মা লম্বা ছেলে হোক চাইলে চট করে ভ্রূণের সেই জিনগুলো পছন্দ মত এডিট করে নিতে পারবেন, এমন দিনও আসতে পারে! ভ্রূণ অবধিও যাবার দরকার হবেনা, এমনকি শুক্রাণু বা ডিম্বাণুকেও পছন্দ মত এডিট করে নেওয়া যেতে পারে।

এই প্রযুক্তি নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের অন্যতম জেনিফার ডুডনা এসেছিলেন ওই সেমিনারে টক দিতে। অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রমহিলা। তাঁর সঙ্গে সেমিনার রুমের বাইরে কথা বলেও ভালো লাগল, জানতে পারলাম অনেক কিছু। জানতে পারলাম চিকিৎসা শাস্ত্রের ভবিষ্যত সম্ভাবনার কথা, আবার সেই সঙ্গে বিজ্ঞানীদের কিছু আশঙ্কার কথাও!

এই ধরনের টেকনোলজি জেনেটিক অসুখের, বিশেষ করে জন্মগত অসুখের, চিকিৎসায় নতুন দিশা দেখাতে পারে। আবার অন্য প্রাণীর দেহ থেকে অঙ্গ ট্রান্সপ্লান্ট করাও সম্ভব হতে পারে এর দৌলতে। জীববিজ্ঞানী এবং ডাক্তাররা আগেই ভেবেছেন যে অন্য প্রাণীর থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানবদেহে ট্রান্সপ্লান্ট করা যায় কিনা। এখনও অবধি উত্তর হল – না, যায়না। অনেক আশঙ্কা রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা, তা হল অন্যান্য প্রাণীর জিনগত গঠন সম্পূর্ণ আলাদা, তাই সেটা আমাদের দেহের সঙ্গে খাপ খাবেনা। জিনোম এডিটিং টেকনোলজি সফল হবার পর কিন্তু কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করছেন যে ট্রান্সপ্লান্ট এর আগে এই ধরনের এডিটিং এবং আরো কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে এই ট্রান্সপ্লান্ট করা সম্ভব হলেও হতে পারে! অন্য প্রাণীর থেকে করা সম্ভব না হলেও অন্য মানুষের থেকে ট্রান্সপ্লান্ট এর সময়ও এই টেকনোলজির ব্যবহার করা যেতে পারে।

কিন্তু খারাপ দিক কি কিছু নেই? আজেবাজে লোকের হাতে পড়লে এর ভয়ঙ্কর ফল হতে পারে। যুদ্ধ করার কৌশলই বদলে যেতে পারে এই ধরনের টেকনোলজির হাত ধরে। ইতিমধ্যেই ব্যবসায়ীরা উঠে পড়ে লেগেছেন এই গবেষণার

দখল নিতে। নিয়ন্ত্রিত আকারে বাজারে এসে গেছে জিনোম এডিটিং টুল এডিটাস। গবেষণা ভালো করে শেষ হবার আগেই যত্রতত্র বাণিজ্যিকভাবে প্রয়োগ হতে থাকলে কিন্তু তার ফল বিপজ্জনক হতে পারে। ধরুন মানবভ্রূণের জিনোম এডিট করতে গিয়ে কিছু ক্ষতিকর দিক জানা গেল পরবর্তীকালে, সেই ক্ষতি কিন্তু শুধু সেই ব্যক্তিটিরই হবেনা, হবে সমস্ত ভবিষ্যত প্রজন্মের। সেই ক্ষতি যদি রিভার্সিবল না হয়? তখন?

তাই জিনোম এডিটিং এর এথিকাল দিক নিয়ে এখনও প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। কতটুকু গবেষণা করা যাবে, কতটুকু না, সেই নিয়ে নানান দেশের নানা আইন। চীনে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীরা অনেক এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছেন বলে দাবি। চীন এই ধরনের এথিক্সকে একটু কমই গুরুত্ব দেয় সাধারণত, কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব এখনও একমত না কতটুকুর মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। গতকালই ব্রিটেন অনুমতি দিয়েছে মানবভ্রূণের ওপর গবেষণা চালানোর।

যা দিয়ে শুরু করেছিলাম। খোদার ওপর খোদকারি! জেনিফার মজা করে বলছিলেন এ যেন এমন যে জিনোম এর সিকুয়েন্স লিখতে গিয়ে ঈশ্বর কিছু টাইপো করে ফেলেছেন, আমরা তার প্রুফ দেখে সেই টাইপো ঠিক করছি। ঈশ্বরের বানানো এই দুনিয়ায় (অবিশ্বাসীরা পছন্দ মত পালটে নিয়ে পড়ুন) অনেক ইমপারফেকশন আছে, এ কথা প্রায় সবাই স্বীকার করবেন। এই প্রসঙ্গে জর্জ কার্লিনের একটা শো থেকে কোট করার লোভ সামলাতে পারছিনা –

“Something is wrong here. War, disease, death, destruction, hunger, filth, poverty, torture, crime, corruption, and the Ice Capades. Something is definitely wrong. This is not good work. If this is the best God can do, I am not impressed. Results like these do not belong on the résumé of a Supreme Being. This is the kind of shit you'd expect from an office temp with a bad attitude. And just between you and me, in any decently-run universe, this guy would've been out on his all-powerful ass a long time ago.”

কেউ বলেন ওই খুঁতগুলো জরুরি, ওগুলো ইচ্ছে করেই করা। আবার একদল সেই খুঁতগুলো মেরামত করতেই সারা জীবন কাটিয়ে দেন। এই বিতর্কের মধ্যে ঢুকবনা। তবে ওই দ্বিতীয় দলের প্রাণপাত করে বানানো জিনিসগুলো যখন আমরা হরদম ব্যবহার করে চলেছি সুখে থাকার জন্য, আরো ভাল করে, আরো বেশি বাঁচার জন্য, তখন খোদার ওপর খোদকারিকে নিন্দা করি কোন মুখে!

তা খোদার ওপর খোদকারি তো মানুষ করে আসছে সেই কবে থেকেই। ঘরবাড়ি বানানো থেকে শুরু করে রোগের চিকিৎসা, জন্মনিয়ন্ত্রণ, পেসমেকার, অনেক দূরই এগিয়েছি আমরা। তবে প্রাণের মূলে যা আছে, সেই জায়গায় গিয়ে এডিট করতে পারা এই খোদকারির লিস্টিতে নিঃসন্দেহে একটা বড়সড় সংযোজন। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন আমাদের প্রতিটা অ্যাকশনই নাকি ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমাদের নিজের ইচ্ছা বলে আসলে কিছুই নেই। সেই তত্ত্ব মানলে এসবই “তাঁর” ইচ্ছা। তাই আর বেশি ভেবে লাভ নেই। তবে কিনা ভাবব কি ভাববনা সেটাও তো তিনিই ঠিক করে দেন... তাহলে?

সত্যজিত রায় ফেলুদার গপ্প লিখতে গিয়ে ফেলুদা তোপসের কিরকম তুতো দাদা সেই নিয়ে অল্প ছড়িয়ে ফেলেন। একেক গল্পে একেক রকম লিখেছিলেন তিনি। পরে এই গোলমাল ধরতে পেরে আরেকটা গল্পে ফেলুদাকে দিয়েই বলিয়ে নেন ভুলটার কথা, নিজের তৈরি করা চরিত্রকে দিয়েই শুধরে নেন নিজের ভুল। আমাদের এই খোদার ওপর খোদকারিও কি তেমনটাই?

এক জোগাড় দুই পদ : সাদাশাহী মুরগি ও দুধসাদা মিষ্টি

শ্রীরূপা

এপ্রিল ৯, ২০১৬

হাতে সময় খুব অল্প । বন্ধুরা আসবে, সবাই আড্ডা দেবে। তখন কি আর রান্নাঘরে থাকতে ইচ্ছে করবে? তাই চটপট একই জোগাড়ে দুটো পদ রেঁধে ফেললে কেমন হয়?

আমাদের সবার বাড়ীতেই আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা অতিথি আসলে আমাদের বাঙালি হেঁশেলের মেনুতে প্রধান যে দুটো খাবারের নাম থাকেই তা হল মাংস এবং মিষ্টি। মাংসের একটা বিশেষ পদ আর বিশেষ এক ধরনের মিষ্টি তৈরির উপকরণ গুলি এক হয় তাহলে হেঁশেলের কাজ চটজলদি মিটিয়ে তাড়াতাড়ি হুল্লোড়ে যোগ দেওয়া যায়।

আজ ইচ্ছে হেঁশেলের ভালবাসার আঁচে সাধ স্বপ্নের কড়াইতে আশার খুন্তি দিয়ে তৈরি হচ্ছে সাদাশাহী মুরগি এবং দুধসাদা মিষ্টি। এমন দুটি পদ যা খুব সহজ অনায়াসে বানিয়ে ফেলা যায় এবং অতিবড় নিন্দুকও এই রান্না খেয়ে প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। আর নিজেরও চেখে মনে হয় "নাহ!!! রান্নাটা আমি ভালই করি।"

বিশেষ জোগাড় যা দুটি পদেই লাগবে তা হল -

কাজু (৫০ গ্রাঃ)

কিশমিশ (৫০ গ্রাঃ)

চালমগজ (৫০ গ্রাঃ)

নারকোল কোরা (ইচ্ছে মতন, বেশি দিলে খেতে বেশি ভাল হবে)

দুধ (৫০০ মিলি)

ছোটো এলাচ দানা (৪-৫)

(মাপযোগে আমি বরাবরই খুব কাঁচা, পরিমাণ কম বেশি নিজেদের মতন করে নিতে পারেন, তবে দুটি পদের জন্য এই পরিমাণটাই সঠিক হবে বলে আমার মনে হয়।)

বিশেষ উপকরণের প্রস্তুতিঃ

কাজু, কিসমিস, চালমগজ, নারকোল কোরা আর এলাচ দানা দুধের মধ্যে দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিতে হবে। তারপর নামিয়ে ঠাণ্ডা করে ছেঁকে দুধটা আলাদা করে দিয়ে মিক্সার গ্রাইণ্ডার বা শিল নোড়ায় বেটে নিতে হবে (খুব মিহি করে বাটবেন না)। ঐ বাটনা টা আবার দুধের সাথে মিশিয়ে খানিকক্ষণ ফুটিয়ে, নামিয়ে, দুভাগ করে রেখে দিতে হবে। এক ভাগ মাংসে আর এক ভাগ মিষ্টি তৈরিতে ব্যবহার হবে।

সাদাশাহী মুরগি

বিশেষ উপকরণ ছাড়াও আর যা টুকটাক লাগবে তা হলঃ

মুরগির মাংস (১ কেজি)

পিঁয়াজ কুচি (অনেকটা)

রসুন কুচি (বেশ খানিকটা)

আদা কুচি (রসুন কুচির থেকে একটু কম)

ধনে পাতা কুচি (ইচ্ছে মতন)

ক্যাপসিকাম কুচি (ইচ্ছে মতন)

কাঁচালঙ্কা কুচি (ইচ্ছে মতন)

টক দই (২০০ গ্রাঃ)

শুকনো লঙ্কা (৪-৫ টা)

ছোট এলাচ (৪-৫ টা)

লবঙ্গ (২-৩ টা)

দারচিনি (১ টা)

দুধ (এক কাপ)

নুন (যেমন খান)

চিনি (সামান্য)

সাদা তেল (বেশ খানিকটা)

রান্না শুরু

পিঁয়াজ কুচি কিছুটা রেখে বাকি পিঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, আদা কুচি, লঙ্কা কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, ধনে পাতা কুচি একসাথে বেটে নিতে হবে। এবার ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখা মাংসে এই বাটনা, আগে করে রাখা বিশেষ বাটনা, টক দই, নুন, দুধ এবং সামান্য সাদা তেল দিয়ে মেখে কমপক্ষে আধ ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দিতে হবে।

এবার কড়ায় সাদা তেল গরম করে তাতে বাকি পিঁয়াজ কুচি, শুকনো লঙ্কা, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, সামান্য চিনি ফোড়ন দিয়ে খানিকটা ভাজা হলে তার মধ্যে ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে, ভাল করে মিশিয়ে চাপা দিয়ে দিতে হবে। এবার মাঝে মাঝে চাপা খুলে বেশ করে নেড়ে চেরে কসিয়ে আবার চাপা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে আবার কসাতে হবে। এইভাবে মাংস যখন সেদ্ধ হয়ে যাবে এবং গ্রেভি শুকনো হয়ে আসবে, তখন নামিয়ে নিতে হবে।

গরম গরম পরিবেশন করুন ঠোটের কোনে মিস্টি হাসি নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ।

বি.দ্রঃ i) এই মাংসের পদটি শুকনোই ভাল লাগে। তবে কেউ যদি শুকনো খেতে ভাল না বাসেন তাহলে গ্রেভি তে আরও খানিকটা দুধ মিশিয়ে দিতে পারেন। জল মেশাবেন না,স্বাদ কমে যাবে।

ii) কাজু আর দুধ থাকে যেহেতু তাই চাপা দিয়ে আড্ডা দিতে চলে যাবেন না যেন, ধরে যাবে, মানে পুড়ে যেতে পারে। কিছুক্ষন পর পরই চাপা খুলে নাড়তে হবে যাতে পুড়ে না যায়।

iii) সাদাশাহী মুরগি সবচেয়ে বেশি ভালোলাগে রুমালি রুটির সাথে, তাই যেদিন এটা বানাবেন সেদিন রুমালি রুটির আয়োজন রাখলে জমে যাবে। রুমালি ছাড়াও যে কোনো ধরনের রুটি,পরোটার সাথে ভাল লাগবে। তবে আমার কত্তার মতে ভাতের পাতেও দারুণ জমে সাদাশাহী মুরগি।

iv) একই ভাবে পাঁঠার মাংস দিয়েও ভাল হবে সাদাশাহী রান্না। ওজন, উচ্চ রক্তচাপ, ইউরিক অ্যাসিড এবং কোলেস্ট্রল বেশি বন্ধুদের মুরগিতেই থাকতে আনুরোধ করব কারন রান্নাটা এমনিতেই খুব রিচ হয়।

দুধসাদা মিষ্টি

বিশেষ জোগাড় ছাড়াও আরো টুকটাক যা লাগবেঃ

দুধ (১ লিটার)

কাজুকুচি (অল্প)

কিশমিশ কুচি (অল্প)

খেজুর কুচি (অল্প)

চিনি (স্বাদমতন)

কনডেন্সড মিল্ক (ইচ্ছেমতন)

নুন (১ চিমটে)

রান্না শুরুঃ দুধের মধ্যে অল্প চিনি আর এক চিমটে নুন দিয়ে ফুটতে দিতে হবে। দুধ ফুটে উঠলে তার মধ্যে বিশেষ বাটনাটি মিশিয়ে আবার ভালো করে ফুটতে দিতে হবে। যখন দুধ ঘন হয়ে আসবে তখন কনডেন্সড মিল্ক মিশিয়ে আরো বেশ খানিকক্ষণ ফোটাতে হবে। দুধ, বিশেষ বাটনা আর কনডেন্সড মিল্ক মিলেমিশে একাকার হয়ে খুব ঘন হয়ে এলে নামিয়ে কিছুটা ঠাণ্ডা করে তার ওপর কাজুকুচি, কিশমিশ কুচি এবং খেজুর কুচি ছড়িয়ে ফ্রিজে ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য রেখে দিতে হবে (ডিপ ফ্রিজে নয়)।

ঠণ্ডা ঠাণ্ডা দুধসাদা মিষ্টি পরিবেশন করে সবার মন ও মেজাজ মিষ্টি করে দিন।

বিঃ দ্রঃ i) বিশেষ মিশ্রণে কিশমিশ ও কনডেন্সড মিল্ক থাকায় পদটি যথেষ্ট মিষ্টি হবে। হালকা মিষ্টি পছন্দ করলে চিনি ব্যবহার নাও করতে পারেন।

ii) মিষ্টির ওপরে কাজু, কিশমিশ এবং খেজুরকুচির বদলে আপনারা আপনাদের ইচ্ছেমতন অন্যকিছু যেমন চকোলেট চিপস, পেস্তাকুচি, আমন্ডকুচি ইত্যাদি দিতে পারেন।

iii) এটা যেদিন বানিয়েছিলাম, ফ্রিজ থেকে বের করার পরই বন্ধুরা আমার রাঁধুনিসত্ত্বার মধ্যে যে ফটোগ্রাফার সত্ত্বা আছে তার বিকাশ ঘটতে দেবার কোন সুযোগ না দিয়েই হামলা চালিয়েছিল। তাই খুবই দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে এই মিষ্টির ছবি আমি দিতে পারলাম না।

ইস্কুলের গল্প

যদুবাবু

অক্টোবর ১০, ২০১৬

[ত্রৈলোক্যনাথ একজায়গায় লিখেছিলেন, 'মানুষ মরে গেলে ভুত হয়, আর ভুত মরে মার্বেল হয়', তেমনি আমাদের অনেক মুখচোরা, ভয় পাওয়া ইচ্ছেরা মরে তৈরী হয় এক-একটা মন-কেমন করা বিকেল, আর বিকেলগুলো মরে কী তৈরী হয় জানো?

বাজারের থলে দেখেছো? উল্টোলেই একটা দুটো পেয়াঁজের খোসা কোত্থেকে ঠিক বেরিয়ে পড়বে, সেইরকম কতগুলো জিনিষ কেমন করে যেন আলগা হয়ে লেগে থাকে আমাদের সাথে, কবে এসেছিলো জানিনা, আবার কোনদিন ঝাড়তে গিয়ে বেরিয়েও যাবে, তাই গল্পগুলো এইবেলা লিখে ফেলা ভালো।]

আমরা যে স্কুলটায় পড়তাম, তার নাম বরাহনগর মিশন, এবং তার নামকরণ যে সার্থক একথা কেউ কোনোদিন অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না, যদিও সরকারী বানানে 'হ'টা বেমালুম উড়ে গেছে কাউকে না বলে – আমাদেরও তাই আর কিছুই হয়ে ওঠা হয় নি শেষমেশ। তা এই বরানগর স্কুলে ওয়ান থেকে টেন অব্দি ক্লাস, প্রথম পাঁচটা ক্লাস ভেতরে প্রাইমারি, শেষের পাঁচটা সামনের খেলার মাঠের পাশেই, বি-আই কোম্পানির সঙ্গে পাচিঁল ভাগাভাগি করে। দিব্যি ছিলো স্কুলটা, পাড়াতেই রাজকুমারী স্কুল, আর রোজ সকালে ঠিক দশটা বাজতে দশে সামনে দিয়ে এক এক করে বাসগুলো যায়, একটা মাল্টিপারপাস, একটা নিবেদিতা, আর ফেরে বিকেলে ছুটির পর... ছেলেদেরও ওই দুবার শারুখখানী পোজ দিয়ে গেটের সামনে দাঁড়ানো ছাড়া খুব একটা জীবনে খুব যে আর বেশী উদ্দেশ্য-বিধেয় ছিলো এমন ভাব্বার সত্যিকারের কোনো কারণ নেই, তো মোট কথা দিব্যি ব্যাপারটা চলতো আস্তে আস্তে, ফিসফিস করে, যেমন সব ছোট্ট শহরতলিতে হতো সেই নব্বুইতে। সেই সাইকেল করে টবিন রোডের কাছে কোচিং, তার পাশেই জেরক্সের আর একটু এগোলে চপ-ফিশফ্রাই-এগরোলের দোকান — আর দোকানের পাশে মাঠ, "ছুটির বৈঠক"। ঠিক এই সন্ধ্যে ছটার সময় যদি যান, দেখবেন আলোগুলো আজকেও কেউ জ্বালতে ভুলে গেছে, এদিক ওদিক দূরে দূরে, ঠিক যতটা দূরে বসলে আর কথা বোঝা যায় না তেমনি দূরে কয়েকটা জমাট বাঁধা অন্ধকার। আমরাও আসুন একটা সাইড দেখে একটা সান্ধ্য আজকাল পেতে বসে পড়ি, সিগারেটও আছে, ঘটিগরমের লোকটাও আসবে এক্ষুনি, আমরা বরং হাঁটতে হাঁটতে ফিরে যাই সেই অবুঝ, অস্পষ্ট, অন্ধকার রাস্তাটায়, যার নামটা সবাই ভুলে গেছে, ল্যাম্পপোস্টের আলোয় খালি নম্বরটা পড়তে পারছি - ১৯৯৯।

সেই সময় স্কুলে একসাথে দু-দুটো ঘটনা ঘটলো। এক নম্বর, বলা-নেই-কওয়া-নেই দুম করে স্কুলে একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হয়ে গেলো, বোর্নভিটা অ্যাকাডেমির কাছে স্কুলের টিম গিয়ে শুন্য রানে অল আউট হয়ে ফিরে এলো – আর তাকে সামাল দিতেই হবে হয়তো, একটা গোবেচারা-পানা ছেলে গাঁতিয়ে পড়ে মাইধ্যমিকে ফার্স্ট হয়ে গেলো (আমার

ধারণা ছায়া প্রকাশনীর আদি-অকৃত্রিম পোস্টার বয় সেই, যদিও আমার গেঁজেল মেমোরি যা চায়, ইতিহাস তাই নয়)। তা এসব মহাজাগতিক ঘটনা চাক্ষুষ-টাক্ষুষ করে কয়েকটা জেনারেশন বাপ-মার মাথাটা গ্যালো বিগড়ে। হঠাৎ সবাই বুঝলো যে সাফল্যের চাবিকাঠি খুজঁতে আর টর্চ লাগবে না, এক্কেবারে হোলসেলে কিলো-দরে পাওয়া যাচ্ছে যোগেশদা-দিব্যদা-সুদীপ্তদার আখড়ায়। আমার বাপ-মা, অর্থাৎ আমি, যে এই রেনেঁশায় এক্কেবারে দুম করে গিলোটিন হয়ে গেছিলাম তা নয়, তবে অচিরেই দেখলাম স্কুলের পরে বাড়ি গিয়ে আর সাতটা পয়ঁতাল্লিশের চিত্রহার নেই, আছে হুড়ুদ্দুম করে 'অভাগীর স্বর্গে'র নোট টোকা। এমনকি রোববার সকালেও যে জম্পেশ করে চন্দ্রকান্তা কি কাহানি দেখবো আর ক্রূর সিং কে খিস্তাবো, সে গুড়ে বালি, চুন ও সুরকি। পি আচার্যের ভাষায় আমার দুর্যোগে তখন ঘনঘটার ভাগ্যাকাশ, কিন্তু ঠিক এই সময় একজন দারুণ লোকের সাথে আলাপ হয়ে গেলো, তার কোচিং-এ পড়তে গিয়েই – ভদ্রলোকের নাম সুভাষদা, সুভাষ মুখোপাধ্যায় – নাঃ সেই কবি সুভাষ নন, যিনি ফুল খেলবার দিন নয় বলে অদ্য মেট্রো স্টেশন হয়ে গেলেন, তবে এই গল্পটা ইনি না হলে হতোই না হয়তো...

সুভাষদা ঠিক কেমন ছিলেন বলে বোঝানো অসম্ভব, একটা গোলগাল পরিতৃপ্ত চেহারা, মাথায় একঝাঁক কোঁকড়া চুল, আর সত্যিকারের উদাত্ত গলা... সবথেকে বড়ো ব্যাপার, প্রথম দিন-ই ক্লাসের পর ডেকে বললেন বইয়ের ওসব বাজে কবিতা না পড়ে এসো আমরা টি এস এলিয়ট পড়ি, আর রিলকের দুইনো এলেজি ... আর শুধু ওই 'যদু হে, মাছ কিবা'র ভাব সম্প্রসারণ না করে, চলো বইটাই পড়ে ফেলি... এখন যখন পিছনে তাকাই, মাঝে মাঝে সেই বিকেলটার কথা মনে পড়ে, জয়েন্টের রেজাল্ট বেরোনোর পরের দিনই, সুভাষদার বাড়ির ছাদে আমরা বসে চা খাচ্ছি, খুব চুপচাপ, সেই মধ্যবর্তী নৈঃশব্দ – খানিকক্ষণ পরে সুভাষদাই ভাঙলেন, "তা তুমি যাদবপুরেই যাবে, সেই একটা টি কাঁধে ঘুরে বেড়াতে, আর গাছতলায় বসে গাঁজা খেতে?"... উত্তর দিতে পারিনি।

যাহোক, আমি আসল গল্পটার থেকে এদিক-ওদিক বাইলেনে ঢুকে পড়ছি, সেই ছোটোবেলার অভ্যেস তো, চট করে যেতে চায় না, না? তা এই গোটা টাইমটায় আমার একমাত্র অ্যাচিভমেন্ট বলতে গেলে ওই মাঠে দু-একবার সিগারেট খেয়ে দেখা, আর একবার ক্লাস মনিটর হয়েও স্কুল পালানো বন্ধুদের নাম হেডুকে না বলে দেওয়া — মোটামুটি ঐ বইতে আর নোটসে মুখ গুঁজেই কেটে যাচ্ছিল নাব্য নব্বুই, কোত্থেকে যে দখিন বাতাস ঢুকে একে একে সবকটা বন্ধুরই উইকেট ফেলে দিয়েছে সেটা বুঝতে একটু বেশ দেরি-ই হয়ে গেলো, একদিন দেখলাম কোচিং থেকে বাসস্ট্যান্ড অব্দি সঙ্গে হাঁটার আর কেউ নেই, সিগারেট টাও একাই কিনতে হচ্ছে স্কুলব্যাজ টা পকেটে লুকিয়ে।

নিয়তি দেখেছেন তো, নিয়তি? মাতালকে যা নিয়ে যায় বাংলার বোতলের দিকে, আর ডিপ্রেশানের রুগীকে রেললাইনের ধারে, এই সেই নিয়তি, তা প্রেমে আমিও ধপ করে পরেই গেলাম, সঙ্গে পড়ার মতন লোকের আর অপেক্ষা না করেই। সে এক দারুণ সময় বটে, যাই দেখি, বয়ঃসন্ধির ব্রণর মতন থেকে থেকেই অল্প বসন্ত জেগে ওঠে, সে কুমার শানুর নাকিগলায় গান শুনে-ই হোক, কিংবা টিভিতে ক্যাডবেরির অ্যাড দেখে। কিন্তু বিধি বাম, 'শুধাইলো না কেহ' ... হঠাৎ এই সময় একদিন দেখি কোচিং-এর পরই একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে গলির মোড়ে, হাত একটা সদ্য কেনা – রাংতাটাও না ছাড়ানো উইলস ফ্লেকের প্যাকেট ...

ছেলেটির আসল নামটা চেপে যাচ্ছি, ধরা যাক ওর নাম সন্দীপ আর ও সেদিন ওই সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে যার কথা বলবে বলে দাঁড়িয়ে ছিলো, তার নাম ধরে নেওয়া যাক অমৃতা ... সন্দীপ ভালো ছেলে, বাপে-মায়ে পড়িয়ে-পিটিয়ে মানুষ করছেন, ছেলেও কেসিনাগ-কেপিবোস আর মাইতি-সাঁতরা করে ফি বছর ক্লাসে জ্বলজ্বল করে ওঠে। যদিও বাংলাটা একটু ইয়ে, মানে জয়েন্টে লাগবে না কাজেই পড়ে খুব একটা লাভ নেই যাকে বলে — তো সন্দীপ এসে বললো যে একটা চিঠি খুব দরকার, যার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে ও অমৃতাকে খুবই ইয়ে করে, কিন্তু একটু কবিতা-টবিতা না থাকলে ঠিক ব্যাপারটা জমছে না। আমি তো হাতে স্বর্গ পেলাম (এবং একটা গোটা প্যাকেট ফ্লেক!) ... জানা গেলো, আমি-ই পত্রলেখক ও বাহক, খালি তলায় নামটা আমার নয়। যেমন ফেলুদার গল্পে হয়, সেরকম পারিশ্রমিক, শুরুতে ফ্লেক, মাঝে একটা দুটো এগরোল, আর উঠে গেলে নেভি কাট ...

আমার দৌড় তখন শেষের কবিতা অব্দি, তাও আবার দিদির দৌলতে, যে নিবেদিতায় পড়ার সৌভাগ্যে বোধহয় পুরো বইটাই এপাশ-ওপাশ গাঁতিয়ে ফেলেছে ততোদিনে ... তা শুরতে ভাবলাম অমিত রায়কে টুকলি করে জন ডান ঝেড়ে দিই, (যাকে বলে টুকলি-অব-অর্ডার-টু) ...

"For God's sake, hold your tongue and let me love" ...

একটা পায়োনিয়ার কোম্পানির ফুলস্ক্যাপ পাতা ছিঁড়ে উপরেই সেটা লিখেও ফেললাম ... কিন্তু কেমন একটা বুকটা ছ্যাঁতছ্যাঁত করতে লাগলো, হাজার হোক – ব্যাঙ্কের কেরাণী মধ্যবিত্ত বাঙালি বাপ, Tongue দেখে পানু ভেবে কেলিয়ে দিলে হয়ে গেলো আর কি ... আবার তন্নতন্ন করে খুঁজলাম শ্যাষের কবতে, এইবার এলো সংস্কৃত -

'স্মরগরল খন্ডনং মমশিরসি মন্ডনম, দেহি পদপল্লবমুদারম' ...

লিখেই কেমন একটা সাত্ত্বিক শাহরুখ ভাব এলো, কিন্তু সন্দীপ টিফিনের সময় বললো অমৃতাদের ইস্কুলে হিন্দি অ্যাডিশনাল, সংস্কৃত নাই ... ওসব চলবে না ...

দিন যায়, রাত যায় – এদিকে আমি তো আর যুতসই কবিতা পাই না, প্রথমে গিয়ে ধরলাম পাড়ার একটা পাতাখোর কবিকে, সে আবার সকালে প্রাইমারী স্কুলে পড়ায়, দুপুরে পার্টি অফিসে ম্যানিফেস্টো বিলোয় আর রাত্রে অল্প তন্ত্র-মন্ত্র করবে বলে গাঁজা টেনে 'মা-মাগো' করে আর্তনাদ করে। সে বললে, "প্রেম মানে নীরা, নীরা মানে যে রানীর উল্টোস্রোত, যেমন ধারার বীপ্রতীপ রাধা" ... তখনো 'গুগুল তোমার দারুণ দীপ্তি ফেলেছে জগৎ ঢাকিয়া' টাইপের টাইম নয়, আর পাড়ার নবজাতক লাইব্রেরীতে হেমেন রায় আর সত্যজিৎ ছাড়া কিছু ঢোকে নি কোনোদিন ... অনেক কষ্টে এক বন্ধুর বাড়ি থেকে চুরি করিয়ে আনলাম সুনীলের একটা বই, মলাটে আবার বাড়ির লোককে ধোঁকা দেওয়ার জন্য লেখা 'প্রশ্ন বিচিত্রা' ... সে কবিতাগুলি যে কি ভালো ছিলো কি আর বলবো, সেই যে সুনীল লিখছেন যে তিনি সাবান হয়ে যেতে চান, নীরা তাকে নিয়ে কি কি সব তারপর করবেন ...

নাঃ, নীরা সেই চিঠিতে জায়গা পেলোনা, আমার সাহস-ও যে হয়েছিলো তা নয় ... তবে একদিন 'বুকে বল, হাতে পেশী, কথা কম, কাজ বেশী' করে সুভাষদাকেই ধরলাম ক্লাসের পরে ...

"স্যার, দু মিনিট সময় হবে? একটা সাজেশান চাইবার ছিলো ... "

জীবনে সাজেশান শব্দটাকে সুভাষদা কেনো, আমার ধারণা সব মাস্টাররাই হেব্বি ঘেন্না করে, তবে এই একবার ভদ্রলোক দেখলাম একেবারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন, বললেন, "আমার যে গুরু বাংলায় লিখে আরেকটা পৃথিবী বানিয়ে ফেলেছেন, তাঁরই দু-লাইন বরং তোমাকে বলি, কনিষ্ক ...

"তুমি তো জানো না কিছু – না জানিলে,

আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে"

...

আমার বুকের ‘পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল,

তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই;

শুধু তার স্বাদ

তোমারে কি শান্তি দেবে?"

পুরোটা বলে অনেকক্ষণ বাইরে চেয়ে থাকলেন সুভাষদা, বললেন ধার-দেনা করে বাজারে আলু-পটল কেনা যায়, প্রেমের চিঠি লেখা যায় না।

সেদিন রাত্রে আর ঘুম হলো না ঠিক করে, জেগে থাকলাম – বাবা-মা শুয়ে পড়ার পর বাগানের জবা গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে একটা ফ্লেক খেয়ে ফেললাম সাহস করে, অনেক অনেক ভাবলাম – তাকে কি লেখা যায়, যাকে আমি হয়তো এই একবারই কিছু বলবো? অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে যেন নিজেরই ভিতরে নামছি মনে হলো, কিন্তু কই টর্চ নিয়ে পাশে দাঁড়ালেন না তো রবি ঠাকুর ! — অনেক ভেবে ভেবে সেই রাত্রে দুটো লাইন লিখলাম আমার বেনামী প্রেমপত্রের জন্য -

"বৃষ্টি, কি নামে ডাকলে তোমায়,

ঝরে পড়বে আমার ঘরে,

এই এখানে, এই এখন-ই?"

নাঃ, সন্দীপ আর অমৃতার বিয়ে হয়নি, ওরা একে অন্যজনকে নিশ্চয়ই অ্যাদ্দিনে ভুলেও গেছে, আমার-ই বা কি মনে আছে আর? সেই চিঠিটা গন্তব্যে যে পৌঁছেছিলো তা জানি, আর আমি সেই নেভিকাটের প্যাকেট-টাও একবিকেলে ছুটির বৈঠকের মাঠে দেদার উড়িয়ে দিয়েছি দখিনা হাওয়ায়, যে বিকেলে ওরা ঘুরতে গেছিলো ময়দানে... তারপর কত গল্প আসে, কত বিকেল যায়, ছুটির বৈঠক থেকে সিগারেটদের ঠিকানা হয় প্রথমে হোস্টেলের ঘর, তারপর আর্ধেক পৃথিবী দূরে একটা বরফ-ঢাকা শহর, তারপর তারাও হারিয়ে যায়... এখন কেউ জানে না কে কোথায়, সত্যি বলতে কি, সেই সুভাষদা কি বেঁচে আছেন এখনো? তাও জানার সুসময় আসেনি... তবে যে কৈফিয়ত দিয়ে শুরু করেছিলাম সেটাই আবার দিই, ওই শুকনো পেঁয়াজের খোসার মতন এই একটা-দুটো লাইন কোথায় যেন লেগে ছিলো, আজ ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিলাম এক্কেরে...

ডায়েরীর শেষ দিক থেকে

নবকলম

মার্চ ১০, ২০১৬

(১)

বিস্ফারিত চোখের ভিতর মধ্যরাতে,

ঘুম-না-আসা রাত লিখে যায় লাল শিরাতে -

উঠোনজোড়া জমাট বরফ গলবে কালই,

শুকোক আঙন, ডালপাতাদের যেও সরাতে।

যে ডালপাতায় ধরলে পচন ছোট্ট শিকড়,

শিকড় ক্রমে স্বাস্থ্য পেলে দেওয়াল ধরে ;

সবজে দেওয়াল লতানেগাছের মামার বাড়ি,

খুরপি দেখেই মুচকি হাসে ঠোঁট কামড়ে।

খুরপিরও কি রাগ হয় না সময় সময়?

জং ধরেছে, সং সেজে তাই ঘুমিয়ে থাকে!

সূর্য যখন দিন- টহলের পশ্চিমে যায়,

মরচে রঙেই কালচে ইটের গল্প আঁকে।

গল্প সেসব উষ্ণ এমন বরফ গলায়,

শীতল জলের স্রোত আসে, আর রাগ ধুয়ে যায়।

খুরপি যেমন ঘুমিয়ে ছিল ঘুমিয়ে থাকে,

বন্ধু গাছের সূর্য ঢাকায় আশকারা পায়।

(২)

কাগজের মতো রোজই ছিঁড়ে যাচ্ছি কুচি কুচি হয়ে,

প্রথমে দু ভাগ, সেখান থেকে চার- ষোল – চৌষট্টি বা তারও বেশি,

ছড়িয়ে পড়ছি আলতো ভাবে ;

রাতে আকোয়ারিয়ামে বুদ্বুদ দেওয়া পরীর প্রাণ কেড়ে নিলে

যেভাবে অতি ধীরে থিতিয়ে পরে শ্যাওলা, সোনালী শামুকটার

অলস খোলের ওপরে।

আমার গল্পে সন্দেহ?

বলছ ছিঁড়ে যাবার কোনও শব্দ শোনা যায় নি?

আচ্ছা একটু ভেবে বলি তাহলে সত্যিটা -

ভেজা কাগজের মতো পড়ে আছি এককোণে,

নরম, নাজুক।

কোনও কিছুর খোঁচা লাগলেই ধ্বংস হচ্ছি একটু করে।

আমি বদলে যাচ্ছি, আমার জ্যামিতিও ;

কোনার দিক থেকে, মাঝের দিক থেকে।

ভেজা, তাই কোথাও কোনও শব্দ হচ্ছে না।

টেলিফোন

হস্তিমূর্খ

জুন ২৫, ২০১৬

(১)

গত তিনদিন হয়েছে। আজ চতুর্থ দিন। বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই মনে পড়ল আজও ফোন করা হয়ে ওঠেনি। ঘড়িতে রাত ন'টা। এখন আর ফোন করতে ইচ্ছে করছে না। গত দু'দিন যা উত্তর দিয়েছে আজও সেটাই দিল। "নাহ, আজ হয়ে ওঠেনি, কাল করব আসলে নানা ঝামেলায় মনেই থাকছে না।' এর জবাবটাও গতকালের মতই হল। 'কি করে তোদের মনে থাকে না বুঝি না। একটা মানুষ একা থাকে, হসপিটালে ভর্তি, একবার ফোন করে জানবি ছেড়েছে কিনা, সেটাও মনে থাকে না'। এর উত্তরও প্রান্তিকের কাছে মজুত ছিল 'তুমিও তো করতে পার'। প্রান্তিক কোনও জবাব না দিয়েই নিজের ঘরে চলে গেল।

প্রান্তিক যে নিজেকে যে খুব নির্দোষ মনে করে এমনটা নয়। বরং খবরটা না নিয়ে ওঠার জন্যে একটা অপরাধবোধ তাঁর মধ্যেও কাজ করে। অন্য কেউ হলে কি হত বলা মুশকিল, কিন্তু পরিজ্যেঠুর সাথে সে কি একটু বেশি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে ফেলছে। আসলে পরিতোষ গাঙ্গুলি যে তাদের পরিবারের কেউ নন সেটা শুধু সে-ই নয়, তাদের প্রজন্মের প্রায় সবাই জেনেছে অনেক দেরিতে। জানবার সুযোগও তো কোনওদিন দেননি এই ভদ্রলোক। ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রদ্যোত ঘোষের পরিবার একরকম তাঁর নিজের পরিবারের মতই ছিল। সেই বন্ধুর কনিষ্ঠ ভাইয়ের একমাত্র সন্তান প্রান্তিকও পেয়েছিল তাঁর সেই অকৃত্রিম স্নেহচ্ছায়া। আজও তার বইয়ের র‍্যাকে সাজানো অজস্র বইয়ের প্রথম পাতায় লেখা 'আদরের প্রান্তকে – পরিজ্যেঠু'।

অকৃতদার পরিতোষ গাঙ্গুলির হার্ট অ্যাটাকের খবরটা বাড়ির পরিচারক পটলদা ফোন করে দেয় প্রান্তিককে। নার্সিংহোমে গিয়েওছিল। কিন্তু অকুস্থলে পৌঁছে শুধু পটলের সাথে বিস্তারিত কথা বলে কাজের দোহাই দিয়ে যে সে তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে এসেছিল তার পেছনে ছিল পরিতোষবাবুর আত্মীয়স্বজন। একটুখানি বোঝার বয়সে পৌঁছেই প্রান্তিকের মনে হতে শুরু করেছিল তার পরিজ্যেঠু ভুল করে ওই বাড়িতে জন্মে ফেলেছেন।

(২)

আজ আর প্রান্তিক ভোলেনি। মনে ছিল। লাঞ্চ সেরে উঠেই ফোন করল। 'পটলদা, প্রান্ত বলছি, কি খবর, বাড়ি ফিরেছে?'

এই তো সকালে ফিরলাম, আসলে ডেথ সার্টিফিকেট তো দিল সাড়ে বারোটায়, চার ঘণ্টা না হলে তো দেবে না, তারপরে কেওড়াতলায় কাল.....

শকুনি চরিত্র

হিমাদ্রী

সেপ্টেম্বর ১, ২০১৬

নানা অত্যাচার আর অমানবিকতার ভারে জর্জরিত আজ যেখানে আফগানিস্তান প্রদেশ, ৫০০০ বছর আগে সেই দেশেরই নাম ছিল গান্ধার প্রদেশ। আর তখন সেই দেশটি আজকের মতো ছিল না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে গান্ধার প্রদেশের উল্লেখ অবশ্য করণীয় কেননা তা এক প্রকার সমগ্র মহাভারতের পশ্চাদপট রেখা, যার শুরুর শুরুটুকু বলা যায়, তা এই গান্ধার প্রদেশ থেকেই। গান্ধারের রাজকুমারী ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপরিবারের কুলমহিষী হয়েছিলেন। গান্ধারী যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধৃতরাষ্ট্রের সহধর্মিণী হয়েছিলেন, সেটা তার সর্বকণিষ্ঠ ভাই শকুনির একেবারেই পছন্দ ছিল না। শুধু তাই নয়, শকুনি তা চূড়ান্ত অপমানকর বলেও মনে করতেন। কিন্তু সর্বশক্তিমান ভারত সম্রাটের কাছে সেদিন গান্ধারের মাথা নিচু করে মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তার একটা প্রধান কারণ অবশ্যই ছিল রাজার বাহুবল – যা'র পুরোধা ছিলেন মহামতি ভীষ্ম। ভগিনির বিবাহের অনেক আগে থেকেই হস্তিনাপুরবাসী ভারত সম্রাটের সাথে গান্ধারের বনিবনা ছিল না। হস্তিনাপুর সেই শান্তনু বা তার আগের সময় থেকেই গান্ধারের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পাণ্ডু এবং ভীষ্মের সময় চলাকালীন যুদ্ধের ফলাফল হস্তিনাপুরের পক্ষেই যায়। সেই যুদ্ধে হস্তিনাপুরের রাজা গান্ধারের রাজাকে বধ করেন আর সেই রাজ্যের সমস্ত রাজ পুরুষ ও তাদের অনুচরদের কারাগারের নিক্ষেপ করেন। একজন পুরুষও সেদিন গান্ধারের রাস্তায় খোলা ঘুরে বেড়ানোর সৌভাগ্য পায় নি। রাজা সুভালার রাজত্ব চলাকালীন এই আক্রমণ হয়েছিল, যার পরিণতি হিসাবে তাকে প্রাণ দিতে হয়। তাঁর রাজপরিবারের পাত্র মিত্র আত্মীয় পরিষদ সকলকে বন্দিত্ব বরণ করতে হয়েছিল, যার মধ্যে রাজপুত্র শকুনি সমেত তাঁর ১০০ জন ভাইও ছিলেন। তাঁর রাজ্য অধর্মানুসারে চলছে এবং তারা সকলেই অধার্মিক এই অপবাদে হস্তিনাপুর রাজা তাদের রাজ্য অধিকার করেন ও বন্দী করেন। বন্দী অবস্থায় তাদের প্রত্যেকের জন্য মাথাপিছু কেবল একটি করে চাউলের দানা আহার্য্য হিসেবে দেওয়া হত। কোন মানুষকে অধর্মের পথ থেকে ধর্মের পথে আনার জন্য এমন অভাবনীয় শাস্তি দেবার প্রয়োজন কেন হয়েছিল- এই নিয়ে মনে মনে বিরুদ্ধাচারণ করলেও কেউই মুখ খুলে তখন বলতে চান নি। শকুনির ৯৯ জন ভাই অবশ্য তাদের ভাগের চাউল দানাটি শকুনির জন্য ত্যাগ করেন – এই মনে করে যে এই অকিঞ্চিৎ আহারে তাদের কারোরই ক্ষুধার কোন সুরাহা তো হবেই না, উলটে সকলে মিলেই ধীরে ধীরে মৃত্যু মুখে যাবেন। কিন্তু যদি সকলের ভাগ একসাথে একজনকে খাওয়ানো হয়, তবে সে কষ্টে সৃষ্টে বেঁচে যাবে হয়তো, ভবিষ্যতে কোন দিন সুযোগ এলে এই অনুচিত শাস্তির উচিত বদলা নিতে পারবে! শকুনি যেহেতু সকলের ছোট ছিলেন, তাই তাঁর বড় ভাইয়েরা তাদের ভাগের খাদ্য শকুনির উদ্দেশে ছেড়ে দেন। শকুনি কে তা দেওয়া হয়েছিল দুটি কারণে। এক তিনি সকলের ছোট, তাই আদরের ছিলেন। আর দ্বিতীয় কারণ সমস্ত ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে চালাক ও ধূর্ত ছিলেন শকুনি। তাই এতো বড় রাজপরিবারের বিরুদ্ধে যদি কেউ লড়াই করতে পারে তা

কেবল শকুনিই পারবেন, এটাই সকলে বিশ্বাস করেছিলেন। কালক্রমে শকুনি তা পেরেছিলেন, যদিও নিজের জীবনও সেই যুদ্ধে খোয়াতে হয়েছিল। সেই দিন থেকেই হস্তিনাপুরের সাথে গান্ধারের ঠান্ডা লড়াই এর শুরু। আর এর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে মহাভারতে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ক্ষেত্রে। বন্দী দশায় শাস্তি মকুবের জন্য শকুনির পিতা রাজা সুবালা হাঁটু মুড়ে নিচু হয়ে স্বীকার করে নেন যে তাঁরা তেমন ধার্মিক নন (কুরু অর্থে যা হওয়া উচিত) এবং হস্তিনাপুরের বশ্যতাও স্বীকার করেন। তখন তাঁদের সকলকে মুক্তি দেওয়া হয়।

আজকের দিনে একজন মানুষের অবস্থা যদি সেদিনের শকুনির মতো করে দেওয়া হয়, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? বলা বাহুল্য, প্রথম সুযোগেই সেই লোকটি তার প্রতিশোধ নেবার জন্য উদগ্রীব থাকবে। সেই হিসেবে শকুনিকে আমি মোটেই খলনায়কের তকমা দিতে চাই না। একজন রাজ পরিবারের সন্তান, তাঁর থেকে বলশালী রাজা দ্বারা যদি বিনা কারণে অত্যাচারিত হোন এবং অপমানিত হোন তাহলে রাজ ধর্ম হিসেবে সে তার প্রতিশোধ অবশ্যই নেবে। ভারতবর্ষের তখনকার রাজনীতির আকাশে কুরু বংশের চেয়ে প্রতাপশালী এবং শক্তিশালী কোন রাজাই ছিলেন না। তাই বাঁচবার সাধারণ তাগিদে, বা কখনও ভয়ে, আবার কখনও বন্ধু ভাবে সমগ্র ভারতের রাজারা তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে কম বেশী লাঞ্ছিত বা অপমানিত অনেকেই হয়েছেন, আবার কারোর কারোর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ও গড়ে উঠেছিল। সমগোত্রিয় (শক্তি ও সামর্থ্যে) রাজাদের ঘরে পাণ্ডবেরা (কুরু বংশীয়েরা) বিবাহ করেছেন নিজেদের শক্তি বাড়ানোর জন্য। এই ব্যাপারে তাদের মনে প্রথম নিজেদের বলবৃদ্ধির কথাই এসেছিল, যতটা না সেই রাজ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার ইচ্ছা। কুরু বংশের সাথে নিজেদের আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধতে পেরে অনেক রাজাই নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করতেন। এমন একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক আখাড়ার মধ্যে শকুনির প্রবেশ সুদূর গান্ধার থেকে। তাঁর প্রবেশের মূল কারন তাঁর ভগিনির হস্তিনাপুরে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়া। একজন রাজপুত্র নিজের পিতার অবর্তমানে তাঁর নিজের রাজ্য পরিত্যাগ করে শত্রুর পুরীতে দিনাতিপাত করেছেন কেবল মাত্র একটি সংকল্প নিয়ে – 'কুরু রাজ্যের বিনাশ', 'ভীষ্মের কুলের বিনাশ'। হতে পারে কুরু শক্তিশালী, প্রতিষ্ঠিত, উচ্চবংশীয়, ধনবান। কিন্তু সেই বংশের অন্ধ রাজার জন্য গান্ধারের সবচেয়ে

সুন্দরী নারী ও রাজকন্যাকে বৈবাহিক প্রস্তাব দেওয়ার যে অবমাননা তারা করেছেন (প্রস্তাব দিয়েছিলেন ভীষ্ম), তাতেই শকুনির সবচেয়ে গভীর আপত্তির কারণ ছিল। এই আপত্তি আরও ক্রোধে পর্যবসিত হয়, যখন স্বামীর অন্ধত্বের অছিলায় গান্ধারী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজের চোখের ওপর বন্ধন জড়িয়ে নেন এবং নিজেকে ধৃতরাষ্ট্রের পদাঙ্কনুসারী বলে জগৎ পরিচিতি দেন। চোখ থাকতেও তিনি সারা জীবন অন্ধের মতো দিন কাটালেন। আর এর কারণ মহামতি ভীষ্ম ছাড়া অন্য কাউকেই শকুনি করতে চান নি। তাই তাঁর ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক এবং তা একেবারেই অনুচিত নয়। কেবল মাত্র গায়ের জোরে যে তিনি এই বিশাল কুরুকুলের কিচ্ছু করতে পারবেন না, তা তিনি ভালোই বুঝতেন। তাই তাঁর আস্থা ছিল নিজের ধূর্ততা ও ভবিষ্যৎ আন্দাজ করার অসামান্য ক্ষমতার ওপর। আর তাঁর এই ক্ষমতায় যজ্ঞের হাওয়ার কাজ করেছিল তাঁর ভাগিনেয় দুর্য্যোধনের অসামান্য ঘৃণা ও হিংসা, পাণ্ডু পুত্রদের জন্য। শকুনি মামা হিসেবে সব সময়ই দেখিয়েছেন তিনি ভাগিনেয়র জন্য সব কিছু করতে পারেন, করছেন। কিন্তু প্রত্যন্ত গভীরে সেই সব ঘটনার উদ্দেশ্য ছিল কুরুবংশের বিনাশ। ভীষ্মের কুলের বিনাশ। তা সে পাণ্ডবই হোক না' কি তাঁর নিজের সহোদরা উদ্ভুত কৌরবই হোক। দুজনেই তো মূল কুরু বংশের থেকেই এসেছেন। এই বিরাট কাজের প্রেক্ষাপট গড়ে তুলতে তিনি ক্রমাগত দুর্য্যোধনের মনের মধ্যে অন্য কুরু বংশীয় বিশেষ করে পাণ্ডবদের প্রতি বিষ বাষ্প ঢুকিয়েছেন। দুর্য্যোধনের চোখে সব সময়ই সাধারণ খেলা ধুলো বা পারিবারিক মিলন মেলাকে তিনি একটা প্রতিযোগিতার মধ্যে নিয়ে যেতেন আর তাতেই দুর্য্যোধনের মনের ওপর তাঁর অধিকার আরোও বেশী করে জমিয়ে নিতেন। উনি হয়তো নিজেও জানতেন যে অন্যায় পথে তাঁর নিজের ভাগিনেয়কে উনি নিয়ে যাচ্ছেন- কিন্তু কুরু প্রতিশোধের আগুন তাঁর মধ্যে এতটাই তীব্র ছিল যে তিনি কখনও বর্তমানের পথে পাপ–পুণ্যর হিসেব করেন নি- কেবল ভবিষ্যতের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থাকতেন। যে ভবিষ্যতে কুরুবংশের মর্য্যাদা ভুলুণ্ঠিত হয়েছে, তাঁর দিকে চেয়ে থাকতেন। যে ভবিষ্যতে সমগ্র কুরু বংশ ধনে প্রাণে সমূলে বিনষ্ট হয়েছে, তাই দেখতে চাইতেন।

কথিত আছে তিনি নাকি পাশা খেলায় অসামান্য পারদর্শী ছিলেন। আর এই কাজে তাঁর নিজস্ব পাশার যে ঘুঁটি ছিল সে দুটি না'কি তাঁরই পিতৃদেবের অস্থি হতে নির্মিত। সুবালার মৃত্যুর পরে তাঁর পাঁজরের অস্থি থেকে শকুনি এই দুটি ঘুঁটি বানান, যারা নাকি তাঁর কথা শুনে চলতো। পাশায় বসে তিনি যে ঘরের সংখ্যা বলতেন ঘুঁটি সেই ঘরেই গিয়ে স্থির হতো। যদিও এর কোন ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতা কোথাও নেই মহাভারতে, কিন্তু মহাভারত উত্তরকালে এই কথা খুব দৃঢ়তার সাথে মহাভারত গল্পের মধ্যে আসে। ব্যাস দেবের মহাভারতে ঘুঁটির ব্যাপারে তেমন উল্লেখ না থাকলেও শকুনি পাশা খেলায় যে অত্যন্ত ধীমান ছিলেন সেই ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সমগ্র মহাভারতের কার্য কারণ যে ঘটনার উপর দাঁড়িয়ে তা এই পাশা খেলার আসরেই ঘটিত হয়েছিল, একথা আমাদের সকলেরই জানা। এই খেলার সূত্র ধরেই শকুনি তাঁর নিজস্ব প্রতিহিংসার শেষ পেরেকটুকু কুরুকুলের বিনাশ ও বরবাদীর কফিনে লাগাতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই খেলার পরিশেষেই কৌরব ও পাণ্ডবের মধ্যে এমন একটা সম্পর্কের দূরত্ব তৈরী করে দেয় যা বিনাযুদ্ধে মেটাবার আশায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বিফল হয়েছেন। এক উচ্চপদাধারী ও সম্মানীয় রাজ পরিবারের মিলিত সংসারে নিয়তির অমোঘ বাণীর মতো গৃহযুদ্ধের ঘোষণা হয়ে গেলো সামান্য কোন সমঝোতা ছাড়াই। সারা ভারত যে যুদ্ধে অংশীদার হতে চলেছে তার প্রস্তুতি হস্তিনাপুরের পাশার আসরে সকলের অগোচরে

নিঃশব্দে ঘটে গেলো। এ সবই ঘটনা পরম্পরায় হয় নি, এর পেছনে শকুনির অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও সুযোগ সন্ধানী চাতুরী কাজ করেছে। পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপনার পশ্চাতে, দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের প্রতিপত্তি দেখে যখন হিংসায় জ্বলছেন, সেই সুযোগ শকুনি খালি যেতে দেননি। দ্যূত ক্রীড়ার আপাত প্রতিক্রিয়াহীন সাধারণ নিমন্ত্রণের পেছনে তাঁর যে মানসিক সুচিন্তিত এক পন্থা ছিল তা তিনি দু দুবারই প্রমাণ করেছেন। দুর্য্যোধনের হিংসার আগুন সেই চিন্তায় সব সময় মদত যুগিয়েছে। ধর্মানুসারে চালিত কুরুকুলের পান্ডুর বংশজদের শকুনি বারে বারেই মৃত্যু দিতে চেয়েছেন। বারে বারেই চেয়েছেন তাদের হীনবল করে দিতে। তারা ছিল তাঁর প্রথম লক্ষ্য। এতে দুটো লাভ ছিল। এক দুর্য্যোধনের কাছে আরোও বিশ্বস্ততা পাওয়া আর দ্বিতীয় ছিল ধর্মানুসারে যারা চলেছে তাদের বিনাশ করতে পারলে নিজের মনের জোর আরো বেড়ে যেত তুলনামূলক ভাবে ভ্রষ্ট নিজের সহোদরা থেকে উদ্ভুত কুরুকুলের কৌরবদের ধ্বংস করতে। শকুনি জানতেন যদি ভারতব্যাপী এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ একবার লাগিয়ে দিতে পারেন, কুরুকুল আপনা থেকেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। যুধিষ্ঠিরের সাথে যখন প্রথম পর্বে তিনি দু দুবার পাশা খেলেন, তখন তিনি যুধিষ্ঠিরের থেকে পাশা খেলায় নিপুণ ছিলেন। তাঁর মন্ত্রযুক্ত পাশা ঘুঁটি তাকে কতটা সাহায্য করেছিল সে হিসেবের না গিয়েও বলা যায় তিনি যুধিষ্ঠিরকে হারাতেন। আর তারই ফলস্বরুপ চূড়ান্ত হেনস্থা আর অপমানের বোঝা পাণ্ডবদের সইতে হয়েছিল। এমনকি তাদের কুল বধূ দ্রৌপদীও সেই নির্লজ্জ অপমানের হাত থেকে রেহাই পান নি। এত বড় অধর্মাচারণ একদা ধর্মের দোহাই দেওয়া মহামতি ভীষ্ম পর্যন্ত প্রতিবাদ করেন নি – এখানেই শকুনির কুরুকুলের উপর প্রথম সার্বিক জয়। এই প্রতিবাদ না করার দ্বারা তারা সকলেই অধার্মিক হয়ে ওঠেন। কেবল অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র পাপের ভয়ে আর পাণ্ডবদের সাথে শ্রীকৃষ্ণ আছেন এই ভেবে সব কিছু হেরে যাওয়া বাজি পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দেন। এতে দুর্য্যোধনের ক্রোধের কোন সীমা থাকে না। দ্বিতীয়বার তাদের আবার আমন্ত্রিত করা হয় দ্যূত ক্রীড়ায়। আর এবার দেশ ত্যাগের, রাজ্য ত্যাগের বাজি ধরা হয়। অপটু যুধিষ্ঠির এবারেও হেরে যান। কুরুকুলের এক অংশকে রাজ্যচ্যুত করতে পারা শকুনির দ্বিতীয় জয়। পাণ্ডবদের বিনাশের মন্ত্রণা তিনি তাদের ছোট্টবেলার থেকে করে আসছিলেন- কিন্তু সফল হতে পারেন নি। আজ হলেন। কৈশোরে দুর্য্যোধনকে দিয়ে ভীমের খাদ্যে বিষ মেশানো, পুরোচনকে দিয়ে পাণ্ডবদের কুন্তীসহ যতুগৃহে পুড়িয়ে মারতে চেষ্টা করা, অভুক্ত ও রাগী দুর্ব্বাসা মুনিকে তাঁর ক্ষুধার সময় পাণ্ডবদের কাছে বনে পাঠানো – যখন সম্ভবত তাদের কাছে কিছুই থাকবে না মুনিকে খাওয়াবার মতো, তা জানা সত্ত্বেও, এমন কত ঘটনা তিনি ঘটিয়েছেন পাণ্ডবদের বেকায়দায় ফেলার জন্য। আজ তাঁর পিতার আশীর্বাদধন্য পাশার ঘুঁটি সেই কাজ করে দিয়েছে। আমার নিজের ধারণা শকুনি সেই একটি রাত্রে বোধহয় একবারের জন্য হলেও শান্তির ঘুম ঘুমিয়েছেন। কিন্তু কাজ এখনও অর্দ্ধেক বাকি। অধুনা কারো কারো মতে শকুনি ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ গণিতজ্ঞ। গণিতের প্রোবাবিলিটি শাস্ত্রের তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী। আর এই প্রোবাবিলিটির জ্ঞানই তাকে পাশা খেলায় সকলের চেয়ে সফল করে তুলেছিল। সেই হিসেবে তাহলে বোধহয় এটা বললে ভুল হবে না, আধুনিক স্ট্যাটিস্টিকসের সবচেয়ে পুরোনো প্রফেসর ছিলেন এই শকুনিই।

এই সব কর্ম কান্ডের সাথে সাথে শকুনি একটা ব্যাপারে কিন্তু একেবারেই নির্মল হৃদয় ছিলেন। তা হল তাঁর ভগিনি গান্ধারীর প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা। গান্ধারীকে তিনি সারা জীবন ধরে অনুরোধ করে গেছেন চোখের বাঁধন

খুলে নেবার জন্য, যা অবশ্য গান্ধারী বারংবার সবিনয়ে প্রত্যাখান করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভাতৃ প্রেমের কাছে নিজের স্ত্রী অধিকারের বলে যে শপথ তিনি নিয়েছিলেন তাকে কোন দিন হারিয়ে যেতে দেন নি গান্ধারী। দুজনেই তাদের নিজের নিজের কাজের প্রতি সমান ভাবে উৎসর্গীকৃত ছিলেন। এটাই শকুনির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট। শকুনিকে যতটা শঠ এবং ঋণাত্মক চরিত্রের মানুষ বলে মহাভারতে দেখানো হোক না কেন, তিনি তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা ও কর্মের প্রতি কায়মনোবাক্যে প্রতিবদ্ধ ছিলেন এবং তা তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তার কথাই বলে।

শকুনি তাঁর ভগিনির মতো কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন শিবের পূজারী। বর্তমান ভারতে কেরালায় শকুনির নামে একমাত্র মন্দিরটি দেখতে পাওয়া যায়। কেরালার কোল্লাম জেলায় পবিত্রেস্বরম নামে একটি মন্দির আছে যা শকুনির নামে উৎসর্গীকৃত। শিব সাধক হওয়ার জন্য শকুনির মধ্যেও নানা তামসিক গুণের সাথে সাথে কিছুটা রাজসিক গুণও ছিল। আর সেটা কুরুভর কমিউনিটির মানুষেরা মানে। বস্তুত পক্ষে শকুনির একমাত্র মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এই কুরুভরেরাই। পবিত্রেস্বরমের এক বহু পুরাতন মন্দির যা কিনা শকুনির উদ্দেশে সমর্পিত, তাতে একটি সিংহাসন (যা কি'না শকুনি ব্যবহার করতেন) রাখা আছে। আর কোন পূজা বা মন্ত্রপাঠ সে মন্দিরে হয় না। আর মন্দিরে আছে দেবী ভুবনেশ্বরীর মূর্তি, কিরাতের আর নাগরাজের মূর্তি। কুরুভরেরা বিশ্বাস করে তারা শকুনির বংশদ্ভুত আর এই স্থানে শকুনি যুদ্ধের পরে ফেরত আসেন ও শিবের বরে মোক্ষ লাভ করেন। শিবের বরেই তিনি উপাধি পান লর্ড শকুনি হিসাবে। মালয়লি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মালয়লি মকর সংক্রান্তিতে এই মন্দিরে একটি মেলাও হয় প্রতি বছর যার নাম মালাক্কুড়ু মহলশোভম। শকুনির মন্দিরের কাছে আরও একটি ছোট্ট মন্দির আছে- যা দুর্য্যোধনের নামে। কুরুভরেরা মনে করে, শকুনি দ্বাপরের শেষ মানবতার, আর দুর্য্যোধন হল কলির প্রথম মানবতার।

পবিত্রেস্বরমে শকুনির নামে উৎসর্গীকৃত মন্দির, কোল্লাম জেলা, কেরালা

শকুনির অনেক পরে তাঁর বংশজ রাজা অম্ভি গান্ধারের সিংহাসনে বসেন, যিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমসাময়িক ছিলেন। আলেকজান্দারের সাথে যুদ্ধে এই রাজা অম্ভি তক্ষশীলায় আলেকজান্দারের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। পরে তিনি রাজ্যচ্যুত হন।

শকুনি মহাভারতের সবচেয়ে বড় এবং কার্য্যকারী খলনায়ক ছিলেন কি'না এই নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে। সাধারণ বিচারে তাঁর নানা কর্মকান্ড একটা নেগেটিভ চরিত্রায়ণ করলেও একটা জিনিস অস্বীকার করার কোন উপায় নেই,

আর তা হল তিনি নিজের উদ্দেশ্যের প্রতি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত থাকতে পেরেছিলন। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা তাকে নানা আপাত প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থার মধ্যেও স্থির রাখতে পেরেছিল এটা কোন মানব চরিত্রের জন্য কম বড় কথা নয়। বিশেষতঃ সেই সময় সারা ভারতবর্ষেই রাজা ও কুলপতিদের মধ্যে এক বা একাধিক দলের অন্তর্ভুক্ত হবার একটা তীব্র মানসিকতা ছিল। যে বিরাট দুটি শক্তির চারপাশে সে সময়ে সকলে জোট বাধছিলেন, যে শক্তির প্রতিভূ একদিকে যেমন মহামতি ভীষ্ম বা অন্যদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, সেখানে নিজের লক্ষ্যে টিকে থাকা ও উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে নিজের কর্মকাণ্ডকে সফলতার টীকা পরানো কম কথা নয়। সেদিক থেকে শকুনি কে ১০০ র মধ্যে ১০০ দিতে কেউ আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না। আর তাঁর এই সব কাজ কেন করতে হল সেটাও ভেবে দেখতে বলি। তখনকার আর্য্য সমাজে যারা রাজা ও রাজ বংশোদ্ভুত, তারা কখনই নিজেদের অপমান ও হেনস্থা সহজে মেনে নিতেন না। সারা ভারতের রাজার মুখোমুখি হওয়া গান্ধারের একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই বলের চেয়ে কৌশলই শকুনির একমাত্র হাতিয়ার ছিল। আর তিনি তাই করেছেন। এই জন্য তিনি নিজের রাজ্যসুখও ভোগ করেন নি। এটাও একটা ত্যাগ বলে মানতে হয়। অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া আর কোন কিছুর দিকে শকুনি হাত বাড়ান নি। যদিও দুর্য্যোধনের সুবাদে তিনি অশেষ ধন দৌলত নিয়ে এক ভোগীর জীবন কাটাতে পারতেন। আমার মতে দ্বাপরের শেষ মানুষটি এক মহান কর্মযোগী ছিলেন। শুধু কাজ করে গেছেন প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী, ফলের দিকে কখনও তাকান নি। আপনারা কি বলেন?

মোদি বনাম পাকিস্তান, মোদি বনাম মিডিয়া

সৌরদীপ

জানুয়ারী ৫, ২০১৬

"Whoever controls the media, controls the mind"

—Jim Morrison

বড়দিনের বিকেল। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিমান বোয়িং-৭৩৭ 'এয়ার ইন্ডিয়া ওয়ান' রাশিয়া থেকে কাবুল হয়ে নয়াদিল্লি ফিরছে। ঘটনাচক্রে সেইদিনই আবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের জন্মদিন। সকালে উইশ করলেন মোদি, শরিফের উত্তর, একটু ঘুরে গেলেও তো পারেন। সবাইকে রীতিমত অবাক করে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন মোদি। আর তাঁর বিমান নয়াদিল্লির পথে বিকেল ৫ টায় ল্যান্ড করল লাহোর বিমানবন্দরে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে পড়েছে দু'দেশের রাজনৈতিক মহল। লাহোর বিমানবন্দর ঘিরে ফেলেছে পাকিস্তানের নিরাপত্তাবাহিনী, চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হল এয়ারপোর্টের আশেপাশে। মোদি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে নামলেন, একপ্রস্থ কোলাকুলির পর হেলিকপ্টারে চড়ে সটান উড়ে গেলেন নওয়াজের রায়উইন্দের প্রাসাদে। সেখানে তখন মহাসমারোহে চলছে নওয়াজের নাতনি মেহেরুন্নিসার বিয়ে। আশীর্বাদ করে গেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

ঘটনাটা এতই আকস্মিক যে, প্রথমে দুপক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়ার লোকও জোটেনি। ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এত বছরের ইতিহাসে এ এক বিরলতম ঘটনা। চরম বন্ধুত্বপুর্ণ দেশ হলেও একডাকে ঘন্টাখানেকের সফরে শ্যামবাজার থেকে এসপ্ল্যানেডে হাওয়া খেতে যাওয়ার মত ঘুরে যাওয়া বিদেশনীতির প্রোটোকলে নজিরবিহীন। সেখানে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক খারাপ বললে কম বলা হয়। ভারত-পাক সফর মানেই বছরখানেক ধরে প্রস্তুতি, দু'চারবার সীমান্তে গুলিগোলা চলে সফর পিছিয়ে যাওয়া, তারপর আবার বাবা-বাছা করে শেষ অবধি মহা আড়ম্বরে সফর, বিশ্বব্যাপী ঝড় ওঠা... এসব দেখতেই অভ্যস্ত আমরা। সেখানে মোদির ধুরন্ধর বিদেশনীতি অত্যধিক বিদেশসফরের জন্য যতই সমালোচিত হোক, ডেথ ওভারে ঠিকই ম্যাচ বের করে চলে গেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় কেউই কেজো মন্তব্যের বাইরে গেলেন না। পাক বিদেশসচিব আইজাজ আহমেদ চৌধুরী ভূয়সী প্রশংসা করলেন, বিলাবল ভুট্টোও ওয়েলকাম করলেন, সুধীন্দ্র কুলকার্নি বললেন সাহসী পদক্ষেপ, এমনকি হুরিয়ত অবধি একটু কেশে-টেশে শেষটায় "আমাদের কোনও সমস্যা নেই" বলতে বাধ্য হল। শুধু কংগ্রেস সমালোচনায় মুখর। আনন্দ শর্মা বললেন, এসবে ভবি ভুলবার নয়, এত উচ্চমানের সফর তাৎক্ষণিক হতে পারে না। আর এসবই

মোদির নিজের 'বিজনেস ইন্টারেস্ট' চোকানোর ধান্দা! কেজরিওয়ালও হইহই করে নেমে পড়লেন। দিনের শেষে প্রাপ্তি, বামেদের সমর্থন আর ওমর আবদুল্লার আশাবাদী মন্তব্য।

কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল করবার মত। খোদ মোদির ট্যুইট আর বিদেশসচিব জয়শঙ্করের মিডিয়া ব্রিফিং ছাড়া সরকারিভাবে সফরের ব্যাখা কি কেউ করলেন?

আমাদের আলোচনা শুরু হচ্ছে এই প্রশ্নকে ঘিরেই। প্রথমেই ফিরে যাওয়া যাক আরো ১৮ মাস আগে। মোদির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। আমন্ত্রিত হয়েছেন দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সবদেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা। এবং আফগানিস্তানের হামিদ কারজাই, নেপালের সুশীল কৈরালা, ভুটানের শেরিং তোবগে, বাংলাদেশের সংসদের স্পিকার, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি সেখানে সবচেয়ে আলোচিত দুই ব্যক্তিত্বের নাম, পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ ও শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষে। তামিলনাড়ু জুড়ে বিক্ষোভ চালাচ্ছে জয়ললিতার এআইএডিএমকে, পশ্চিম ভারতে শিবসেনা। মোদি কিন্তু নিরুদ্বেগভাবে নিজের বিদেশনীতির মোক্ষম চালটা দিলেন। এর আগে ভারত-পাক সম্পর্কে বারবারই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অভিযোগ এসেছে, জিয়া উল হকের আমল অবধি ভারত-পাক সম্পর্কের অবনতি বারবার ঘটেছে আমেরিকার ক্রমাগত সামরিক সাহায্য দিয়ে পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার অভিযোগে। আর পাকিস্তান মার্কিন জোটের অংশ হিসেবে বারবারই দক্ষিণ এশিয়ার জিও-পলিটিক্সে আমেরিকাকে জায়গা করে দিয়েছে। ১৯৯৫ সালে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁড়িয়ে তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো তীব্র ভারতবিরোধী বক্তৃতা করেছিলেন। এমনকি নিক্সনের ঐতিহাসিক চীন সফরের পিছনেও হেনরি কিসিংগার ও পাকিস্তানের হাত ছিল বলে জানা যায়। মোদির কাছে তাই স্বভাবতই একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, দক্ষিণ এশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর। এদিকে লাদেনের হত্যার পর মার্কিন-মুখাপেক্ষিতাও পাকিস্তানের অনেক কমেছে। সব মিলিয়ে বিদেশনীতির প্রশ্নে দক্ষতার সাথে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মোদী। যেটা অন্তত দক্ষিণ এশিয়ার স্বার্থেই মহাগুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিজেপির তরফে মোদির একএকটি পদক্ষেপকে ব্যাখা করার মতই কেউ রইলেন না।

কেন রইলেন না? সে খালটাও মোদী নিজেই কেটেছেন, যাতে করে এই মিসকমিউনিকেশন বা বলা ভাল, কমিউনিকেশনের অভাব নামক কুমির তড়বড়িয়ে ঢুকে পড়েছে। সাধারণভাবে ক্যামেরা দেখলেই পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া, রীতিমত লোকজনকে সরিয়ে হাসিমুখ দেখানো নরেন্দ্রভাই ক্ষমতায় আসার পর প্রথম বিদেশসফরেই (ভুটান, পরে ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে ব্রাজিল) এয়ার ইন্ডিয়া ওয়ানে মিডিয়ার ওঠা বন্ধ করে দিলেন। এই নীতিটা বহুদিন ধরেই চালু ছিল। ইউপিএ জমানায় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশসফর মানেই বিশাল মিডিয়া সঙ্গে যেত, মনমোহন নিজে স্বল্পবাক হলেও মিডিয়ার সাথে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল তাঁর। তাছাড়া কংগ্রেসের তরফে আনন্দ শর্মা, জয়রাম রমেশ, কপিল সিব্বল, শশী তারুর বা সলমন খুরশিদের মত সুবক্তারা থাকতেন, মিডিয়াকে বিস্তারিত ব্যাখা দিতে তাঁদের

কোনও আপত্তি থাকত না। এটা খারাপ কিছু নয়, বিশ্বের সব দেশেই স্টেট ভিজিটে মিডিয়া নিয়ে যাওয়ার রীতি আছে। ওবামা তো প্রায় মিডিয়ার মিছিল নিয়ে যান! সেখানে মোদির অস্ত্র ছিল, তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তা। তিনি ট্যুইটারের রাজা, ফেসবুকেও কিছু কম যান না। তার ওপর দেশের জেন ওয়াই কাগজ পড়ে কম। মিডিয়ার আর দরকার কি?

মিডিয়ার প্রতি অবশ্য মোদির খানিক ভীতি কাজ করে বলেও জানা যায়। সেটাও স্বাভাবিক, গুজরাট দাঙ্গার পরে প্রায় কোনও মিডিয়াই তাঁকে তুলোধনা করতে বাকি রাখেনি। মোদি বারবারই দায় এড়িয়েছেন, যদিও কোনও মতেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা কার্যত হাওয়া হয়ে যাওয়ার দায় তিনি এড়াতে পারেন না। প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি পাওয়ার পরেও প্রশ্নগুলো তাঁকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। ফলে মিডিয়ার সাথে সংস্রব কমালেন। মিডিয়া উপদেষ্টা পদেও কাউকে রাখলেন না, সম্ভবত ছুঁচ হয়ে ঢুকে সঞ্জয় বারু হয়ে বেরনোর ভয়ে। ৭০ বছরের জগদীশ ঠক্করকে জনসংযোগ আধিকারিক পদে নিয়োগ করলেন। এক বিবিসি সাংবাদিকের ভাষায়, "উনি তো কথাই বলেন না। সংযোগ পরের কথা! উনিও হাসেন, পাল্টা আমরাও হাসি। গল্প শেষ!"

মোদির বিদেশসফর মানেই অতএব মিডিয়া বলতে হয়ে দাঁড়াল দূরদর্শন আর পিটিআই। যাদের একমাত্র কাজ ঘটনার বিবরণ দেওয়া, সমালোচনা করার অভিযোগ তাদের অতি বড় নিন্দুকও মুখে আনবে না।

আর তাদের সামনে বক্তব্য রাখবেই বা কে? মোদি স্বয়ং মিডিয়া ফেস করেন না। পিএমও থেকে নাকি 'নিতান্ত বাধ্য না হলে মিডিয়ার দিকে ঘেঁষবেন না' বলে হুলিয়া জারি করা হয়েছে! অতএব প্রকাশ জাভড়েকর আর রবিশঙ্কর প্রসাদ ছাড়া সে অর্থে কাউকেই ব্রিফিং দেওয়ার জন্যও পাওয়া যায় না। আর যে যাই বলুক, প্রাক্তন ব্যাঙ্ককর্মী জাভড়েকর কেজো বক্তৃতার বাইরে বেরোন না। রবিশঙ্কর প্রসাদ অভ্যন্তরীন ব্যাপার নিয়ে যতটা সরব, বিদেশনীতির প্রশ্নে একদমই না। অশোক রোডের পক্ষ থেকে চ্যানেলের সান্ধ্য তরজায় যাঁরা যান, তাঁরাও যে খুব ভাল ব্যাখ্যা করেন, এমন নয়। ফলে যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে স্বভাবতই দেশবাসীর সাথে বিজেপির একমাত্র যোগসূত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে রাজনৈতিক ভাষণ আর সোশ্যাল মিডিয়া। আর রাজনৈতিক ভাষণে ছোটখাটো কথা বলা মোদীর ধাতে নেই। ফলে ফাঁকা বুলি আওয়াজ উঠতেও সময় লাগছে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বিদেশনীতির মত জটিল বিষয় কি আদৌ জনতার কাছে বোধগম্য? নাকি সেটা গবেষক ও অ্যানালিস্টদের ব্যাপার? প্রথমেই বলা ভাল, গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে জনগণের কাছে বিদেশনীতির ওপর বক্তব্য ক্লিয়ার থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ গণসমর্থণ একটা ভীষণ গুরুত্বপুর্ণ অংশ। বর্তমান ভারত পাকিস্তান প্রেক্ষাপটই ধরা যাক। পাকিস্তান ও ভারতের জনতার মধ্যে পারস্পরিক হিংসা, ভয় ও ঘৃণার পরিবেশই বেশি। দুদেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি বা অবনতির ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা যে কোনও রাষ্ট্রনেতাকেই খেয়ালে রাখতে হয়। সরকারের সম্পর্ক উন্নতি-অবনতি দেখভালের দায় আছে। বিরোধীদের নেই। ফলে বিরোধীদের সমালোচনারও কোনও পরিধি নেই,

করলেই হল। সমস্যাটা হচ্ছে, এতে যদি জনতার ক্ষোভ বাড়ে, তাহলে প্রধানমন্ত্রীকেও প্রমাদ গুনতে হবে। ব্যাকডোর ডিপ্লোম্যাসি যতই বাড়ুক না কেন, একদিন না একদিন সেটা প্রকাশিত হবেই। ফলে জনবিক্ষোভ গায়ে নিয়ে সম্পর্কের উন্নতির জন্য কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া যে কোনও নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষেত্রেই একপ্রকার ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে ভারত-পাক সম্পর্কের এমনই টানাপোড়েন, তাতে গ্যারান্টি বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। আর শিবসেনা থেকে আপ, সকলে তো পা বাড়িয়েই রয়েছে। তাই কোনও কূটনৈতিক পদক্ষেপের গুরুত্ব কোথায়, সেটা সবার আগে দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার থাকা দরকার। ব্যাঙ্ককে এনএসএ পর্যায়ের বৈঠকে দোভাল কি বললেন, সেটা না হয় গোপন থাকুক। এবার সেই বৈঠকের ফলশ্রুতিতেই হোক আর তাৎক্ষণিকই হোক (ধরে নিচ্ছি এই ব্যাকডোর ডিপ্লোম্যাসিরই ফল), এই চটজলদি শুভেচ্ছা সফরের গুরুত্বটা সঙ্গত কারণেই দেশবাসীর জানা দরকার। শরিফের সাথে মোদি বরাবরই ব্যক্তিগতভাবে সুসম্পর্ক রেখে চলার পক্ষপাতী। কিন্তু সেটা কেন? সেটা কি শুধু ভারতেরই দায়? পাকিস্তান কি আদৌ কথা শুনবে? এসবই সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে দেশবাসীকে জানানো উচিত। যার একমাত্র মাধ্যম, মিডিয়া।

জানানো আর হল কই? তার আগেই পাঠানকোটের আইএএফ এয়ারবেস কেঁপে উঠল জঙ্গি হামলায়। ঘরে-বাইরে পাকিস্তান নীতির জন্য তীব্র সমালোচনার মুখে পড়লেন মোদী।

পাকিস্তানের শরিফ শুধু নওয়াজ নন, তাঁর থেকেও বড় শরিফ আর্মি জেনারেল রাহিল। এছাড়া সরতাজ আজিজের মত ধুরন্ধর মাথা তো রয়েছেই। এদের জনপ্রিয়তা নওয়াজের থেকেও বেশি। পাক সেনাবাহিনী-মোল্লাতন্ত্র-আইএসআই জোট (বা ঘোঁট) কোনও ভাবেই আলোচনার রাস্তা খোলা রাখতে চায় না। নওয়াজ চাইলেও নয়। ফলে কথাবার্তা শুরু হবে, বৈঠকের জমি তৈরি হবে ও তারপরেই একটা জঙ্গিহামলায় সব ভেস্তে যাবে; ভারত-পাক সম্পর্কে এটা একরকম ট্র্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এবারে আলোচনার রাস্তা খোলা রাখতে বদ্ধপরিকর ভারত, এর মধ্যেই মোট ছয়বার মুখোমুখি হয়েছেন মোদি-শরিফ। অর্থাৎ পাক সরকার, যাদের বলা হয় 'স্টেট অ্যাক্টর', তাকে যে কোনও মূল্যে হাতে রাখতে সাউথ ব্লক মরিয়া। কারণ সেনা-আইএসআই-জেহাদিদের সম্মিলিত 'নন স্টেট অ্যাক্টর'দের হাজার চেষ্টা করেও ভারত হাতে রাখতে পারবে না। অতএব একমাত্র রাস্তা, তাদের দুর্বল করা। যেটা 'স্টেট অ্যাক্টর'দের হাত শক্ত করলে হতে পারে। তাই পাঠানকোট হামলার পরেও জানুয়ারির বিদেশসচিব পর্যায়ের বৈঠক বাতিল করেনি ভারত। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে, ওই তাৎক্ষণিক শুভেচ্ছা সফরের প্রাথমিক সাফল্য ধরে রাখতে সবরকম চেষ্টা চালাবে ভারত।

না হলে? সম্পর্কের ক্রমাবনতি মানে কিন্তু শেষ রাস্তা যুদ্ধই। যেটা দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান প্রেক্ষিতে কোনও মতেই কাম্য নয়। পাকিস্তান পরমাণু শক্তিধর দেশ। সেসবের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সামরিক বাহিনীর হাতে। ভারতের পরমাণু গবেষণা অসামরিক, পার্লামেন্ট যে কোনও মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করতে পারে। পাকিস্তানের সাথে বড় আঁতাত রয়েছে চীনের, তাছাড়া পাক বায়ুসেনাতে মার্কিন এফ-১৬ যুদ্ধবিমানের আধিক্য চোখে পড়ার মত। ভারতের বাহিনীও কোনও অংশেই পিছিয়ে নেই। তবু যুদ্ধপরিস্থিতির থেকে খারাপ আর কি হতে পারে? লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাবেন,

গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাবে দু'দেশ। উত্তেজনার বদলে অতএব নরমে-গরমে সম্পর্ক ভাল করার চেষ্টাই একমাত্র পথ।

আর এগুলোই দেশের সামনে তুলে ধরতে পারে মিডিয়া। যাতে শিবসেনার মত দলগুলির লাফালাফির অসারতা বুঝতে পারেন মানুষ। কিন্তু করবে কিভাবে? সব কাগজেরই নিজস্ব অ্যানালিস্ট আছেন, তাঁরা নিজেদের মত করে লেখালিখি করবেন। তাতে বক্তব্য তৈরি হবার থেকে বিতর্ক বাড়বে বেশি। বিতর্ক থাকুক, বিতর্ক ছাড়া গণতন্ত্র টেকে না। কিন্তু আমজনতার কাছে বক্তব্যই আগে দরকার। যদি মিডিয়াকে পরিস্কারভাবে ব্যাখা দিতেন কোনও সিনিয়র নেতা, তাহলে দেশের যে কোনও মিডিয়াই আগে সেটা ছাপতে বাধ্য! তারপর না হয় তর্কবিতর্ক হত। কিন্তু মানুষ তো একটা গ্রাউন্ড পেতেন। যে গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী কিছু সমর্থন পেতেন, তাঁর এই তুখোড় বিদেশনীতি জনসমর্থনের অভাবে গোল্লায় যেত না। উলটে মোদির অত্যাধিক বিদেশভ্রমণ, বিদেশে গিয়ে অপদস্থ হওয়া, মঞ্চে ফাঁকা বুলি, জুকেরবার্গকে পোজ নিতে বাধ্য করা... এসবই খবরের শিরোনামে আসছে। 'পুবে তাকাও' নীতির বদলে 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি, 'প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার' নীতি, 'ভারত মহাসাগর অঞ্চল নীতি', চিনের পাল্টা হিসেবে জাপানের সাথে সৌহার্দ্য বাড়ানোর নীতি, ব্রিকস দেশগুলির হাত শক্ত করে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার দাবি জোরালো করা, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আসিয়ান দেশের সাথে সার্ক দেশের যোগাযোগ বাড়ানো... ইত্যাদি সবই প্রায় চোখের আড়ালে থেকে গেছে। ট্যুইট করে এত ব্যাখা দেওয়া কি সম্ভব?

কিছুদিন আগে একটা ঘটনার কথা পড়েছিলাম এক মার্কিন কাগজে। অনেকগুলো ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটা লাইন আওড়াচ্ছে একজন। হাতে কিউ কার্ড, ভুল হলেই ক্যামেরা থেমে যাচ্ছে। একবার কার্ডে চোখ বুলিয়ে আবার শুরু হচ্ছে বাক্যবর্ষণ। ক্যামেরার পিছনে রয়েছেন ফোটোগ্রাফার, নামকরা সাংবাদিক থেকে প্রোডিউসার, সংবাদসংস্থার সিনিয়র ব্যুরো সবাই। 'টেক' ঠিকমত না হলে 'রিটেক'-এর ব্যবস্থাও আছে। এবং তারপরেই ক্লাইম্যাক্স। স্লোগান তুলে সামনে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা বন্দির শিরচ্ছেদ।

পাইনউড বা ওয়াল্ট ডিজনি স্টুডিও নয়, ঘটনাটা সিরিয়ার রাক্কা শহরের, আইএসআইএস গ্রুপের ঘোষিত 'রাজধানী'।

মতাদর্শ ও নানা দাবিদাওয়াকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে এইভাবেই বিপুল উদ্যোগ নিয়েছে আইএসআইএস। সংবাদসংস্থার খবর, দামি গাড়ি থেকে বিলাসবহুল থাকার ব্যবস্থা, সাংবাদিকদের জন্য সবকিছুই করতে রাজি তারা। যে সম্মান সাংবাদিকদের দেওয়া হয়, তা প্রায় একজন সিনিয়র 'যোদ্ধা'র সমান। বাইরের মিডিয়া বাদ দিলেও আছে তাদের নিজস্ব মিডিয়া অপারেটররা। ইন্টারনেট জুড়ে তাদের সক্রিয়তায় ঘুম ছুটেছে নানা দেশের সিক্রেট সার্ভিসের। অবস্থা এমনই যে এয়ারস্ট্রাইকের লক্ষ্য হিসেবেও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে তাদের প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর সার্কেল। যার জনপ্রিয়তা পশ্চিম তো বটেই, কপালে ভাঁজ ফেলেছে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকেরও।

উল্টো ছবিটাও দেখার মত। দিন কয়েক আগে ওয়াশিংটন পোস্টের প্রথম পাতার খবর, ওবামার সিরিয়া পলিসি কতটা ঠিক, তা নিয়ে মার্কিন জনতা প্রবল সন্দেহে। আর এতেই নিজের প্রচার টিমের ওপর চটেছেন ওবামা। মার্কিন বিমানহানায় মোটেই চিঁড়ে ভিজছে না, বরং জনমত বেশি ঝুঁকছে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ওলাঁদের দিকে। ওবামার ডেপুটি ন্যাশনাল সিকিওরিটি অ্যাডভাইসার বেন রোডস থেকে ডিফেন্স সেক্রেটারি অ্যাশটন কার্টার... সব্বাইকে প্রচারের ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য হুলিয়া জারি করেছে হোয়াইট হাউস। এমনকি কেন জন কেরি বা মধ্যপ্রাচ্য পলিসির দায়িত্বে থাকা রব মালি ট্যুইটারে বেশি সক্রিয় নন, এমন প্রশ্নও উঠেছে। এদিকে ভয় অব্যাহত। সান বারনার্দিনো হামলার পর প্রায় কোনও আমেরিকানই পেন্টাগনের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না।

ছবিটা অনেকটাই এক। এবং মিডিয়ার গুরুত্ব আইএসআইএসের মত মধ্যযুগীয় বর্বরতায় বিশ্বাসী জঙ্গিগোষ্ঠীও বোঝে। শুধু সিরিয়ায় খলিফা বানানো নয়, সারা পৃথিবীতে মৌলবাদকে ছড়িয়ে দিতেও তাদের বড় ভরসা মিডিয়া। তাতে ফলও মিলেছে অনেক, ইউরোপ থেকে তো বটেই, ভারত থেকেও অনেকে সিরিয়া গিয়ে যুদ্ধে যোগ দিচ্ছে। এদিকে জঙ্গিহামলার ভয়ে মার্কিন জনতা শিহরিত, ওবামার গদি টলমল করছে। কারণ সে অর্থে দেশের জনতাকে আশ্বস্ত করার জন্যও হোয়াইট হাউস থেকে বক্তব্য আসছে না। অনিবার্য ফল, ডোনাল্ড ট্রাম্পদের মত ব্যক্তিদের হাত শক্ত হওয়া। এদেশেও এরকমই অবস্থা। পাকিস্তান নিয়ে সেভাবে বলার লোকই নেই। জেটলির মত সুপণ্ডিত, সুবক্তা ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ অবধি বাজেটের পর মাত্র কয়েকবার সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। শুধু পার্থক্যটা হচ্ছে, ওবামা তাও ব্যর্থতা আন্দাজ করে বাড়তি সক্রিয় হবার নির্দেশ দিয়েছেন। মোদি এখনও সেই তিমিরেই। এমনিতেই তাঁকে নিয়ে সমালোচনার শেষ নেই। বাজপেয়ীর ১১ বছর পর প্রথম করা চূড়ান্ত নাটকীয় সফরটিও অন্তত দেশবাসীর চোখে মাঠেই মারা গেল।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে সুকান্ত চৌধুরী মিডিয়া নিয়ে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতায় স্বীকার করেছিলেন, মেনস্ট্রিম মিডিয়ার জায়গায় যতই সোশ্যাল মিডিয়া আসুক না কেন, মেনস্ট্রিম মিডিয়ার স্বকীয় জায়গাটা কেউ নিতে পারবে না। সেইজন্যই মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট রাজনীতিতে এত গুরুত্বপুর্ণ। আমরা সকলেই শশাঙ্কের নাম জানি। আবার আমরা কেউই তাঁর নামে বিশেষ কিছু জানি না। শশাঙ্ক বাংলার প্রথম সার্বভৌম নরপতি, বিজেতা ও সুশাসক, সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্ধনের সমসাময়িককালে পূর্ব ভারতে এক শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। সে রাজ্যের নামটা আছে, মালদার গৌড়, রাজধানী কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসাবশেষটুকুও আজ আর নেই। যা আছে, তা হল নানাপ্রকার কলঙ্ক ও রটনা। যেমন শশাঙ্ক নাকি ছলচাতুরির দ্বারা হর্ষের দাদা রাজ্যবর্ধনকে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের নামে একাকী ডেকে এনে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করেন। আবার শশাঙ্ক নাকি বৌদ্ধধর্মের অনেক বিনাশ করেছেন, শৈব ছিলেন বলে অন্য ধর্ম সহ্য করতে পারতেন না। ভিনসেন্ট স্মিথ ও পরে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ছাড়া এসব গুজবের কেউ যুক্তিসম্মত প্রতিবাদ করেননি। ডক্টর মজুমদার প্রতিটি গুজবের অসারতা প্রমাণ করেছেন, হর্ষের চরিতকার বাণভট্ট ও সুহৃদ হিউয়েন সাং-এর নানা উক্তির মধ্যে স্ববিরোধও তুলে ধরেছেন। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক অনেক

অভিযোগেরই নিষ্পত্তি করেছিলেন তিনি। হিউয়েন সাং শশাঙ্কের মৃত্যুর এক বছর পরে গৌড় রাজ্যে গিয়েছিলেন, তখনই তিনি সেখানে অন্তত দশটি বৌদ্ধ বিহার ও দশ হাজার ভিক্ষুকে সেখানে দেখতে পান। সারকথাটি লিখেছেন শেষে, তাঁকে সব মত খণ্ডন করতেই পরোক্ষ প্রমাণের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। শশাঙ্ক বাঙালির ভীরু বা যুদ্ধবিমুখ পরিচিতি একাই ঘোচাতে পারতেন। স্বয়ং উত্তরপথনাথ হর্ষও তাঁর স্বাধীনতা নষ্ট করতে পারেননি। আসলে "বাণভট্টের মত চরিত লেখক অথবা হিউয়েন সাং-এর মত সুহৃদ থাকিলে হয়ত হর্ষবর্ধনের মতই তাঁহার খ্যাতিও চতুর্দিকে বিস্তৃত হইত। কিন্তু অদৃষ্টের নিদারুণ বিড়ম্বনায় তিনি স্বদেশে অখ্যাত ও অজ্ঞাত ও শত্রুর কলঙ্ক কালিমাই তাঁহাকে জগতে পরিচিত করিয়াছে"।

মোদীর অবশ্য স্তাবকের অভাব নেই। ইতিমধ্যেই নানারকম মোদিচরিত প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাও নিজের দোষেই তিনি তাঁর ফাঁকা বুলি ইমেজকে শক্ত করে গাঁথছেন। গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম একে অপরের পরিপূরক। মার্কিন মিডিয়া তাঁর ওপর বিরূপ জেনে তিনি গত সেপ্টেম্বরের মার্কিন সফরে প্রায় সমস্ত মার্কিন সংবাদসংস্থার সাথে বৈঠক করলেন। এটা নিজের দেশে আগে করা দরকার। শুধু সেলফি তুললে মানুষের কাছে বিদেশের ছবি আসে, বিদেশনীতির সাফল্য আসে না। আর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আপাতত সাফল্যের মুখ না দেখা মোদির বিদেশনীতিও প্রশ্নের মুখে পড়লে তা ভোটের বাক্সে কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটা অবশ্য সময়ই বলবে।

প্রতীক্ষা

দেবদত্ত

জানুয়ারী ১৭, ২০১৬

সকাল

আজ বাংলা বন্ধ, তায় আবার শুক্রবার। অন্য সময় হলে অঞ্জনা আজ ছুটি নিয়ে নিত, যেমন তার রুমমেটরা নিয়েছে। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা আলাদা। শেষ চার মাসে তার জীবন যে নতুন মোড় নিয়েছে! আজ তেরো দিন হয়ে গেল, সে তার দেখা পায় নি। বাড়িতে মন টেকে?

অঞ্জনা ফাইনান্সিয়াল আকাউন্ট্যান্ট, একটি নামী বহুজাতিক সংস্থায় কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। নিজের ডিগ্রীর কথা মনে করলেই অঞ্জনার হাসি পায়। তার মতো লাজুক প্রকৃতির দিবাস্বপ্নে অভ্যস্ত মিতভাষী মেয়ের ক্ষেত্রে এই প্রফেশনটা বড্ড বেমানান। কিন্তু সে দিব্বি চালিয়ে যাচ্ছে বেশ আনন্দের সাথেই। কর্মক্ষেত্রে সুনামও আছে বেশ! অবাক লাগে মাঝে মাঝে। ওই যে বলে না, মানুষ নিজের দুচোখ দিয়ে সারা পৃথিবী দেখতে পায়, কিন্তু নিজেকে দেখার জন্যে আরশি লাগে? সে বোধহয় নিজেই নিজেকে ঠিক চেনেনা!

যাই হোক, আজ তো সব বাস বন্ধ, তাই সংস্থা থেকে pick-up এর ব্যবস্থা করেছে, সকাল সাড়ে ছটার মধ্যে অফিস পৌঁছে দেবে, বন্ধ্ শুরু হওয়ার আগেই। তাই এই কনকনে ঠাণ্ডায় কাকভোরে অঞ্জনাকে লেপ এর ওম ছেড়ে বেরোতে হয়েছে, গাড়ি এলো বলে! আগে যখন এরকম হত, অঞ্জনার মনে পড়ে, কত গালমন্দ করত তার সংস্থাকে এরকম উদ্ভট ব্যবস্থার জন্যে। আজ কিন্তু সে ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না! মনে মনে খুব বকুনি দিল সে নিজের মনের এই অবস্থা কে।

Beige Shirt এর ওপর dark purple রঙের Business Suit। সে শুনেছে, প্রেমে পড়লে নাকি মানুষ এর হৃদয় এর রঙ purple হয়ে যায়। মুচকি হেসে সে আয়নায় নিজেকে দেখে। perfect! অঞ্জনা আহামরি সুন্দরী নয়, তবে লাবণ্যময়ী। পরিষ্কার গায়ের রঙ, দীর্ঘাঙ্গী, চেহারা একদম কালিদাসীয় তন্বী না হলেও নজর কাড়ে। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল তার কাজল-কালো দীঘল চোখ। এই জন্যই বাবা নাম রেখেছিলেন অঞ্জনা, ডাকনাম আঁখি। যদিও তিনি এখন সাথে নেই, রুমমেটরা তাকে তার ডাকনামেই ডাকে। গাড়ি-র হর্নে সম্বিত ফিরলো তার।

ভোরবেলা, বন্ধ্ এর বাজার। চারিদিক ফাঁকা, কুয়াশায় ঢাকা। দেখে এমন অনুভূতি হয়, যে সেটা আনন্দের না দুঃখের ঠিক বোঝা যায় না। গাড়ীটা ওদের মাত্র চারজনকে নিয়ে যেন আজ পক্ষীরাজ। কখন যে পৌঁছে গেল, বোঝাও গেল না। অঞ্জনা গাড়ি থেকে নামলো। সামনেই বাসস্টপ। এখানেই সে প্রথম দেখেছিল নীল কে, সেদিনও ছিল শুক্রবার।

তবে সকালে নয়, বিকেলে। সেটা ছিল শ্রাবণ মাস। বিকেলে অঝোর ধারায় নামলো বৃষ্টি। অঞ্জনা একটা কফি নিয়ে অফিসের ব্যালকনি তে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল তাকে। "দীর্ঘকায়, শ্যামবর্ণ , উচ্চতার নিরিখে ঈষৎ কৃষ"। কচি কলাপাতা T-Shirt আর Denim Pant। বড় চুল, টিকালো নাক, চোখ বন্ধ, মুখভর্তি carefully careless দাড়ি, মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় প্রসন্নতা, আকাশপানে মুখ করে ওই প্রবল বৃষ্টিতে নিরলস ভাবে ভিজে চলেছে। মনে হয়েছিল – "পাগল!"।

পরদিন আবার দেখা, food court-এ। একটা সফটওয়ার ফার্ম এর কয়েকজন মুখচেনা ছেলে-র সাথে খেতে এসেছে। একে আগে দেখা যায়নি, মনে হয় সবে জয়েন করেছে। এখানে বলে রাখা ভাল, যে অঞ্জনাদের অফিস অফিসপাড়ার এক বহুতল-এ। এখানে আরো অনেক সংস্থার অফিস রয়েছে, আর রয়েছে একটা common food court । পরদিন একেবারে মুখোমুখি দেখা food counter-এ, প্রায় ধাক্কা হয়ে যাচ্ছিলো আর কি ! প্রথমে চিনতেই পারেনি অঞ্জনা। কিভাবে চিনবে, সেদিন তো সে একেবারে clean-shaven, অফিস-ফর্মাল পোষাকে, ধরতে একটু অসুবিধে হয়েছিল। কিন্তু চোখে চোখ পড়তেই অঞ্জনা কেমন যেন গুলিয়ে গেল। উজ্জ্বল অথচ শান্ত, নিশ্চুপ অথচ প্রাণবন্ত। নিমেষে তার মন যেন বহুবছর পেছনে চলে গেল । গাড়ি-র ঝাঁকুনি তে বাবা-র কোলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। বাবা ঘুম থেকে তুলে বলল – "আঁখি, সামনে চেয়ে দেখ মা"। চোখ খুলতেই সামনে বিশাল সোনালী রঙের বালুচর, তার ওপারে দিগন্ত বিস্তৃত জল, আর তার নীল রঙে সন্ধ্যের অস্তগামী সূর্য যেন আবীর ঢেলে দিয়েছে।

- "excuse me" বলে মুচকি হেসে সে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। অঞ্জনা যেন নড়তেও পারল না।

অফিস

"টিং-টং" – লিফ্টটা জানিয়ে দিল যে সে এসে গেছে। আগডুম-বাগডুম ভাবতে ভাবতে অঞ্জনা কখন যে তার অফিস এর দরজার সামনে চলে এসেছে, বুঝতেও পারেনি। আজ অফিস পুরো ফাঁকা, বিশেষ করে তার কেবিনের দিকটায় তো কেউই আসে নি। অবশ্য একা থাকলে কখনই একাকীত্ব বোধ করে না সে, বরং নিজের মধ্যে বেশ মশগুল হয়ে যায়। ও না একটু অন্যরকম। অফিসের অন্য মেয়েদের মত ফিসফিস করে অনর্গল কথা বলতে পারে না, দল বেঁধে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে না। Social Media তে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করার কোনো দায়ও তার নেই। অনেকের মাঝে বাইরে থেকে খুব সাবলীল দেখালেও, ও অপেক্ষা করে কখন আবার একা হবে। তবে তার মানেই ওকে বোরিং ভাবাটা ঠিক হবে না। ও ভালবাসে বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন idea নিয়ে আলোচনা করতে, স্বপ্ন দেখতে ও দেখাতে। আসলে ও তো প্রকৃতিপ্রেমী, যারা প্রকৃতিকে ভালবাসে, তারা স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে কেমন যেন ঝুলে থাকে।

আর ভালবাসে খেতে। তার মধ্যে আজকাল আবার আশেপাশের দোকানগুলোতে junk food খেতে যাওয়াটা বেড়ে গিয়েছে। নীলকে দেখতে পাওয়া যায় কিনা! সেও তো সিগারেট খেতে নিচে নামে। আর কি অদ্ভুত ব্যাপার, অঞ্জনা নীচে নামলেই নীলকে ঠিক দেখতে পায়, সে যে সময়-ই নামুক না কেন। কাকতালীয়? কে জানে! শুধু তাই নয়,

অঞ্জনা যখন সকালে অফিস আসে, প্রায়ই নীলকে দেখতে পায়, কখনো বাসস্টপ এর পাশে দাড়িয়ে , কখনো লিফ্ট-এ। দেখা হয়েই যায়। নাহলে food court –এ, নাহলে ফেরার সময়। দুজনে আলাদা অফিসে কাজ করে, কিন্তু দিনে অন্তত একবার তাদের দেখা হবেই। আর যেদিন হয়না, সেদিন যেন কিছুতেই সময় কাটতে চায় না, কিছুই ভাল লাগে না। পুজোর ছুটিটা যে কি খারাপ কেটেছে, সেটা একমাত্র অঞ্জনাই জানে। এই অনুভূতিটা অঞ্জনার কাছে নতুন, তাই প্রথম প্রথম সে বোঝে নি। দেখা হলেই প্রাণভরে তাকিয়ে থাকত চিতাবাঘের সৌন্দর্যে মোহিত হওয়া ময়ুরীর মতো। তার হাত নেড়ে কথা বলা, হাঁটাচলা, ভুবনভোলানো হাসি – সবই ভালো লাগত। কয়েকবার চোখাচোখিও যে হয়নি তা নয়। কিন্তু বুঝল সেদিন, যখন পরপর দুদিন নীল অফিসে এলো না। একটা অন্যরকম অননুভূত কষ্টে সে ডুবে গেল। যেন ভেতর থেকে কিছু উঠে এসে গলার কাছে দলা পাকিয়ে আছে, কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না। প্রথম দর্শনে প্রেম তো একটা আজগুবি ব্যাপার, শুধু উপন্যাস আর সিনেমাতেই হয়ে থাকে – এরকম ধারনা ছিল অঞ্জনার। কিন্তু কষ্ট পাওয়ার যে কি সুখ, এই ঘটনা না ঘটলে বোধকরি অঞ্জনার বোঝা হত না।

এভাবে ভালই কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। কিন্তু চুম্বক যখন লোহাকে আকর্ষণ করে, প্রকৃতির নিয়মেই লোহাকেও প্রত্যুত্তর করতে হয়। এরকমই একদিন অঞ্জনা নীল এর চোখে নিজের সর্বনাশ দেখতে পেল। আর নীল এর ঠোঁটের রহস্যময় হাসি সেটা সুনিশ্চিত করলো। সেদিন থেকে অঞ্জনার উৎসাহ তো দ্বিগুণ হল, কিন্তু সে আর চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে না।

অথচ তার নামটাই জানত না সে মাত্র দুমাস আগেও। আপন মনে হেসে ওঠে অঞ্জনা। সেদিন food court -এই তো, ওর এক বন্ধু ওকে নাম ধরে ডাকল। অঞ্জনার তখন মনে হয়েছিল যে তাকে দেখেই যেন বন্ধুটি ডাকল, যেন জানিয়ে দিতে চাইল তার নাম। অন্য সময় হলে অঞ্জনা এটাকে অভদ্রতা ভাবত, কিন্তু সে যেন কৃতজ্ঞ বোধ করল।

তবে আগেই ভাল ছিল, নামটা জানার পরে যেন তার সমস্যা চতুর্গুণ হয়ে উঠল। সারাদিন মনের মধ্যে অনুরণন, “নীল – নীল – নীল”। অথচ সামনে এলেই সে নার্ভাস হয়ে যায়, কোনরকমে লুকিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে। কিন্তু নীল এর মুখ শেষ কিছুদিন ধরে সবসময়ই ভাবলেশহীন। মাঝে মাঝে রাগ-ও হয়। “আমি কতকিছু তোমায় বলতে চেয়েও পারছি না, আর তুমি এমন ভাব করছ, যেন কিছুই জানো না”। অবশ্য নীল কে পুরোপুরি দোষ দেওয়াও চলে না। বিশেষ করে ওই অবিশ্বাস্য ঘটনার পরে তো একেবারেই নয়।

দার্জিলিং গিয়েছিল অঞ্জনারা সবাই মিলে। ভোরবেলা Tiger Hill বেড়াতে গেছে, আকস্মিক একটু দূরে মেঘ আর কুয়াশার মধ্যে থেকে হাত নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এলো এক মূর্তি; নীল! প্রথমটা অঞ্জনা বিস্ময়ে থতমত খেয়ে গেল, তারপর শুরু হল চেনা হৃৎকম্প, সেটা বুক থেকে ছড়িয়ে পড়ল হাতে, পায়ে। অঞ্জনা ঘাড় নিচু করে কোনরকমে দেখতে না পাওয়ার ভান করে সেখান থেকে পালালো। ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল – “ওরে মুখপুড়ি, যা! এতদূরে এসেও দেখা হওয়াটা নিছক কাকতালীয় হতে পারে না, নিজে না বলতে পারিস, শুনে তো দেখ ও কি বলছে?”। কিন্তু সেটুকু সাহসও সে সঞ্চয় করে উঠতে পারল না! আচ্ছা, এরকম কেন হয়? অঞ্জনা তো এমনিতে

খুবই চৌকশ এবং সাবলীল মেয়ে, কিন্তু নীল সামনে এলেই ও এরকম কেন করে? এর উত্তর বোধকরি শুধু অন্তর্যামীই জানেন!

একটা বাজে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো অঞ্জনা। এর আগেও কয়েকবার ব্যালকনি থেকে ঘুরে এসেছে সে, বাসস্টপের পাশের চা দোকানে নীলকে দেখতে চেয়ে। কিন্তু দোকানটাই তো বন্ধ। আগে যে সন্ধিক্ষণ নিজে থেকেই বারে বারে আসতো, তার প্রত্যাশায় অঞ্জনার আজ ব্যাকুল ! ফুড-কোর্ট এর দিকে পা বাড়ালো সে। ফুড-কোর্টও প্রায় ফাঁকা। কাউন্টার থেকে খাওয়ার নিয়ে সেই টেবিলটাতে বসলো। সেটা দার্জিলিং-এর ঘটনার আগের কথা। হঠাৎ ঠিক পেছনের টেবিলে অতিপরিচিত গলা পেলো সে। তাকিয়ে না দেখলেও বুঝতে পারল, নীলের বন্ধুরা মজার ছলে নীলকে ঠিক তার পিঠোপিঠি চেয়ারটাতে বসিয়েছে। বাঁদিকের ছেলেটা একটু উঁচু গলায় কৌতুকমিশ্রিত স্বরে বলে উঠল – "কিরে নীল, অমন কাঁপছিস কেন? জ্বর আসলো নাকি?" ডানদিকের জন ততোধিক কৌতুক করে বলল – "চুপ করে আছিস কেন? আমাদের তুই ঈশ্বর ভাবতে পারিস"। নীল অবাক হয়ে জিগ্যেস করলো – "ঈশ্বর"?

- "হ্যাঁ, মানে ঈশ্বরের কাছে মানুষ যেমন নিজের সদিচ্ছা", – একটা ইঙ্গিতপূর্ণ বিরতি দিয়ে – "বদ-ইচ্ছা সবই নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে পারে, সেরকম আমাদের কাছেও তুই বলতে পারিস"। একটা হাসির রোল উঠল।

নীল ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলল – "হ্যাঁ, ঈশ্বরের সাথে তোদের মিল আছে বইকি"!

- "কিরকম"?

-"ঈশ্বর বা দুপেয়ে গর্দভ, কোনোটাই তো আগে কেউ দেখেনি!" হাসতে হাসতে অঞ্জনা পেছন ফিরে তাকালো। ফাঁকা চেয়ারটা আজ তাকে দেখে যেন ক্ষমা চেয়ে নিল!

বিকেল

দিন শেষ হয়ে এলো, কিন্তু নীল এর আজও দেখা নেই। কোথায় গেল সে? তেরোটা দিন তাকে না দেখেই কাটিয়ে দিলো? আবার তো সামনের দুদিনও দেখা হবে না! পারতো না কি সে আজ আসতে? না তার কোনো feelings-ই নেই? আশা আর মুগ্ধতার "নীল" আকাশে ধীরে ধীরে অভিমান এর ধূসর মেঘ দেখা দিতে লাগলো। তবে এরকম তো শেষ কয়েকদিন ধরেই হচ্ছে। অভিমানে ফুঁসতে ফুঁসতে অঞ্জনা প্রতিদিন বাড়ি যায়, আবার পরের দিন সকালে অফিস আসে পূর্ণ উদ্যমে, আগের দিন এর চেয়েও বেশী আশা বুকে ভরে ।

এমন সময় কেবিনের দরজায় "ঠক ঠক" – "ম্যাডাম, drop এর গাড়ি যে ওয়েট করছে, আপনি যাবেন না"? দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল অঞ্জনা, সাড়ে চারটে। একটু ভেবে সে উত্তর করল – "না, আমার একটু কাজ আছে। তুমি ওকে বেরিয়ে যেতে বলো। এমনিতেই সাড়ে ছটায় বন্ধ্ কেটে যাছে, কিছু না কিছু ঠিক পেয়েই যাব"।

অঞ্জনা যখন নিচে নামলো তখন কাঁটায় কাঁটায় সাতটা। নীল যেদিন দেরী করে অফিসে আসে, সেদিন সাতটার সময় ওকে সামনের দোকানে দেখা যায়, কখনো একলা, কখনো কলিগদের সাথে। অনেক আশা নিয়ে অঞ্জনা এসেছিল নীচে, কিন্তু কোথায় কে? এদিকে কুয়াশার চারিদিক ঢেকে গেছে, যেন একটা বিশাল কালো চাদরে আকাশ-বাতাস মুড়ে দিয়েছে। অন্য দিন রাস্তার আলোয় বহুদূর দেখা যায়, কিন্তু আজ যেন সেগুলো মলিন। সামনের ধুধু মাঠটার অস্তিত্ব নেই, যেন সীমাহীন একটা কালো পর্দা! অফিস পাড়াতেও থমথমে শূন্যতা, জনমানুষহীন। কি হয়েছে আজ? তবে কি বন্ধ্ এখনো কাটে নি? বাংলার মানুষের কর্মসংস্কৃতিকে একচোট গালমন্দ করল অঞ্জনা।

অঞ্জনার মনের অবস্থাও একই রকম। শেষ আশাও যখন ব্যর্থ হল, তাকে যেন হতাশায় ঘিরে ধরল। মনে হচ্ছে যেন আর কোনদিন সে নীলকে দেখতে পাবে না। দুফোঁটা জল কখন যেন তার নিজের অজান্তেই গাল বেয়ে নেমে গেল। চোখ মুছে নিলো অঞ্জনা, আর মন ভরে গেল তীব্র অভিমানে। "আমিও সোমবার থেকে এক সপ্তাহ ছুটি নেব, আর তারপরেও দেখা করব না"।

আধ ঘন্টা কেটে গেল, কোনো বাসের দেখা নেই। এমনকি সামনের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডও ফাঁকা! যদিও ওর বাসস্থান এখান থেকে খুব দূরে নয়, কিন্তু এই সুনসান রাস্তায় একা মেয়ে, ভয় তো লাগেই না? অন্য সময় হলে এরকম ছমছমে পরিবেশে অঞ্জনার খুব ভয় করত, টেনশনে পড়ে যেত সে কিভাবে বাড়ি ফিরবে ভেবে। কিন্তু এখন ওর মন রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে এতই অশান্ত, যে সেখানে ভয়ের কোনো জায়গাই নেই।

অঞ্জনাদের অফিসের ব্যালকনি থেকে তাকালে এখন দেখা যেত একটি দীর্ঘ ছায়ামূর্তি লম্বা পদক্ষেপে পেছন থেকে অঞ্জনার দিকে এগিয়ে আসছে। গাঢ় খয়েরী রঙের Hoody তে তার মাথা ঢাকা, তাই এখান থেকে মুখটা দেখা যাচ্ছে না। আগন্তুক ধীরে ধীরে তার গতি কমিয়ে অঞ্জনার থেকে একটু দূরে এসে দাঁড়ালো। অঞ্জনা নিজের মধ্যেই বিভোর, মাথা নিচু করে করে বোধহয় বাসস্টপের সিঁড়ি গুনছে, কিন্তু কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারছে না।

- "অঞ্জনা!" – একটা সুপরিচিত আবেগঘন কণ্ঠস্বরে অঞ্জনা চমকে মুখ ফেরালো। এতো সেই মুখ যাকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল সে! তার দিকে নিরলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, মুখ শিশুসুলভ দুষ্টুমিতে ভরা। এক নিমেষের জন্য অঞ্জনার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, গাল আরক্ত হয়ে গেল। পরক্ষনেই দ্বিগুণ অভিমানে মন ভরে গেল। আগের সব লজ্জা, সঙ্কোচ ভুলে ঝাঁঝালো সুরে সে জিজ্ঞেস করে বসলো – "কোথায় ছিলেন এতদিন"? অঞ্জনা উপলব্ধি করল যে সে কি অসাধ্যসাধন করে ফেলেছে ! ওকে জাগিয়ে তুলতে মনে হয় এই বিচ্ছেদটা প্রয়োজনীয় ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো – "আপনাকে ছেড়ে আর কোথায় যাব বলুন ? একটা জরুরী কাজে অনেক দূর যেতে হয়েছিল, কিন্তু আর মন টিকলো না, তাই চলে এলাম আপনাকে দেখতে"।

এক পলকের নিস্তব্ধতা।

নীল আবার দ্বিগুণ দুষ্টুমি ভরা গলায় বলে উঠলো – "আপনাকে দেখলেই যে আমার মনে হয় শ্মশানে আছি!"

চূড়ান্ত হতবাক হয়ে অঞ্জনা বলল – "মানে"?

-"ওই যে বলে না – সুখ শয়নে, শান্তি শ্মশানে? আপনাকে দেখলেই যে আমি চরম শান্তি পাই" – সাথে অট্টহাসি!

-"Poor Joke"! আগুনের অল্প উষ্ণতাতেই মোম যেমন গলে যায়, অঞ্জনা তেমনি গলে গেল। মুখমণ্ডল ভরে গেল লালিমায়, আর্দ্র ঠোঁটের কোনাগুলি কানের সাথে মিশে যেতে চাইল, যেন কতদিনের বিরহী যুগল! রোমে রোমে শিহরন বয়ে গেল, আর কোনোকিছুই যেন তার নিয়ন্ত্রণে রইল না। মনে ভিড় করে এলো অজস্র নারীসুলভ প্রশ্ন, কিন্তু কোনটা আগে করবে, খুঁজে পেল না।

-"যাক, কুয়াশাটা কাটলো তাহলে!"

-"কোথায়?"

-"আপনার চোখে। এখন স্বাভাবিক লাগছে! এরকমই থাকেন না কেন সবসময়? কথা দিন, এভাবেই থাকবেন, আর বিষণ্ণ হবেন না?"

অন্যদিনের ভাবলেশহীন ছেলেটাকে যেন আজ চকিত সাবলীলতায় পেয়ে বসেছে !

-"আপনি থাকতে দিলে তো? কিছু না জানিয়ে কোথায় যে চলে গেলেন!"

-"উপর থেকে order এলো, জরুরী কাজে বাইরে যেতেই হল, আটকাতে পারলাম না। কিন্তু আপনাকে জানাবোই বা কি করে? কথা বলতে গেলেই আপনি তো নার্ভাস হয়ে যান! আপনার ফোন নম্বরও আমার কাছে ছিল, কিন্তু আমি আপনার সাথে প্রথম কথা সামনাসামনি বলতে চেয়েছিলাম।"

গভীর অসুখ থেকে উঠে আসা রোগী যেমন ছোটোখাটো সর্দিকাশিকে পাত্তাই দেয় না, তৃপ্তিভরে তার সুস্থ হয়ে ওঠাকে উপভোগ করতে চায়, সেভাবেই অঞ্জনা নীল এর প্রথম বাক্যটা অগ্রাহ্য করে গেল। কিন্তু তার নার্ভাস হয়ে যাওয়ার কারণ তো সে নিজেই আজ অবধি খুঁজে পায়নি! মনের মধ্যে ভিড় করে আসা নেহাতই অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নগুচ্ছ থেকে একটা তুলে নিয়ে বলল – "আ-আপনি আমার ফোন নম্বর জানলেন কি করে? আর নামই বা জানলেন কি করে?"

নীল একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল – "নাম টা তো আপনার identity card এই রয়েছে, তাই না? আর তথ্যপ্রযুক্তিতে কাজ করি ম্যাডাম, নাম আর সংস্থা জানা থাকলে একটা ফোন নম্বর খুঁজে পাওয়া কি এমন ব্যাপার!" একটু থেমে আবার বলল – "শুনুন, আজকে আর এখান থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। চলুন, আমার সাথে হাঁটবেন? তিন-চার কিলোমিটার গেলেই এই পাণ্ডববর্জিত দেশের শেষ। তারপর লোকালয় এলে আপনাকে কোনো ট্যাক্সিতে তুলে দেব।" অঞ্জনা নীরবে মাথা নাড়ল। আদ্যোপান্ত স্বনির্ভর মেয়েটির আজ কি হয়েছে কে জানে, সে চাইছে এই আপাত অপরিচিত যুবকের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে, সমস্ত আবদারে সম্মতি জানাতে।

বিশাল শিশিরভেজা মাঠের বুক চিরে চলে গেছে নগরোন্নয়ন দপ্তরের পরিকল্পিত রাস্তা, দুপাশে লাগানো গাছের সারি, মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বেমানান বহুতল। কুয়াশা হ্যালোজেনের আলো মেখে সৃষ্টি করেছে এক অদ্ভুত মায়াবী পরিবেশ, মৃদুমন্দ ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীতকালীন রাতজাগা ফুল বাতাসে মাদকতা গুলে দিচ্ছে। তার মাঝে সম্মোহিতের মতো হেঁটে চলেছে দুই সদ্যমিলীত কপোত-কপোতী, যেন তারা চায় না এ পথ কখনো শেষ হোক। পাশাপাশি দুটি মন নীরবে কত কথাই না বলে চলেছে সেই আদি ও অকৃত্রিম ভাষায়, যাতে ভাবপ্রকাশের জন্য শব্দের প্রয়োজন হয় না। হাজার হাজার বছর পেরিয়ে গেছে, আরো হাজার বছর পেরিয়ে যাবে, কিন্তু দুটি মুগ্ধ মনের রসায়ন আজও একই আছে এবং একই থেকে যাবে। এ জিনিস কালজয়ী, মানব সভ্যতার সদা পরিবর্তনশীলতা একে কলুষিত করতে পারে নি, পারবেও না।

এভাবে কতটা রাস্তা যে ওরা পেরিয়ে এলো, তা জানে না। এখন আর সামনে অন্ধকার নয়, বহুদূরে দেখা যাচ্ছে লোকালয়। সেই আলো চোখে পড়তেই স্বপ্ন ভেঙ্গে বেরিয়ে এলো নীল। হাল্কা স্বরে বলল – "কি যে আনন্দ হচ্ছে জানেন, কোনোদিন কি ভেবেছিলাম আপনার মতো লাস্যময়ী নারীর পাশে হাঁটতে পারবো?"

অঞ্জনা তখনো বিভোর। আড়ষ্ট মাদকতাভরা কণ্ঠে রহস্যময়ীর মতো অপাঙ্গে তাকিয়ে বলল – "আপনি না খুব অসভ্য!"

হাসিমাখা উত্তর এলো – "সভ্যতা তো একটা মুখোশ ম্যাডাম, তার আড়ালের মানুষটাই তো আসল, অকৃত্রিম, প্রাকৃতিক। আর আপনি যখন প্রকৃতিপ্রেমী, আমাকে তো প্রাকৃতিক হতেই হবে, তাই না? নাহলে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে কিভাবে?"

-"কি করে জানলেন আমি প্রকৃতিপ্রেমী?"

-"কেন টাইগার হিলে আপনি যেভাবে মেঘ ধরার চেষ্টা করছিলেন, মনে হচ্ছিল পারলে ওই ভানিটি ব্যাগ এ ভরে কিছুটা নিয়ে আসতে চান। আপনার সঙ্গীরা তো নিজেদের ছবি তুলতেই ব্যস্ত ছিল। আর আপনি? আপনি তো উদাস দৃষ্টিতে খাদের দিকে নিস্পলকে তাকিয়ে ছিলেন।"

অঞ্জনা হাসতে হাসতে সামনে ঢলে পড়ল, তারপর তার দক্ষ শিল্পীর তুলীর আঁচড়ের মত ভ্রু একটু উপরে তুলে সামনে ঝরে পড়া চুল কানের পাশে গুছিয়ে নিয়ে বলল – "আপনি এতটা লক্ষ্য করেছেন?"

নীল উত্তর না দিয়ে কপট অভিমানের সুরে বলল – "আপনাকে তো আমি হাত নেড়ে ডাকলাম। আপনি না দেখার ভান করে চলে গেলেন। ভেবে দেখুন তো আমাদের এই সফর যদি টাইগার হিল এর পাকদণ্ডীতে শুরু হত, তবে কেমন হত?"

অঞ্জনা দাঁতে ঠোঁট চেপে রহস্য করে বলল -"তাতে কি হয়েছে? আপনিও তো আমায় আবার পেছন থেকে ডাকতে পারতেন, যেভাবে আজ ডাকলেন?"

- "ম্যাডাম, আপনি কি জানেন আমরা দুজন একই দিনে জন্মেছি? মনে হয় তাই আমাদের এত দেখা হয়। আর সেই জন্যেই উপর থেকে আমরা যতই স্মার্ট হই না কেন, প্রয়োজনের সময় সঙ্কোচ করতে কেউ কম যাই না।"

অঞ্জনা এবারও অবাক হল, কিন্তু কিছু বলল না, শুধু অধীর আগ্রহে চোখ বড় করে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে থাকল নীল এর পরের কথাটা শোনার জন্য। কথার বিষয়বস্তুটার কোনো গুরুত্বই নেই, সে শুধু আজ শুনতে চায়।

নীল অঞ্জনার চোখে চোখ রেখে বলল -"আপনার নাম ময়ূরাক্ষী হওয়া উচিত ছিল, কে দিয়েছে আপনাকে এই বেমানান নাম"?

অঞ্জনা ছদ্ম রাগতস্বরে বলল – "আমার বাবা দিয়েছেন। আমার আরো একটা নাম আছে, এটা পছন্দ না হলে আমাকে আঁখি বলেও ডাকতে পারেন"।

নীল খুব ভয় পেয়েছে এমন ভাব করে বলল -"এই রে! মস্ত ভুল হয়ে গেছে। প্রথমদিনই পিতৃদেবের চরনযুগলে টান মারাটা একদম উচিত হয় নি"। তারপর ঈষৎ বিরক্তস্বরে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল – "নীল, তুই কি রে? এরকম করলে তো ঘুড়ি বাতাস লাগার আগেই গোত্তা খেয়ে পড়বে।"

তারপর নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল -"না না, কি দরকার বাবা, আমি আপনাকে ওই অ-অঞ্জনা বলেই ডাকব। একেবারে সাপের মুখে পড়ে গেছিলাম আর কি! জয় বাবা।"

খিলখিল করে হেসে উঠল অঞ্জনা। – "আপনি পারেনও বটে!" তারপর একটু সামলে নিয়ে বলল – "চিন্তা নেই, ওই নামটাও বাবারই দেওয়া। তাছাড়া আপনার দেওয়া নাম এর ছোঁয়াও তো রইল। কেমন?"

এবার নীল একটু উদাস অথচ গাঢ় স্বরে বলে চলল -"জানেন আঁখি, আপনি না ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, ফুলের মত সুন্দর। তাই আফসোস হয়, যদি আর কিছুদিন আগে আপনার সাথে কথা বলতাম, তাহলে শেষ কয়েকমাসে কতই না সুখস্মৃতি তৈরী হত।"

অঞ্জনা মাথা নিচু করল, কিছু বলতে পারল না। চাঁদ জানে আলো তার নিজের নয়, কিন্তু সেটা রূপমুগ্ধকে বোঝায় কার সাধ্যি! সে আবার মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল। এই যুবক এর ভাবলেশহীন মুখের পেছনে যে এত আবেগ লুকিয়ে ছিল, তা কি সে জানত? এতদিন তো সে নিজের মনেই ভালবেসে গেছে পরিবর্তে কিছু না আশা করেই। এই প্রাপ্তি তার কাছে নতুন এবং আশাতীত, তাই সে প্রাণভরে উপভোগ করছে। অতীতে কি হতে পারত, সেটা ভেবে দেখার ফুরসৎই তার নেই! সে তো এখন বর্তমানেই বিভোর।

ওরা এসে দাঁড়ালো সেই চৌমাথায়, যেখানে অফিসপাড়া গিয়ে মিলেছে লোকালয়ের সাথে। মোড়ের মাথায় একটা চা দোকানে তেলের লম্ফ ধিকধিক করে জ্বলছে।

-"চা খাবেন?"

-"চলুন।"

অঞ্জনা এত রাতে চা খায় না, কিন্তু যতটা সময় কাটানো যায়!

নীল চায়ে চুমুক দিয়ে দুষ্টু হেসে বলল – "আপনি এই যে ফুঁ দিয়ে দিয়ে চা খান, আমার দেখতে বেশ লাগে"। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল – "এমনকি এত মনোযোগের সাথে করেন যে আমার তো দৃঢ় ধারনা আপনি কোল্ড ড্রিঙ্কসও ফু দিয়ে খান। তাই না?"

অঞ্জনা লজ্জা পেয়ে বলল – "যাঃ ! আবার মস্করা হচ্ছে?"

"আচ্ছা দেখুন তাহলে" – বলে নীল নকল করে দেখাতে শুরু করল।

অঞ্জনা হাসবে না কাঁদবে খুঁজে পেল না। এই ছেলেটা বদ্ধ পাগল !

হাসি থামিয়ে একটু তির্যকভাবে সে বলল- "আপনি তো আবার সিগারেট ছাড়া চা খেতেই পারেন না ! এখন খাচ্ছেন না যে"?

নীল নির্বিকারভাবে বলল – "তা ঠিক, কিন্তু সেটা করলে আপনি তো আবার সেদিন এর মত রুমাল বের করে নাকে চাপা দেবেন! শ্বাসরোধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেই ঝুঁকি কে নেবে বলুন?"

অঞ্জনা বিগলিত স্বরে বলল – "আপনাকে সিগারেট হাতে দেখতে খুব ভাল লাগে, কিন্তু আমার যে গন্ধটা ভাল লাগে না, তাই। আচ্ছা খান, আমি রুমাল বের করব না। কিন্তু ওই জিনিস আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে কিন্তু মোটেই ভাল নয়।"

নীল বলল – "এতদিন ঠিক ছিল, কিন্তু এখন আমার স্বাস্থ্যের কথা আর আমি ভাববো কেন? আপনি আছেন তো ভাবার জন্য!"

তারপর পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে বাঁ হাতে আঙ্গুলের ফাঁকে ধরে বলল – "ঠিক আছে, একটা মধ্যমার্গে আসা যাক। এটা আমার হাতে থাকবে, কিন্তু জ্বালাব না। আপনারও রইল, আমারও রইল।"

এবার দুজনেই একসাথে হেসে উঠল। তারপর চলল আর হাসি, মজা আর খুনসুটি। যেন দুজন দুজনকে কতদিন ধরে চেনে, জানে। চা যেন শেষই হতে চায় না! এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে। নীল তার হাতঘড়ির দিকে একবার দেখে নিয়ে বলল – "না ম্যাডাম, অনেক রাত হল, এবার আপনার ফেরা উচিত, চলুন আপনাকে একটা ট্যাক্সি ঠিক করে দি"। অঞ্জনা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি জানাল। নীল সামনের ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্যাক্সিকে অঞ্জনাদের বাড়ির ঠিকানা বলে জানতে চাইল সে যাবে কিনা। অঞ্জনা আর অবাক হচ্ছে না, ওর দৃঢ় ধারনা হয়েছে যে নীল বোধহয় তার সমস্ত কিছুই জানে ! কিন্তু কেন কি জানি, তার জানতে ইচ্ছে করছে না কিভাবে। একদিনে এতকিছু হজম করা তো আর সহজ ব্যাপার নয়।

অঞ্জনা মুখ ফিরিয়ে গাড়ির দরজা খুলতে যাবে, শুনতে পেল – "আঁখি, এক মিনিট"। অঞ্জনা আবার ঘুরে দাঁড়াতে নীল বলে চলল – "আপনাকে যেতে দিতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু উপায় তো নেই। তবে যাওয়ার আগে বলে রাখি যে শেষ তেরোদিন আমি আপনার সাথেই ছিলাম, আপনার বেডরুম এর জানালার পাশে যে গন্ধরাজ গাছ আছে, তার ফুল হয়ে সারারাত আপনাকে ঘুমোতে দেখতাম, আর সকালবেলা ঝরে যেতাম। কিন্তু প্রেমের রঙ তো আর গন্ধরাজ ফুলের মতো সাদা নয়.." বুকপকেট থেকে একটা সদ্য ফোটা গোলাপ বের করে এগিয়ে দিয়ে বলল "..লাল!" অঞ্জনার গাল ওই গোলাপের মতোই রক্তিম হয়ে উঠল।

বাঙালি ছেলেদের প্রেমে পড়লেই কাব্যি করার ব্যাপারটা আগে তার খুব হাস্যকর মনে হত, কিন্তু আজ বুঝল, বাঙালি মেয়েরা আসলে এটা খুব পছন্দ করে, সেজন্যই ছেলেরা কবি হয়ে যায়!

"এবার আসি?" – কোনরকমে বিদায় চেয়ে নিলো অঞ্জনা।

"সাবধানে যাবেন" – বলে হাত নাড়তে থাকে নীল। অঞ্জনা ঘাড় ঘুরিয়ে নিস্পলক চোখে চেয়ে রইল আর ট্যাক্সি এগিয়ে চলল তার গন্তব্যের দিকে। নীলের অবয়ব ধীরে ধীরে ধূসর কুয়াশায় মিলিয়ে যেতে লাগলো।

পরের দিন

তারপর যে কি হয়েছিল, অঞ্জনার আর মনে নেই। কখন ট্যাক্সি থেকে নামলো, রাতে কি খেল, কখন শুতে গেল, কিছুই তার মনে পড়ে না। তবে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। কি করে আসবে, ঘুম আসার আগেই যে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গেছে!

ঘুম ভাঙল একেবারে কাগজওয়ালার কলিংবেলের আওয়াজে। অঞ্জনা ঘুমচোখে কাগজটা নিয়ে ঘরের লাগোয়া বারান্দার দোলনাটাতে গিয়ে বসলো। হেডলাইনগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে প্রথম পাতাটা ওলটাতেই চমকে উঠলো সে। চমকটা এত তীব্র ছিল, যে সে প্রায় দোলনা থেকে পড়েই যাচ্ছিল!

তৃতীয় পাতার নিম্নার্ধে একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি – তার বাঁদিকে নীল এর একটা আবক্ষ হাসিমুখের ছবি আর নীচে লেখা -

"দীপ্তনীল এর অকালপ্রয়াণে আমরা শোকার্ত ও মর্মাহত। আজ ওর শ্রাদ্ধের দিনে আত্মার শান্তি কামনা করি – মিত্র পরিবার"।

অঞ্জনা কিছুই বুঝতে পারছে না সে কি দেখছে! হাঁ করে নীলের ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে আর তার মনের মধ্যে অজস্র কথা এসে চলন্ত রেলগাড়ির কামরাগুলোর মতো দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে !

-" শ্রাদ্ধ!... শেষ ১৩ দিন!... তাহলে কি?... কাল রাতে?..."

চকিতে টেবিল এর দিকে তাকিয়ে দেখল যেখানে পোর্সেলিনের ফুলদানিতে কালকের লাল গোলাপটা রাখা ছিল। কালকের সদ্যফোটা গোলাপ আজ শুকিয়ে গেছে, শুকনো খয়েরী রঙের পাপড়িগুলো ঝরে পরে আছে পরিপাটী করে বিছিয়ে রাখা শ্বেতশুভ্র টেবিলকভার এর উপর, ডাঁটিতে রয়ে গেছে শুধু হলদেটে সাদা কলিকা ! সে ছুটে গেল টেবিলের দিকে, গভীর হতাশায় বসে পড়লো পাশে রাখা মোড়ায়। পাগলের মতো ধরার চেষ্টা করতে লাগলো একবার ফুলটাকে, একবার পড়ে থাকা পাপড়ি গুলোকে। শেষমেশ চিৎকার করে কেঁদে উঠল! তারপর টেবিলে মাথা রেখে ফোঁপাতে লাগলো।

তারপর কতক্ষণ কেটে গেছে কেউ জানে না। নিস্তব্ধ ঘরের এক কোনায় টেবিলের ওপর হাতের ভাঁজে মাথা ঢুকিয়ে বসে আছে অঞ্জনা, তার দেহ মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা খবরের কাগজে ছাপা নীল এর আবক্ষ ছবির হাসি যেন কিছুটা মলিন। আর জানালার পাশে মৃদুমন্দ বাতাসে করুণভাবে দুলছে কাল রাতে ফোটা গন্ধরাজ!

জানা নেই প্রেমের রঙ লাল না সাদা, কিন্তু মৃত্যুর রঙ স্পষ্টতই নীল!

স্বীকারোক্তি

তুষার সেনগুপ্ত

এপ্রিল ৪, ২০১৬

কালো কোট পরা লোকটাকে দেখলেই বোঝা যায় টিকিট চেকার। লোকটা হাত বাড়াল। টিকিট দেখালাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উল্টে পাল্টে আমার টিকিটা দেখল অনেকক্ষণ ধরে। লোকটার চোখে খুব মোটা কাচ লাগানো চশমা। একদম ঘোলাটে ঘষা কাঁচ। বোঝাই যায় না তাকিয়ে আছে না চোখ বুজে। কেমন যেন নির্লিপ্ত মুখ। ঠিক যতটুকু না করলেই নয় দু'টো ঠোঁট ততটুকু ফাঁক করে লোকটা অদ্ভুত ঠাণ্ডা স্বরে জিজ্ঞেস করল,

- "কতদূর যাওয়া হবে?"

- "একদম শুরু পর্যন্ত স্যার...."

আমাকে শেষ করতে না দিয়েই খুব নিঃস্পৃহ অথচ নিষ্ঠুর স্বরে লোকটা বলে উঠলো,

- "টিকিট তো অতদুর নেই। পঁচিশ পর্যন্ত যেতে পারেন...

- "স্যার পঁচিশ? আর একটু সময় দিন না স্যার। এই মাস ছয়েক মতন, এক্সট্রা..."

আমার কাকুতি মিনতিতে খুব বিরক্ত হল লোকটা। খেঁকিয়ে উঠে বলল,

- "মামার বাড়ির আব্দার নাকি? পঁচিশের টিকিট কেটে সাড়ে চব্বিশ? আহ্লাদের আর সীমা নেই। তা এতই যদি সাড়ে চব্বিশের ইচ্ছে তো টিকিট করলেন না কেন?"

- ইচ্ছে তো ছিল স্যার শুরু পর্যন্ত। কিন্তু কি করি, বিশ হাজারের বেশি ছিল না যে। ওতেই যদ্দুর হয় টিকিট কেটেছি। তখন কি জানতাম নাকি পঁচিশেই থামিয়ে দেবেন?"

আমার করুন আর্তনাদ শুনে বোধহয় মায়া হল লোকটার। মুখের কাঠকাঠ ভাবটা একটু শিথিল করে জিজ্ঞেস করল,

- "তা, সাড়ে চব্বিশে গিয়ে কি তীরটা মারবেন শুনি? ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়ে যাবেন নাকি ফিল্ম স্টার অথবা দেশের প্রধানমন্ত্রী?"

- "না না স্যার! আপনি যদি ছটা মাস এক্সট্রা দেন তো বিনুকে সত্যি কথাটা বলে আসব।"

- "ওহো সত্যবাদী যুধিষ্ঠির রে! তা কোন সত্যিটা বলবেন?"

- "স্যার! বিনুকে বলে আসব যে আমাকে পুলিশে ধরলেও, সেদিন রাতে যে তিনজন ওকে ঝিলপাড়ে টেনে নিয়ে গেছিল ওরা আমার বন্ধু হলেও ওদের সঙ্গে সেদিন আমি ছিলাম না। আমি বিনুকে সত্যিই ভালবাসতাম"

- "ওহ:! এতদিন পরে বলতে ইচ্ছা করছে? পরের দিন বলেন নি কেন?

লোকটার অসম্ভব শ্লেষ আর তাচ্ছিল্য মেশানো কথায় আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। আমি লোকটার কলার চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলাম,

- "বলতে তো চেয়েছিলাম। কিন্তু হাসপাতালের মর্গে শুয়ে বিনু কিচ্ছু শুনতে পায় নি। কিচ্ছু না...."

পাষাণ হৃদয় নিষ্ঠুর লোকটারও মনের জমে থাকা বরফ গলতে শুরু করল। বিনাটিকিটেই বাকি ছ'মাস যাত্রার মঞ্জুরি মিলল টাইম মেশিনে।

ধৈর্য

অভ্রনীল

সেপ্টেম্বর ৮, ২০১৬

ধৈর্যের বিকল্প কোনও কফি কাপ, এই ভেবে আজ
শহরে সমস্ত দিন জাহাজ তল্লাসি করে আমি
খালি হাতে ফিরে গেছি। হে পুনর্মুদ্রিত সমাজ –
তোমার সমস্ত বোধ দিনশেষে অধিকারগামী।
আমি তার কিছু দূরে, দোকানে, ছাতার ছায়া দেখে
খুলেছি বইয়ের পাতা, সহস্র বছর আগেকার।
কফিটি অর্ডারে লীন, যেরকম যিশুও, পেরেকে...
ধাবমান যান থেকে নেমে আসে মুখ, অপেক্ষার।
তাহলে কি ধৈর্য আর প্রয়োজন নেই? এই বুঝে
পুনরায় হাঁটি আর সাঁতারের মতো মনে হয়
এ জনসমুদ্রে, প্রিয়। মিশে গেছে বাদামি সবুজে
সমস্ত পৃথিবী যেন। নীল শুধু আকাশে, সময়।
পথিক, মুদ্রণহীন, হেঁটে ফিরি রাস্তা চিনে, ধীর
অতীতই তো ভবিষ্যৎ, যেরকম সুগন্ধ, কফির...

বিশ্ববাঙালি

হযবরল

ডিসেম্বর ২৩, ২০১৫

বাঙালি যখনি তাদের ক্ষুদ্র মুলুকে শুয়ে-বসে কিছু ভেবেছে বা করেছে তার মানদন্ড বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের লেভেলের নিচে কোনদিন নামেনি। শীত পড়ছে না কেন দুনিয়ার তামাম জায়গায়, এই প্রশ্ন করলে, কেউ বলবে 'এটা আমাদের দুর্ভাগ্য' আবার কেউ হয়ত বলতে পারে 'এ আমাদেরই পাপের ফল!' একটু ভূগোল জানা শিক্ষিত ব্যক্তি হলে মরশুমী বায়ুর গতি প্রকৃতি নিয়ে দু চারটে জ্ঞানের কথাও ঝেড়ে দিতে পারে। কিন্ত আমাদের এখানে, এই প্রশ্ন ক্লাস ফোরে পরা বল্টু কেও জিজ্ঞেস করলে, সে বলবে, "গ্লোবাল ওয়ার্মিং, পুনু কাকু সেদিন বলছিলো!" সুধু এখানেই সে থেমে থাকবেনা, "আরও বলছিল, এর পর নাকি কলকাতা জলের নিচে তলিয়ে যাবে। তাই বাবাকে বল এখানকার ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে দিয়ে সময় থাকতে থাকতে তিব্বতে কিছু জমি লিজে নিয়ে রাখতে।" ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় পুরো ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশবিদ্বেষী হাওয়ায় ভাসছে, গান্ধীজির পরের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে পুরো দুনিয়া তখনও বাঙালি কিন্ত চার্চিলের বিরুদ্ধে স্তালিনের রাশিয়া না হিটলারের জার্মানি, কোনটা বেশি গ্লোবালি যুতসই হবে, সেটা নিয়ে ডিবেট করে যাচ্ছে। আমাদের পুরো আবহাওয়াটাই এতটা বিশ্বকেন্দ্রিক যে কর্পোরেশনের কলে জল না এলে ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে ধরে বিপিন খুড়ো দুটো কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়েনা," বলি ওদিকে মেরুপ্রদেশের সব বরফ গলে তো জল হয়ে গেলো। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী সেই জল তো এই কলকাতার ওপর দিয়েই বঙ্গোপসাগরে যাওয়ার কথা, তা পুনর্বিন্যাসের পর আমাদের ওয়ার্ডটা কি দিনাজপুর জেলায় পড়ে গেল নাকি?"

ছোটবেলায় দেখতাম কত মানুষের বাড়িতে টিভি নেই আর থাকলেও তখন তাতে তখনও কোনো বিদেশী চ্যানেল দেখা যায়না। কিন্ত ওই এক ভাঙ্গা রেডিওর মাথায় থাপ্পড় ও নবে মোচড় মেরে মেরে বিবিসি ধরার কি উৎসাহ। পাড়ার মোড় থেকে লোকাল ট্রেনের বগিতে, সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙ্গে যাওয়া নিয়ে কি তীব্র উদ্বেগ আর তীব্রতর তাদের বিশ্লেষণ, কিচ্ছু বুঝতে পারতাম না যে কি নিয়ে এত কথাবার্তা হচ্ছে, সুধু মনে হত যে এইখানে যা ফাইনাল দাড়াবে সেটাই গর্বাচভ, ইয়েলৎসিনরা একবাক্যে মেনে নেবে। যারা সিগনাল কে সিঙ্গেল কিম্বা প্লায়ার্স কে প্লাস বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেনা তাদের মুখেও গ্লাসনস্ত আর পেরেস্ত্রোইকার মত রুসি শব্দ সিগারেট বিড়ির মত ঘোরা ফেরা করতে লাগলো, চায়ের দোকানে চায়ের চেয়ে খবর কাগজের বেশি ডিমান্ড দেখা দিলো, বিশ্বায়ন নিয়ে বাঙালির সে কি বিস্ময় ! উচ্চমাধ্যমিকে ব্যাক পাওয়া হারুদা তো পার্টির দেওয়া চটি বই পড়ে গোটা দান্কেল ড্রাফট এমন মুখস্থ করে ফেলল যে রাষ্ট্রপুঞ্জের লোকজনেরা ওকে ফোন করে ড্রাফটের কোন পাতায় কি লেখা আছে আর তাতে ভারতের ওপর কি প্রভাব পড়তে পারে তা জানতে চাইত।

তাই এই হ্যান গ্লোবাল কানেক্টিভিটির যুগে বাঙালি যে এফবি, টুইটার কিম্বা হোয়াটস্যাপে বিশেষরকম সক্রিয় থাকবে এতে আর আশ্চর্যের কি? ভবিষ্যতে বাঙালির ইতিহাস লেখা হলে তাতে পুরো সময়টা কে ASM (আফটার সোশ্যাল মিডিয়া) ও BSM (বিফোর সোশ্যাল মিডিয়া) , এই দুটো পর্যায় ভাগ করা হবে। মানে আমার দাদু জন্মেছিল ১৯৩৭ BSM আর মারা যায় ২০০৯ ASM কিম্বা তোর গ্র্যজুএশন কি BSM না ASM? এইরকমভাবে না বললে সহজে লোকে ঠিক বুঝতে পারবে না। সোশ্যাল মিডিয়া আসার পরে দুপারেরই বাঙালিরা এতটাই বিশ্ববাসী হয়ে পড়েছে যে মোদী, দিদি আর হাসিনা একটা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করবে বলে শোনা যাচ্ছে যার সিদ্ধান্ত স্বরূপ এই দু দেশের মধ্যে পাসপোর্ট ভিসা তুলে দেওয়া হতে পারে। কোনো একটা মিডিয়ায় একাউন্ট থাকলেই এপার ওপার করা যাবে আর মানুষ এত সহজে এপার ওপার করতে পারলে স্মাগলিংও কেউ করবেনা আর থাকবেনা তিস্তার জলবন্টন সমস্যা ! বৃহত্তর বৃত্তে আরো কি কি হতে চলেছে তার হিসেব নিকেশ পরে করব, আপাতত দেখি এই সোশ্যাল মিডিয়ার হাত ধরে আম আদমির জীবনের কি কি মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। প্রথমে আসি লগইন করার পর স্টেটাস আপডেটের কথায় – শতকরা নব্বই শতাংশ মানুষ স্টেটাস আপডেটের মূল বক্তব্য ঠিক করে অন্যদের স্টেটাস দেখে লাইক ও বন্ধুদের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে জানাতে। বাকিরা ১০%রা কিন্ত আগে ভাগেই ঠিক করে নেয় যে ঢুকেই কোন ফটো দেব ও কি লিখব তার নিচে। এবার কমেন্টের পালা, শব্দ চয়ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে মোটের ওপর একই রকম হলেও অন্তর্নিহিত মনোভাব কিন্ত সম্পর্ক বিশেষে একটু আলাদা হয়ে থাকে। এই যেমন অন্যর স্টেটাস-এ কোনো একই শিশুর ফটো দেখে 'কি কিউট, ওলেবাবালে..মুআহ' লেখা আর 'ওমা ও কত বড় হয়ে গেছে, কত ছোট দেখেছি...' লেখার মধ্যে কোথাও একটা সূক্ষ্ম ফারাক আছে। বোঝা মুশকিল কোনটা আসল ও কোনটা নকল। অন্যের শাড়ি দেখে 'কি gorgeous গো, জাস্ট ফাটাফাটি....' কিম্বা 'কোত্থেকে কিনেছিস রে এটা.... কি ভালো মানিয়েছে তোকে' -এর দুইয়ের মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে সত্যি কোনো ফারাক নেই , হয় দুটোই সত্যি মন থেকে বলা অথবা দুটোর মধ্যেই কোথাও একটা সুপ্ত ঈর্ষা লুকিয়ে আছে। আবার বেকার এক যুবক তার টেম্পোরারি গার্ল ফ্রেন্ড কে নিয়ে সাউথ সিটি মলে একটা সেল্ফি তুলে তড়িঘড়ি যেই না পোষ্টালো অমনি ঠিক ওর মতই আরেকজন যে আগের দিন ঠিক একই কাজ করেছে মানি স্কয়ার মলে, সে লিখে বসলো, 'ভালই তো আছিস (a66is), ভাই আমাদেরও একটু দেখিস...', তার প্রত্যুত্তরে সেই প্রথম ছোকরা আবার লিখল, 'ব্রো, হিংসা করিস না, লেগে থাক, তোরও হবে।' দুজনেরই কমেন্ট পড়ে বুঝতে অসুবিধে হয়না যে সত্বর এই দুটোই লাথ খেয়ে সেই সস্তার বারে গিয়ে এক সাথেই বসবে!!

আরো একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করবেন যে এই রান্না বান্নার ব্যাপারটা সোশ্যাল মিডিয়াতে আসার পর কয়েকটা জিনিস হয়েছে – এক আজকাল বাড়িতে যাই খাওয়া হয় তা বেশ পরিপাটি করে পরিবেশিত হয়, সুধু মাত্র ফটো তলার জন্যে। বাঙালি এর আগে এতটা গার্নিশিং ও প্রেসেন্টেশন নিয়ে মাথা ঘামাত না বলেই জানি। দ্বিতীয়ত যতই পদ থাকুক না কেন ব্যাপারটাকে জোর করে বেশ সাদামাটা ও ঘরোয়া করে দেখানো হয়, মানে "এরকম তো রোজ হয়েই থাকে" আজকে দুপুরবেলার সিম্পল লাঞ্চ মটর শাক ভাজা, মুলো দিয়ে ডাল, বক ফুল ভাজা, আলু ফুলকপির রোস্ট, দই মাছ, কচি পাঠার নিরামিষ ঝোল ও শেষ পাতে জলপাইয়ের চাটনি..." একদল রাঁধুনিরা আবার তাদের

অভিনবত্বের প্রশংসার দায়টা পুরো পরিবারের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়, "বিকেলের জলখাবারে বানালাম বেসন কা চিলা উইথ ট্যামারিন্ড সস – সবাই চেটে পুটে খেল!" দেখা যাবে হয়ত আদপে বাড়ির পোষা কুকুরটাও এক টুকরো মুখেই তোলেনি।

তবে সোশ্যাল মিডিয়া না থাকলে আমরা বাঙালিরা এত কম সময় এরকম এগিয়ে যেতে পারতাম না, এ এক্কেবারে #হনুমানগোয়িংলঙ্কা গোছের লাফ! অনেক ঘিলু খরচ করে বিশ্ববাংলার যে ব্র্যান্ড আজ তুলে ধরা হয়েছে তা মোটেও অমূলক নয়, ওই 'ব' লেখা গোলকটা এমনি এমনি শহরের এখানে সেখানে ঘুরছে না। সারদা থেকে এঞ্জেল, এমপিএস থেকে রোজ ভ্যালি পুরো বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে বাংলা চাইলে কিভাবে চুল্লু খাওয়া হাবু ও সেন্টুরাও দিনে দুপুরে পা তুলে বসে নামী দামী পাঁচতারায় কনিয়াকের বোতল একের পর এক উড়িয়ে দিতে পারে। দেখিয়ে দিয়েছে ভর দুপুরে বিভিন্ন সিন্ডিকেট কিরকম নির্ভিক সৈনিকের মতন পুলিশের ওপর গুলি চালাতে পারে। এসব উন্নয়ন তো সোশ্যাল মিডিয়ার চোখে পড়ে না। সুধু পড়ে ডানকান চা বাগানে শ্রমিকের না খেয়ে আর বন্ধ হয়ে যাওয়া জুট মিলের মজুরের আত্মহত্যা করে মরার খবর। যে যাই বলুক আমি জানি এই নানা বাধা অতিক্রম করে আমরা বিশ্ববাঙালিরা শত্রুর নানা চক্রান্তে ছাই ঢেলে দেব। এই দুর্জয় ঘাঁটিতে দেখবেন আমরা ঠিক একদিন আলতো করে স্টোভের পিনের মুখে লাগা সরু তারের মতো স্যাট করে গলে বেরিয়ে যাব।

মেরি ক্রিসমাস

রুদ্র রোদ্দুর

ডিসেম্বর ২৬, ২০১৫

বড় ছোট না, এমনি আরেকটা দিন। স্মৃতিমেদুর হওয়ার সুযোগ যে এই দিন নিয়ে জীবনে অনেক, এমনও নয়; বস্তুত এই দিনটা মাঝে বহুদিন তেমনভাবে খেয়ালই করা হয়নি শুভ'র। তবে আজ বুঝি সমাপ্তি ঘটবে এই একঘেয়েমির। সত্যি শুভ চায় আজকের দিনটা যেন হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড়, সময়কালের গণ্ডি অতিক্রম করে এই সন্ধ্যাতেই ডুবে থাকুক সে ও অন্তরা। ছোট ছোট ধাপে শুরু হয়ে আজ পালা একটা বড় পদক্ষেপের। যিশুবাবা পার করেগা বলে মারের সাগর পাড়ি দিয়েই ফেলল শুভ।

মেট্রো থেকে নেমে এশিয়াটিক সোসাইটি পেরিয়ে যেতে যেতে যেন এক অচেনা জায়গায় পা ফেলবার উপক্রম। ক্রিসমাস কার্নিভালে তার এই প্রথম আসা, অবশ্য উপলক্ষ অন্য। খ্রিশ্চান স্কুলে পড়াশোনা করেছে ১২ ক্লাস অবধি, তবে বাড়তি কোন উৎসাহ নেই এই অনুষ্ঠানটির ব্যাপারে। আর বাজারের দ্বারা চালিত হওয়া বা আনন্দজোয়ারে ভেসে যাওয়া, কোন কিছুতেই তেমন রুচি নেই তার। সে ঘরকুনো বাঙালি, কালী থেকে কার্নিভাল সব কিছুকেই দূর থেকে নিরীক্ষণ করাকেই শ্রেয় বলে মনে করে এসেছে এতকালের একাকিত্বের জীবনে। তাই ঈষৎ উত্তেজনা এবং অনুকম্পার মাঝেই হেঁটে চলেছে ম্যাগ্নোলিয়া ছাড়িয়ে, অজস্র ভিড়ের মাঝে প্রিয় দুটি চোখ খুঁজে নিতে। খুব ছোট বয়সে বাবা মায়ের হাত ধরে চার্চে যাওয়ার সঙ্গে অবশ্য প্রচুর তফাৎ, তখন প্রতিটা পদক্ষেপেই ছিল প্রত্যয়, নিবিড় আশ্রয়ের মধ্যে থাকার কারণেই।

প্রায় তিনমাস হতে চলল, আলাপ নেহাতই কাকতালীয় ভাবে ফেসবুকের একটি সাহিত্যের গ্রুপে আনন্দমেলার আলাপচারিতায়। তারপর অতীতের সরণী বেয়ে কখনো কাকাবাবু, কখনো মিতিনমাসির হাত ধরে সমুদ্রসৈকতে শিহরিত বা পাহাড়চূড়ায় আতঙ্কিত হওয়া। সাহিত্যরস গ্রহণ হিসাবে হয়তো তেমন বুদ্ধিজীবি শ্রেণীতে পড়ার দাবী করতে পারে না তারা, কিন্তু হৃদয়রসের দিক দিয়ে সেই শূন্যতা ভরাট করে দিয়েছিল তাদের ঐকান্তিক আবেগ। সাহিত্য থেকে গান, সিনেমা, ছবি দেওয়া নেওয়া - কারণ ছাড়াই এরপর কেটে যেতে থাকতো সময়। নিজের অজান্তেই কত স্বপ্নজাল বুনে ফেলা, প্রশ্রয়হীন এমনও বলা চলে না।

চারিদিকে অজস্র টুপির মাঝে তিন চারবার ফিরে এলো শুভ, ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়ছে সে। ক্যারম টুর্নামেন্টে পাড়ার নাম ডুবিয়ে সেই কল্যাণী থেকে হাজির হয়েছে আজ সে কত আশা নিয়ে, সত্যি বোধহয় ভুল করল শুভ। অনলাইন ফ্রেন্ডশিপ কেবল ওই অবাস্তবের দুনিয়াতেই রাখা উচিৎ সীমাবদ্ধ - কত পোড়খাওয়া দাদা, বন্ধুদের মুখে শুনে এসেছে চিরকাল। কিন্তু সে তো অন্তরাকে অন্যরকম ভেবেছিল। হ্যাঁ খুব বেশি কিছু নিজেদের বিষয়ে কেউই জানেনা তারা। এবং অজানাই রাখতে চেয়েছিল শুধু এই দিনটার জন্য দুজনেই। ফোন নাম্বার না, কোন কিছুই না, আজ মনে হচ্ছে

সব ভুল। তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া তার স্বভাববিরুদ্ধ, তবু আজ ব্লক বাটনটা টিপতে হাত কাঁপল না শুভ। ফিরে চলল তিন মাসের স্মৃতিটা ভিড়ের মাঝে ফেলে রেখে দিয়ে। তখন অন্তরা ক্রিসমাসের কেকের অর্ডার ঘরে ঘরে পৌঁছতে ব্যস্ত, মা'কে হাসপাতালে ভর্তি করে এসে। টাকাগুলো জোগাড় করে জমা দিতে হবে শীঘ্র, ডাক্তারের কড়া নির্দেশ অপরেশন আজকেই হওয়া চাই।

যেন ব্যঙ্গ করেই বেজে চলেছে পিছনে "উই উইশ ইউ আ মেরি ক্রিসমাস, অ্যান্ড আ হ্যাপি নিউ ইয়ার"।

হিন্দুত্ব, গো-মাতা, রাজপাট ও বাঙালী

কল্পতরু

জুলাই ২৫, ২০১৬

আজকাল ফেসবুক, খবরের কাগজ খুললেই নজরে একটা জিনিস বারংবার আসে। গরু। দাদরির গো-নিধন তথা মহম্মদ আকলাখের হত্যার পর থেকেই আকাশে বাতাসে শুধু ভেসে বেড়াচ্ছে গো-মাতার গোপাল ছেলদের জয়ধ্বনি। আর তার সাথে সাম্প্রতিক সংযোজন উনার দলিতদের গো-চর্ম স্খলনের অভিযোগে তাদের মেরে 'পিঠের চামড়া তুলে দেওয়া'র মতো ঘটনা। আর অনবরত এই চেষ্টা চলছে কিভাবে গো-মাতাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়! কিংবা গো-মাতার দিকে যদি কেউ লালায়িত দৃষ্টিতে দেখে কীভাবে তার লালাগ্রন্থি ছিঁড়ে ফেলা যায়!

গো মাতার সুযোগ্য সন্তানেরা কোন সাহসে, কার মদতে এমন অবলীলায় মানুষ মারতে পারে তা না হয় বুঝতে বাকি কারো নেই। কিন্তু কোন যুক্তিতে, কোন বিধানে গো-হত্যা বন্ধ করতে আগ্রাসী হয়, গো-মাংস ভক্ষণে বিরোধিতা করে তা অনুধাবন করতে পারলাম না। সত্যিই আমি নিষ্পারগ! ইতিহাসকে তাই আশ্রয় নিলাম, যদি এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা হয়।

ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে অবশ্য পেলাম আলাদা কথা। সেসব নিয়ে নয় আলোচনা কিঞ্চিৎ পরে করা যাবে, এখন খানিক দেখা যাক আর্যদের গরুর প্রতি আকর্ষণ কেন হল?

মধ্য এশিয়া থেকে আগত আর্যরা ছিল মূলত যাযাবর। এখন যেমন আমরা যাযাবর দেখি যারা সময়ে সময়ে স্থান পরিবর্তন করে, কিন্তু কৃষিকাজ জানে না। পশুপালনের উপরই মূলত নির্ভর করে এদের জীবন-জীবীকা নির্বাহ করে। আর্যদের ক্ষেত্রে অবশ্য এরকমটা হবে কিনা বলা যায় না। সেক্ষেত্রে অনেক মতবিরোধ আছে। ভারতবর্ষে আসার আগে আর্যরা কৃষিকাজ করত কি না তা স্পষ্ট নয়। তবে ভারতবর্ষে বসবাসের পর আর্যরা যে কৃষিকাজ শিখেছিল তা জানতে পারা যায় ঋগ্বেদে বলদ ও লাঙলের উল্লেখ থাকায়। তবে সে কৃষিকর্মের দ্বারা আদৌ খাদ্যশস্য উৎপাদন হত কি না তা নিয়ে সংশয় আছে। যব (বারলি), ব্রিহী(ধান) ও গোধূম (গম)-এর উল্লেখ বহুলাংশে রয়েছে পরবর্তী বেদে, ঋগ্বেদে নয়। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে ঋগ্বৈদিক যুগে আর্যরা কৃষিকাজে অত দক্ষ ছিল না। তবে ড. রাম শরন শর্মার মতে এরা বোধ হয় কৃষিকাজ শিখেছিল অনার্যদের (non-Aryan) কাছ থেকেই। তাদের কৃষিকাজের মধ্যে প্রধান উৎপন্ন ফসল ছিল গবাদিপশুর খাদ্য (fodder crops)। ঋগ্বেদে 'লাঙল' শব্দটিকে অনেক বিশেষজ্ঞই আবার interpolation বা পরবর্তী সংযোজন বলে মনে করেন। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়াও যায় যে আর্যরা কৃষিকার্য ব্যাপকহারে জানত তবুও তাদের জীবনযাত্রায় গরুর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ঋগ্বেদে 'গাভিষ্ঠি' যজ্ঞের কথা উল্লেখ করা আছে। গাভিষ্ঠি আর কিছু না গরুর অনুসন্ধান। তা গরুর অনুসন্ধান কিভাবে হত? মূলত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মাধ্যমে গরুর অনুসন্ধান হত। অর্থাৎ এক গোষ্ঠীর সাথে আরেক গোষ্ঠীর যুদ্ধ হত, লড়াই হত আর বিজয়ী গোষ্ঠী বিজিত গোষ্ঠীর গরু ছিনিয়ে নিত। সুতরাং এইসব ঘটনা থেকে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় ঋগ্বৈদিক যুগে গরুই ছিল সর্বমূল্যবান। এমনকি সেযুগে জায়গা-সম্পত্তির প্রতি বিশেষ কারোর ন্যাক ছিল না। বিভিন্ন দানসূচক অনুষ্ঠানে মানুষ দানস্বরূও গরু, নারী ও কৃতদাস গ্রহন করত। জায়গা সম্পত্তি নয়।[১]

এখন যদি একটু গভীরে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করি তবে বোঝা যায় আর্যরা গরুকে ঠিক কেন এত মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতে লাগল গরু থেকে সহজেই দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য পাওয়া যেত। গরুর বিষ্ঠা জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা যেত। সুতরাং কৃষিকার্যে অপটু আর্য সন্তানদের কাছে গো-মাতার উপর নির্ভরশীলতাই ছিল প্রধান উপায়।

আধুনিক বিজ্ঞানও কিন্তু বলে, শুধু মাত্র গরুর দুধ খেয়েই একটা মানুষ সারাটা জীবন সম্পূর্ণ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে। সুতরাং আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না আর্যরা কেন গরুকে এত প্রাধান্য দিল।

তবে প্রাধান্য দেওয়া আর ভগবানস্বরূপ উচ্চাসনে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা, দুটো অন্যরকম জিনিস। কিন্তু আর্যরা তো এমনই। তারা প্রকৃতির পূজারী, প্রয়োজনের পূজারী। যা কিছু তাদের ভাল লাগে বা ভয়ের উদ্রেক করে, যা কিছু তাদের প্রয়োজনীয় তাদের সবকিছুকেই ঐশ্বরিক মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গরুও তার ব্যতিক্রম নয়।

তবে কি সত্যিই গো হত্যা অপরাধ? সত্যিই কি গোরু ভগবতী? দেখা যাক ঋগ্বেদসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ কি বলছে?

ঋগ্বেদে গোরুর (নাকি গাভীর?) উল্লেখ ১৬ বার আছে। ঋগ্বেদে তাকে বলা হত অঘ্ন্যা- অর্থাৎ যাকে হত্যা করা যাবে না। আর ছিল অহি - অর্থাৎ যার গলা কাটা যাবে না (সম্ভবত)। সুতরাং উপরোক্ত শব্দদুটি থেকে একটা ধারণা করে নেওয়া যায় যে ঋগ্বেদে দুগ্ধবতী গাভীর একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল।

কিন্তু উল্টোদিকটাও তো দেখুন, ঋগ্বেদে অজস্র শ্লোকগুলিতে গো ও বলদ হত্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বহু যজ্ঞে তা ইন্দ্র, মরুৎ আদিকে অর্ঘ্যস্বরূপ দান করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ড. আম্বেদকরের যুক্তি ও তাঁর রচনা ও বক্তব্যের কিয়দংশ এখানে বাংলা তর্জমা তুলে ধরলাম। প্রশ্নের ছলেই তিনি কিছু সমস্যার সমাধা করেছেন।

প্রমাণ কি..... যে হিন্দুরা কখনো গো মাংস খায়নি এবং গো হত্যার প্রতিবাদ করত?

উপরের ইটালিক্স অংশটি আবার পড়ুন এবং তার সাথে নিচের অংশটুকুও পড়ুন।

গরুর এই প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সত্ত্বেও আর্যরা তাদের খাদ্যের তাগিদে গো নিধন বন্ধ করেনি।

শতপথ ব্রাহ্মণ ও আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রের সংশা ছিল অবাধ গো-হত্যা বন্ধ করার প্রতি মিনতি বা পরামর্শ। গো হত্যার প্রতি কোনো নিষেধাজ্ঞা বা প্রতিবন্ধকতা নয়। [অর্থাৎ আপাতভাবে উপরোক্ত দুই গ্রন্থে গো হত্যা বিরোধী বক্তব্য রইলেও বাবাসাহেব বলতে চেয়েছেন তা একপ্রকার অনুরোধ মাত্র, কোনো বাধ্যবাধকতা নয়।]

অব্রাহ্মণরা তবে কেন গো-মাংস ভক্ষণ বন্ধ করল?

তাদের ইচ্ছা ছিল ব্রাহ্মণদের অনুকরন করার।

কিন্তু ব্রাহ্মণরা কেন গো-মাংস ভক্ষণ বন্ধ করল?

এটা ছিল ব্রাহ্মণদের পরিকল্পনা। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে একপ্রকার সংগ্রামের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম তাই বৌদ্ধধর্মের ওপর নিজের আধিপত্য বা প্রভুত্ব বিস্তারের জন্যই এমনটা ঘটিয়েছিল। [অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ- দুই ধর্মই গো-হত্যার বিরোধী ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণরা গরুকে ঈশ্বরের স্থান দিল। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্ম ছিল নিরীশ্বরবাদী। সুতরাং জয়ডংকা ব্রাহ্মণদেরই বাজল।] তাই গো মাংসকে অপবিত্র ঘোষনা করা হয়। আর যারা দরিদ্র, নিপীড়িত তারা তখনও গো মাংস ভক্ষণ করত..... আর সমাজের চোখে হল অপরাধী। তারাই পরবর্তীকালে হল অচ্ছুৎ, অস্পৃশ্য।[২]

ঐতিহাসিক এ.এল.বাসমের মতানুযায়ী যদিও বৈদিক যুগে গো-হত্যার বিরুদ্ধে কিছু অভিমত বর্তমান কিন্তু অশোকের জামানায় পুরোদস্তর গো-হত্যা হত। গো হত্যা বিষয়ে কোনো প্রতিবন্ধকতা সে সময় ছিল না। তাঁর আমলে গো মাংস ও বলদ মাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হত।[৩]

মহাদেব চক্রবর্তী অবশ্য আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন – তাঁর মতে গো মাংস ভক্ষণ বৈদিক ভারতীয়দের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিল। শুধুমাত্র যজ্ঞের আহুতির জন্যই নয়, খাদ্য হিসেবেও গেরস্থালীতে ষাঁড়ের [(?) bovine species] অবাধ হত্যা করা হত।

সংস্কৃত শব্দে 'ভাস' শব্দটি নির্বীজ গরু বা ভ্যাঁয়স ব্যবহৃত হত যজ্ঞে আহুতি দেবার জন্য। তবে দুগ্ধবতী গাভীর হত্যা নিষিদ্ধ ছিল। এছাড়াও চরক সংহিতায় গর্ভবতী মহিলাদের জন্য গোমাংস ভক্ষণের পরামর্শ দেওয়ার কথা উল্লিখিত আছে।[৪]

এতো গেল সাধারণ মনিষ্যির কথা। এবার ঋষি-মনিষীর কথায় আসা যাক। দেখা যাক রামায়ণ-মহাভারত কি বলে।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নাম আশা করি শুনেছেন। ভদ্রলোক নাকি নরম গো-মাংস (tender flesh) খেতেন।

এছাড়াও তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ, গৃহসূত্র ও ধর্মসূত্রেও গো মাংস ভক্ষণের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

পরিশেষে আসা যাক ডি.এন. ঝা-র কথায়। তাঁরই ভাষায় তুলে ধরলাম বাকিটা -

The ceremonial welcome of guests (sometime known as Arghya-অর্ঘ্য but generally as Madhuparka- মধুপর্ক) consisted.... of flesh blood of a cow or bull... [At] the sacred thread ceremony (উপনয়ন).... it was necessary for a snataka (স্নাতক) to wear upper garment of cowhide.[৫]

তিনি আরও লিখেছেন – *The Mahabharata makes a laudatory reference to the King Rantideva, in whose kitchen two thousand cows (ভেবে দেখুন!) were butchered each day.*

The Ramayana of Valmiki also makes frequent references to the killing of animals including the cow for sacrifice and for food. [৫]

হিন্দুত্ব, গোমাতা, রাজপাট ও বাঙালী নিয়ে এ বক্তব্য ক্রমশ প্রকাশিতব্য। তুল্যমূল্য বিচার হবে, আলাপ আলোচনা হবে। তবে সেসব কিছুর আগে যাজ্ঞবল্ক্যের জবানীই বলতে চাই – "আমি ততদিন মাংস খাব (গো ও বলদ) যতদিন তা সুস্বাদু থাকবে।

সৌজন্য:-

[১] India's Ancient Past – R. S. Sharma
[২] The Untouchables: Who were they and why they become untouchables? Writings and Speeches, 1948 – Dr. B. R. Ambedkar
[৩] The Wonder that was India – A. L. Basham
[৪] Beef-Eating in Ancient India – Mahadev Chakravarti, 1979
[৫] The Myth of Holy Cow – D. N. Jha, 2002
[৬] The Indian Express
[৭] The Hindu
[৮] wikipedia

দ্রৌপদী ধৃতরাষ্ট্র সংবাদ

অতনু

মে ৭, ২০১৬

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তখন চলছে। যুযুধান দুপক্ষই রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানায় যাওয়ার তোড়জোড় করছে। এমন সময়ে কৌরবপক্ষের দূত এসে হাজির হল পাণ্ডবশিবিরে। যুধিষ্ঠির নয়, সে এসেছে দ্রৌপদীর কাছে। ধৃতরাষ্ট্র জরুরী তলব করেছেন দ্রৌপদীকে। তখনকার দিনে সূর্য ডুবলেই যুদ্ধ থেমে যেত। তারপর এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে যাতায়াতে কোন বাধা ছিল না। তবু দ্রৌপদী খুব ডাকাবুকো মহিলা না হলে এত রাতে জনমানবহীন কুরুক্ষেত্রের মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সাহস দেখাতেন না। অবশ্য কাকেই বা সঙ্গে নেবেন। যুধিষ্ঠির লুডো খেলায় ব্যস্ত। অর্জুনের ঘরে টোকা মারাটা ঠিক হবে না, রোজই যুদ্ধের পর নতুন নতুন সঙ্গিনীকে নিয়ে তিনি ব্যস্ত থাকেন। ভীমকে ডাকলেই যাবেন। কিন্তু কৃষ্ণ ওঁকে গুড়জলের নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন, সবসময় টং হয়ে থাকেন। ধৃতরাষ্ট্রের কোন কথায় খেপে গিয়ে হয়ত গদার এক বাড়িই বসিয়ে দিলেন। সে আরেক ঝঞ্ঝাট। বাকি রইল নকুল আর সহদেব। ওদের তো স্বামীর চাইতে ছোট ভাই বলেই মনে হয়। মরুকগে যাক, সঙ্গে নিয়েই বা কি হবে, হস্তিনাপুরের রাজসভায় দুঃশাসন যখন কাপড় খুলছিল তখন এরা কে কি করেছিল! তখন তো একজনই পাশে দাঁড়িয়েছিল! দ্রৌপদী একবার ভেবেছিলেন সেই বন্ধু কৃষ্ণকেই ডাকবেন। কিন্তু বেচারা সারাদিন অর্জুনের রথ চালিয়ে ক্লান্ত। তাছাড়া কদিন ধরে কৃষ্ণকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছে। ঐ গুড়জলের নেশাটাই যত নষ্টের গোড়া!

দ্রৌপদী অবশ্য এত কথা ভাবতে ভাবতে একাই বেরিয়ে পড়েছিলেন আর গুটি গুটি পায়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আসলে একা যাওয়ার চেয়েও ধৃতরাষ্ট্র কি বলবেন সেটা নিয়েই দ্রৌপদী একটু চিন্তিত ছিলেন। যাই হোক ডেকেছেন যখন যেতেই হবে। ধৃতরাষ্ট্রের ঘরে ঢুকে দেখলেন বিদুরও রয়েছেন। দুজনেই সম্পর্কে দ্রৌপদীর শ্বশুর। তাই নিয়মমত মাথায় ঘোমটা দেওয়া উচিৎ। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র দেখতে পান না আর দাসীপুত্র বিদুরকে উনি ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। তাই ঘোমটা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন না। তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা বিশুদ্ধ সংস্কৃততেই হয়েছিল। কিন্তু পাপিষ্ঠ অ্যান্টি ন্যাশনালরা সংস্কৃত বুঝবে না বলে পুরোটা বাংলায় অনুবাদ করে দিলাম।

ধৃতরাষ্ট্রঃ এসো বৌমা, বস। পায়ের আওয়াজ থেকে মনে হচ্ছে তুমি একাই এসেছ?

দ্রৌপদীঃ হ্যাঁ জ্যাঠামশাই। সবাই তো যুদ্ধ করে ক্লান্ত। তাই একাই এলাম।

ধৃতরাষ্ট্রঃ আচ্ছা। তোমায় ডেকেছিলাম যেজন্য বলি। তুমি না কি গতকাল রাত্রে মথুরায় গিয়েছিলে? কি ব্যাপার বলত? তোমার পঞ্চস্বামী যখন যুদ্ধে ব্যস্ত তুমি তখন মথুরায় কি করছিলে? কিছু মনে কোরো না বৌমা, পাণ্ডু নেই। আমিই

তো এখন তোমাদের অবিভাবক, সে যতই আমার ছেলেদের সঙ্গে যুদ্ধ কর না কেন! হায় রে আমার ভাইটা অকালেই চলে গেল গো!

এই বলেই ধৃতরাষ্ট্রের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। ভাগ্যিস বিদুর একটা বড় দেখে রুমাল এগিয়ে দিলেন নয়ত ধৃতরাষ্ট্রের দামী পোষাক ভিজে যেত।

দ্রৌপদীঃ না জ্যাঠামশাই মনে করব কেন। আচ্ছা একটা কথা বলুন তো আমি যে মথুরায় গিয়েছিলাম তা নিশ্চয়ই সঞ্জয়ের কাছে শুনেছেন। তাহলে ওখানে কি হয়েছিল তাও তো আপনি জানেন?

ধৃতরাষ্ট্রঃ না তা জানিনা। কি জানো বৌমা, সঞ্জয় মথুরায় অনেক গুলো স্পাই ক্যামেরা বসিয়েছিল, কিন্তু পাজি যাদবগুলো কি সব কলকাঠি নেড়ে পুরো নেটওয়ার্ক অকেজো করে দিয়েছে। সঞ্জয় খালি এটুকু জানিয়েছে তুমি এক দঙ্গল নোংরা বাঁদরকে নিয়ে মথুরার দিকে গেছ। ব্যাপারটা একটু খুলে বল তো দেখি?

দ্রৌপদীঃ আচ্ছা বলি শুনুন। আপনি বোধহয় শোনেননি রামচন্দ্র সম্প্রতি টাইম মেশিনে চেপে দ্বাপর যুগে এসে পৌঁছেছেন। সঙ্গে তাঁর অনুগত বাঁদররাও এসেছে। তা বাঁদরদের গতকাল হঠাৎ বায়োস্কোপ দেখার শখ হয়। রামচন্দ্র জড়িবুটি নিয়ে ব্যাবসা খুলবেন, সেই নিয়ে ব্যস্ত। তাই জাম্বুবান সবাই কে সঙ্গে করে বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল।

এই সময় বিদুর ইন্টারাপ্ট করলেন।

বিদুরঃ আচ্ছা মা একটা কথা বলো তো। কি এমন বায়োস্কোপ যা দেখার জন্য বাঁদররা মথুরা ছুটে গেছিল? মথুরা কেন অন্য কোথাও কি দেখা যেত না?

দ্রৌপদীঃ কেন যে মথুরায় গেল তা আমিও ঠিক বুঝিনি। তবে বায়োস্কোপটার নাম ছিল "বুদ্ধ ইন এ ট্রাফিক জ্যাম"...

ধৃতরাষ্ট্রঃ (নাক কুঁচকে) বুদ্ধ!! সেই কুলাঙ্গারটা!!

দ্রৌপদীঃ কুলাঙ্গার??

ধৃতরাষ্ট্রঃ কুলাঙ্গারই তো। যে রাজসিংহাসন ছেড়ে তপস্যা করতে যায় সে কুলাঙ্গার ছাড়া কি? অথচ এমনই গ্রহের ফের ও ব্যাটাকেও এখন অবতার মানতে হচ্ছে! যাকগে, তা বুদ্ধ আবার কোথায় ট্রাফিক জ্যামে পড়ল?

বিদুরঃ হুমম এই বায়োস্কোপটার কথা শুনেছি। বুদ্ধদেব একবার ঘোড়ায় চেপে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন জঙ্গলের রাক্ষসদের একটা শোভাযাত্রা চলছিল। তাতেই না কি বুদ্ধদেবের রাস্তায় জ্যাম হয়ে গেছিল। রাক্ষসরা খুবই আপত্তি করছে এই বায়োস্কোপটা নিয়ে। ওদের নাকি খারাপ করে দেখানো হয়েছে!

দ্রৌপদীঃ হ্যাঁ জেঠু। এই রাক্ষসদের একটা দল এখন মথুরায় ঘাঁটি গেড়েছে। শুধু রাক্ষসরা নয়, মা দুর্গা যে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন তার ভক্ত অসুররাও না কি মথুরায় লুকিয়ে আছে। যাদবদের সঙ্গে মিলে ওরা দুর্গাপুজোর সময় মহিষাসুর স্মরণ উৎসব পালন করে!

ধৃতরাষ্ট্রঃ কি বলছ গো বৌমা! বিদুর, এসিটা কাজ করছে তো? এত গরম হচ্ছে কেন বলত!

দ্রৌপদীঃ যা বলছিলাম জ্যাঠামশাই, বাঁদরদের দেখে যাদব, রাক্ষস আর অসুররা চটে যায়। ওরা জাম্বুবানকে কালো পতাকাও দেখায়। তারপর ওরা আবার অন্য একটা বায়োস্কোপ চালায়। সেটার নাম "কিস্কিন্ধা বাকি হ্যায়"। ঐ বায়োস্কোপটায় শ্রীরামচন্দ্রকে কুৎসিৎভাবে অবমাননা করা হয়েছিল।

বিদুরঃ এটাও আমি দেখেছি। বালী আর সুগ্রীবের যুদ্ধের সময় রামচন্দ্র কিভাবে বালীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলেন সেই নিয়েই ছবি।

ধৃতরাষ্ট্রঃ বিদুর, তোমার কি আর কাজ নেই না কি বলত? এইসব বাজে বায়োস্কোপ দেখে বেড়াচ্ছ? প্রেম আর যুদ্ধে অন্যায় বলে কিছু হয় না জানবে। আর যা-ই হোক না কেন আমাদের শ্রীরামচন্দ্রকে এভাবে অপমান করান ছি!

দ্রৌপদীঃ শুধু কি তাই যাদবগুলো বলছিল, বুদ্ধদেবের ঘোড়া শক্তিমানকে না কি রামচন্দ্রের ভাই লক্ষণই তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলেছে। এতেই বাঁদরদের রামানুভূতি ভীষণ ভাবে আহত হয়। রামচন্দ্রের মর্যাদা রক্ষার্থে ওরা যাদবদের উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে।

বিদুরঃ শুনছি না কি যাদবরা মথুরার কোতোয়ালিতে নালিশ করেছে, বাঁদররা ওদের মেয়েদের শ্লীলতাহানি করেছে?

দ্রৌপদীঃ আপনি তো যাদব মেয়েগুলোর মুখের ভাষা শোনেন নি জেঠু, তাই ওকথা বলছেন। ঐ বেহায়া মেয়েগুলোর শ্লীলতা আছে না কি যে হানি করবে? তাছাড়া বাঁদররা রামচন্দ্রের সঙ্গে খুব টাইম মেশিনে চড়ে তো! কলিযুগে সিনেমা দেখতে গিয়ে অন্ধকার হলের মধ্যে ওরা খুব মেয়েদের টেপাটিপি করে। তাই একটু অভ্যেস হয়ে গেছে। জ্যাঠামশাই আপনিই বলুন, বুক টেপা মানেই কি শ্লীলতাহানি?

দ্রৌপদীর কথা শুনে দুই বৃদ্ধই অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা নেই, চোখে দেখতে পান না। বিদুর মাটির দিকে দেখলেন। গান্ধারী আড়াল থেকে সব শুনছিলেন। এসব শুনেই চোখের ফেট্টিটা খুলে কানে বেঁধে নিলেন। দ্রৌপদীর অবশ্য ভাবান্তর নেই। তিনি বলে গেলেন ...

দ্রৌপদীঃ আর এতই শয়তান যাদবগুলো, সঙ্গে রাক্ষস আর অসুরগুলোও ছিলো, তেড়ে এসে চারটে বাঁদরকে আটকে রাখে। বাকিরা পালিয়ে আসতে পেরেছিল।

ধৃতরাষ্ট্রঃ তুমি তখন কোথায় ছিলে?

দ্রৌপদীঃ আমি তো পাণ্ডবশিবিরেই ছিলাম। নকুল ... না না সহদেবের সঙ্গে ছিলাম ...

ধৃতরাষ্ট্রঃ আহ!! কার সঙ্গে ছিলে জানতে চাইনি। তারপর কি হল বল?

দ্রৌপদীঃ সেটাই তো বলছি। জাম্বুবান আমায় বার্তা পাঠালেন। পাণ্ডব-কৌরবরা তো যুদ্ধে ব্যস্ত, তাই আমাকেই ডাকলেন। আমি বাঁদরদের নিয়ে মথুরার দ্বারপ্রান্তে অবস্থান শুরু করলাম। ব্যাটারা দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। অবশ্য ঐ টুকু পাঁচিল টপকে যাওয়া বাঁদরদের কাছে কোন ব্যাপার ছিল না কি?! কিন্তু ওরা ভয়েই আর ভেতরে ঢোকেনি। শেষ পর্যন্ত ঐ চার বাঁদরকে যাদবরা কোতোয়ালির পেয়েদাদের হাতে তুলে দেয়। পেয়াদারা ওদের নিয়ে বাইরে আসতেই আমরা রামচন্দ্রের নাম করে ওদের ছাড়িয়ে নিই।

বিদুরঃ কিন্তু তুমি এত বড় এক রাজবংশের বধূ হয়ে কয়েকটা লম্পট বাঁদরের জন্য লড়তে গেলে? এটা কি তোমার সম্মানের উপযুক্ত কাজ হল?

দ্রৌপদীঃ সম্মান!! সেবার যখন রাজসভায় আমার কাপড় খোলা হচ্ছিল আপনারা কোথায় ছিলেন? তাছাড়া মা দুর্গাও তো একই কাজ করেছেন। সেবার বাবা ভোলানাথের ভূতগুলো গুণ্ডামি করছিল বলে ভবানীপুর কোতোয়ালিতে ধরে রাখা হয়েছিল। মা দুর্গা নিজে কোতোয়ালিতে গিয়ে ওদের ছাড়িয়ে আনেন নি?

ধৃতরাষ্ট্রঃ মা দুর্গার ঐ স্যাঙাৎ গুলোর কথা আর বোলো না। নারদ ওদের কাঞ্চণমূল্য ঘুষ দিয়ে তার আবার ছবি তুলে এনেছে। আর ইন্দ্র অমনি একটা নীতি কমিটি না কি বানিয়ে আমায় সভাপতি করে দিয়েছে। আমি তো চোখেই দেখতে পাইনা, কি যে করব। বুড়ো বয়সে হয়েছে যত জ্বালা!

বিদুরঃ সে না হয় হল। ঐ চারটে বাঁদরের কি অবস্থা? মারধোর খায়নি তো?

দ্রৌপদীঃ হতচ্ছাড়া যাদব মেয়েগুলো কয়েকটা চড় থাপ্পড় মেরেছে। কিন্তু তার চেয়েও ওদের মানসিক আঘাতটা বেশী। বদমাসগুলো ওদেরকে বসিয়ে রেখে শ্রীরামচন্দ্রের নিন্দামন্দ করেছে। ওদের হেঁশেলে না কি মা ভগবতীকে কেটে রান্না করা হচ্ছিল, ওদেরকে অফারও করেছিল।

ধৃতরাষ্ট্রঃ ছি ছি এ কি শুনছি! এসব শোনার চেয়ে তো আত্মহত্যা করা ভালো ছিল! শ্রীরামচন্দ্রের ভুবন বিখ্যাত বাঁদরসেনা, তারাও মথুরার যাদবদের কাছে মার খেয়ে পালিয়ে এল! আবার শুনছি অসুর আর রাক্ষসরাও আছে! আমাদের কি হবে? হায় হায়!!

বিদুরঃ এখনই এত ব্যাকুল হবেন না মহারাজ। আরো বাকি আছে। একলব্যকে মনে আছে তো?

ধৃতরাষ্ট্রঃ সেই নিষাদটা তো? গুরুজি যার আঙুল কেটে নিয়েছিলেন? সে আবার কি গোলমাল করল?

বিদুরঃ গোলমাল করছিল বলেই অর্জুন ওর গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্রঃ বেশ করেছে, আপদ গেছে।

বিদুরঃ না মহারাজ। আপদ যায়নি। ঐ একলব্যের সাঙ্গোপাঙ্গোরাও আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আর এসবের পালের গোদা কে জানেন?

ধৃতরাষ্ট্রঃ কে?

বিদুরঃ কানহাইয়া।

দ্রৌপদীঃ কানহাইয়া?!! তার কি হয়েছে? সে তো অর্জুনের রথ চালাচ্ছে?

ধৃতরাষ্ট্রঃ সে কি? মথুরার যাদবদের সঙ্গে কানহাইয়ার ঝামেলা চলছে না?

বিদুরঃ সেসব মিটে গেছে। এখন যাদবরা কানহাইয়ার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। ভারতবর্ষের যত নীচ, অনার্য জাতি আছে সবাইকে নিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছে কানহাইয়া। সঙ্গে জুটেছে কিছু যবন আর ম্লেচ্ছও। মাঝখানে দুর্যোধন ওকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। পাণ্ডবরা সব জানে। ওদেরও রাগ আছে কানহাইয়ার ওপর। দ্রৌপদীর সঙ্গে ওর এত বন্ধুত্ব কেউই ওরা মেনে নিতে পারেনি। এখন কানহাইয়া আনশন করছে। শরীরের অবস্থা খারাপ, কিন্তু তেজ কমেনি। দ্রৌপদী যাতে বুঝতে না পারে সেজন্যে কেষ্ট নামে একটা লোককে কানহাইয়া সাজিয়ে অর্জুনের সারথি করে রেখেছে। লোকটার অক্সিজেন কম, ঐ জন্যে সবসময় গুড়জলের সাপ্লাই রাখতে হয়।

"হায় কানহাইয়া" বলে মূর্ছা গেলেন দ্রৌপদী। আর ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ শুরু করলেন।

ধৃতরাষ্ট্রঃ হায় রে, এ কি হল গো বিদুর! আমরা হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজা, বিচিত্রবীর্যের বংশধর, আমাদের এ কি দুর্গতি ঘনিয়ে এল। ভাই পাণ্ডু রে, তুই তো ফাঁকি দিয়ে চলে গেলি। যত জ্বালা এখন আমার।

বিদুর তাঁর রুমালটা এগিয়ে দিয়ে বললেন,

বিদুরঃ মহারাজ এখন কাঁদার সময় নয়। এক্ষুনি যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধনকে ডাকুন। এখন আর নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার সময় নেই। কানহাইয়া অ্যান্ড কোম্পানি কৌরব পাণ্ডব দুপক্ষের কাছেই বিপদ। সনাতন ভারতের ঐতিহ্য বজায় রাখতে সবাইকে এক হয়ে অভিযানে নামতে হবে। এর নাম হবে অপারেশন গ্রীন হান্ট।

এই পর্যন্ত লেখার পর গনেশের হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল। প্লাস্টিক সার্জারি করে লাগানো হাতির মুণ্ডুটা মাঝে মধ্যে আলগা হয়ে যায়। মুণ্ডুটাকে ঠিক করে নিয়ে তিনি ব্যাসদেবকে বললেন, "হাত থেকে কলম পড়ে যাওয়া অশুভ লক্ষণ। এই অংশটা মহাভারত থেকে বাদ দিতে হবে।" এই বলে আগের দুটো পাতা বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিলেন। সেটা কিভাবে আমার হাতে এল সে অবশ্য অন্য গল্প। কিন্তু এজন্যই ব্যাসদেবের মহাভারতে এই অংশটা পাবেন না।

ছাদ ও অন্যেরা

তৃতীয় পাণ্ডব

সেপ্টেম্বর ২০, ২০১৬

সকালের ছাদটা বেশ আলো ঝলমলে।

সাতটার রোদ এসে খেলা করে,

হুটোপুটি খায় হাওয়ার সাথে

পাশের বুড়ো নারকেল গাছটার

চুল টেনে মজা পায়, খেপায়, সাধ্যমতো

দুরন্ত পেছনপাকা বাচ্চা সব

কেউ খুঁজছে দেখলেই, লুকোয় গিয়ে

মেঘ পাঁচিলে, আড়ালে

বেলা বাড়লে, বয়স বাড়ে তাদের

ছাদেরও, ওদের সাথে

দুপুরের ছাদে ভেজা কাপড় শোকায়

আচারের বয়াম, বড়ি

ফেরিওয়ালার গান শুনতে শুনতে

একটু আগের গনগনে যৌবন

ঝিমিয়ে নেয় মধ্যচল্লিশে,

এ বাড়ির বড়গিন্নীর মত।

সনকা তখন পাকা চুল বাছে, বিলি কেটে দেয়

বাসি হাওয়া, যেভাবে ছাদের

বিকেলের ছাদ, অলস গল্প জোড়ে

অ্যান্টেনা গুলোর সাথে, চিলেকোঠার সাথে

পাড়ার হাঁড়ির খবর সেদ্ধ হয়

নারকেল গাছগুলো

ক্লান্ত পাতায় সব শোনে, হাওয়া ফিসফিস

সন্ধ্যে নামে সব পাড়ায়, সব ছাদে

একসাথে।

তখন শুধু গলির বাঁকে চোখ রাখা

কখন ফিরবে সবাই একে একে,

যে যার ঘরে, না হারিয়ে।

একবার হারালে,

পথ চিনে ফিরে আসা সোজা নয় অত..

তারপর বৃদ্ধ রাত

ছাদে বিছানা পাতে।

শুনশান গলির সাথে পায়ে পা ঝগড়া করে কুকুরগুলো

কানে সব আসে, হয়ত শোনে না..

কিই বা যায় আসে এখন তাতে!

এভাবেই রোজ,

রোজ বয়স বাড়ে,

কমে, আবার বাড়ে

একলা ছাদের।

কেউ কোনও কথা দেয়নি, কখনও...

বৌদ্ধধর্ম, যুক্তিবাদ ও পুনর্জন্ম

সৌমেন পাত্র

মে ২৮, ২০১৬

"There is much more to be discovered about the nature of the human mind. In particular, there is much more for us to understand about how the mind can transform itself from a mere reservoir of greed, hatred, and delusion into an instrument of wisdom and compassion. Students of the Buddha are very well placed to further our understanding on this front, but the religion of Buddhism currently stands in our way."

- Sam Harris, "Killing the Buddha", Shambhala Sun, March 2006

সূচনা : বৌদ্ধধর্ম ও যুক্তিবাদ

যুক্তিবাদের সঙ্গে ধর্মের বিরোধকে দুভাবে দেখা যায় – সাধারণভাবে ও বিশেষভাবে। সাধারণভাবে যুক্তিবাদ অনুযায়ী কোন বিষয়কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একমাত্র মাপকাঠি হল বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর রচিত যৌক্তিক বিচার, যুক্তিবাদে অন্ধবিশ্বাসের কোনও স্থান নেই। কিন্তু ধর্ম বলে, কিছু কিছু বিষয় শুধু যুক্তি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে জানা সম্ভব নয়, সেগুলি অন্ধভাবেই বিশ্বাস করতে হবে : "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর"। এই হল যুক্তিবাদের সঙ্গে ধর্মের বিরোধের সাধারণ দিক। আর বিশেষভাবে দেখতে গেলে এই বিরোধের ক্ষেত্রগুলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, প্রায় সব ধর্মে বিশ্বের স্রষ্টা ও বিশ্বনিয়ন্তা একটি অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। দ্বিতীয়ত, ধর্মগুলি মৃত্যু-পরবর্তী বিভিন্ন ধারণাকে স্বীকার করে, যেমন – স্বর্গ, নরক ও পুনর্জন্ম। এই দুটি বিষয়ের কোনটিই যুক্তিবাদীর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

বর্তমান প্রবন্ধে যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় বৌদ্ধধর্ম, তাই বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যুক্তিবাদের বিরোধের ব্যাপারটি দেখা যাক। উপরে যুক্তিবাদের সঙ্গে ধর্মের যে সাধারণ বিরোধটির কথা বলা হল, বৌদ্ধধর্মের নিজস্ব দাবি অনুযায়ী বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে সেটি খাটে না। বৌদ্ধধর্মে সাধারণভাবে অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেই মূল্য দেওয়া হয়। পালি ত্রিপিটকের কালাম সুত্তে বুদ্ধ মৌখিক পরম্পরা, জনশ্রুতি, ধর্মগ্রন্থ বা গুরুবাক্যকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করে তবেই কোনও মতকে গ্রহণ করার উপদেশ দিয়েছেন। অন্যত্র তিনি তাঁর নিজের বক্তব্যকেও স্বর্ণকার যেভাবে সোনাকে পুড়িয়ে যাচাই করে, সেভাবে যাচাই করতে বলেছেন। নেহাত কারও কথায় বিশ্বাস না করার এই নীতি আধুনিক বিজ্ঞানের একটি মূল ভিত্তি। রয়্যাল সোসাইটির মূলমন্ত্র হল "Nulias in verba"। ল্যাটিন বাক্যাংশটির ইংরেজি তর্জমা হল "On the words of none"। সুতরাং এদিক থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় আধুনিক বিজ্ঞানের মতোই যুক্তিবাদী! অন্তত তার নিজের দাবি তা-ই।

কিন্তু এই সাধারণ দাবি যুক্তিবাদের সঙ্গে ধর্মের বিরোধের বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে কতটা খাটে, সেটাও আমাদের দেখতে হবে। এই বিরোধের প্রথম বিশেষ ক্ষেত্র হল বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। অধিকাংশ ধর্মের প্রচারককে ঈশ্বরের দূত হিসেবে দেখানো হয়। ধর্মের বক্তব্যগুলি আসলে ঈশ্বরেরই বক্তব্য, প্রচারকরা সেগুলি মানুষের কাছে নিয়ে এসেছেন মাত্র। স্বাভাবিকভাবেই এসব ধর্মের মূল বিষয় হল ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি ও আনুগত্য। পরবর্তীতে বৌদ্ধধর্মের কোনও কোনও শাখায় বুদ্ধের উপর কিছুটা অলৌকিকতা আরোপ করা হলেও তিনি নিজেকে ঈশ্বরের দূত বা ঐরকম কিছু হিসেবে দাবি করেন নি। তিনি একজন সাধারণ মানুষ যিনি নিজের চেষ্টায় পরম জ্ঞান লাভ করেছেন। অন্য যেকোন মানুষ চেষ্টা করলে তাঁর মতো ওই জ্ঞান লাভ করতে পারে। তাঁর প্রচারিত ধর্মও তাই ঈশ্বরপ্রেরিত (revealed) নয় এবং এই ধর্মে ঈশ্বরের ধারণারও কোনও স্থান নেই। বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করার জন্য এক সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করার একেবারেই কোনও প্রয়োজন নেই। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম যুক্তিবাদী এই সাধারণ দাবি ঈশ্বরবিশ্বাসের ক্ষেত্রে খাটে, একথা মোটের উপর বলা যায়।

এবার যুক্তিবাদের সঙ্গে ধর্মের বিরোধের দ্বিতীয় বিশেষ ক্ষেত্রটিতে আসা যাক : মৃত্যু-পরবর্তী জগতে বিশ্বাস। দুঃখের বিষয়, এক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের যুক্তিবাদী হওয়ার দাবি আর খাটে না। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন, মানুষেরা তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুসারে মৃত্যুর পর নতুন জন্ম লাভ করে। নতুন জন্ম যে মানবজন্মই হবে, তার কোনও মানে নেই। কর্মের উপর নির্ভর করে মানুষ ইতর প্রাণী হয়েও জন্মাতে পারে, আবার স্বর্গের দেবতা, নরকের জীব, অসুর কিংবা প্রেত হয়েও জন্মাতে পারে! এই কর্ম ও পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি বা নির্বাণই হল বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য।

তাহলে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আমরা একটা অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি দেখতে পাচ্ছি। একদিকে বৌদ্ধধর্ম দাবি করছে যে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমর্থন ছাড়া কোনকিছু বিশ্বাস করার দরকার নেই। আবার অন্যদিকে বৌদ্ধধর্ম মৃত্যুর পর পুনর্জন্মের কথা বলছে, বাস্তব অভিজ্ঞতায় যার স্পষ্টতই কোনও প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। একই ধর্মের মধ্যে এই বৈপরীত্য কেন? যে বুদ্ধ কালাম সুত্তের প্রবক্তা, তিনি পুনর্জন্মের তত্ত্ব প্রচার করতে পারেন না। আর যদি তিনি সত্যিই পুনর্জন্মের তত্ত্ব প্রচার করে থাকেন, তাহলে কালাম সুত্ত তাঁর উক্তি হতে পারে না। এই অসঙ্গতি একটা সন্দেহের জন্ম দেয় : সত্যিই বুদ্ধ মৃত্যুর পর পুনর্জন্মের কথা বলেছিলেন, নাকি পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীরা তাঁর ধর্মে এই যুক্তিহীন বিশ্বাসের প্রচলন করেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে সবার আগে বৌদ্ধধর্মের আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসটা এক নজরে দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

গৌতম বুদ্ধ থেকে আজকের বৌদ্ধধর্ম : একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

বুদ্ধের সঠিক জীবনকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। মোটামুটি ভাবে যে মতটি অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিত স্বীকার করেন সেই মত অনুসারে বুদ্ধের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ সালে এবং মৃত্যু খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ সালে। তাঁর জন্মস্থান নেপালের লুম্বিনি। ঊনত্রিশ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন। ছয় বছর অনুসন্ধানের পর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে

বোধগয়ায় তিনি পরম জ্ঞান বা বোধি লাভ করেন। এরপর সারনাথে প্রথম ধর্মপ্রচার ও ভিক্ষুসঙ্ঘ গঠন। অবশেষে পঁয়তাল্লিশ বছরের কর্মজীবনের শেষে কুশিনারায় মৃত্যু।

মৃত্যুর আগে বুদ্ধ সঙ্ঘের কোনও নেতা নির্বাচিত করে যাননি। তিনি বলেছিলেন, তাঁর উপদিষ্ট বিনয় (সঙ্ঘের নিয়মাবলী) ও ধর্মের উপর ভিত্তি করে সংঘ চলবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এখনও পর্যন্ত খ্রিস্টানদের পোপ বা মুসলিমদের খলিফার মতো বৌদ্ধধর্মের কোনও সর্বোচ্চ নেতা নেই (দলাই লামা শুধুমাত্র তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের একটি শাখার নেতা)। যেহেতু বিনয় ও ধর্মই এখন থেকে তাঁদের পথপ্রদর্শক হবে, তাই বুদ্ধের শিষ্যেরা এই দুটি বিষয় সংকলন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্যে বুদ্ধের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে রাজগিরে প্রথম বৌদ্ধ সংগীতির আয়োজন করা হয়। এখানে প্রথম বিনয় ও ধর্ম মৌখিক ভাবে সংকলিত হয়। তৎকালীন ভারতবর্ষে লিপির প্রচলন ছিল, কিন্তু তা কেবল বাণিজ্য ও প্রশাসনের কাজে ব্যবহৃত হত। পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা লেখাকে ছোট নজরে দেখতেন, লেখার চেয়ে হৃদয়ে ধারণ করাকে বেশি মর্যাদা দেওয়া হত। এই মানসিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থও দীর্ঘকাল মৌখিক ভাবে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সংবাহিত হয়। কোনও একজন ভিক্ষুর পক্ষে সম্পূর্ণ ধর্মগ্রন্থ মনে রাখা স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব ছিল না। তাই একেকজন ভিক্ষু একেকটি অংশ মনে রাখতেন এবং তিনি সেইটুকুই তাঁর শিষ্যদের শিখিয়ে দিয়ে যেতেন।

বুদ্ধ তাঁর জীবদ্দশায় মূলত তৎকালীন মগধ ও কোশল (মোটামুটি বর্তমান বিহার ও উত্তরপ্রদেশ) রাজ্যের মধ্যেই ধর্মপ্রচার করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীরা তাঁর প্রচারিত ধর্মের বাণী বহন করে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট অশোকের ধর্মান্তরের পর বৌদ্ধধর্মের বিস্তার নতুন গতি পা । কিন্তু ভিক্ষুসঙ্ঘের ভৌগোলিক বিস্তার ও ভিক্ষুর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন বিপদ দেখা দেয়। বিনয় ও ধর্মের বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে সঙ্ঘের মধ্যে মতভেদ শুরু হয়। এরকম মতভেদ সৃষ্টির একটি বিশেষ কারণ হল বৌদ্ধধর্মে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর জোর দেওয়ার প্রবণতা, যা আমরা এই প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করেছি। রাজগিরের সংগীতিতে বিনয় ও ধর্মের মূল বিষয়গুলি সংকলিত হলেও সেগুলিকে বিভিন্ন ভিক্ষু নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করতে শুরু করন। এই প্রবণতার অনিবার্য পরিণাম ছিল একটাই : বৌদ্ধ সঙ্ঘে বিভাজন।

এই বিভাজনের প্রক্রিয়া বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে চলেছিল এবং এই বিষয়ে ঐতিহাসিক সূত্রের অপর্যাপ্ততা ও অসঙ্গতির জন্য এই প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। আমরা সেসব জটিলতায় না গিয়ে যে মূল বিষয়গুলো নিয়ে সবাই মোটামুটি একমত, সেগুলোই উল্লেখ করব। বুদ্ধের মৃত্যুর আনুমানিক 140 বছর পরে সঙ্ঘ প্রথম দুভাগে বিভক্ত হয় : স্থবিরবাদ ও মহাসঙ্ঘিক। এরপর এই দুটি মূল শাখা আবার ক্রমান্বয়ে বিভক্ত হতে থাকে। এই ক্রমবিভাজন প্রক্রিয়া মোটামুটি খ্রিস্টের জন্মের সমকাল (বা কিছুক্ষেত্রে তারও পর) পর্যন্ত চলতে থাকে। এর ফলে বুদ্ধের মৃত্যুর পাঁচশো বছরের মধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। প্রচলিত বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থে এরকম আঠারোটি শাখার কথা শোনা যায়, কিন্তু এই সংখ্যাটি অনেকটাই প্রতীকী

এবং প্রকৃত সংখ্যা কিছুটা "উনিশ-বিশ" হতে পারে। স্থবিরবাদ থেকে যে শাখাগুলি সৃষ্টি হয়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সর্বাস্তিবাদী, বাতসিপুত্রীয়-সাম্মতীয়, মহীশাসক, ধর্মগুপ্তক প্রভৃতি । অন্যদিকে মহাসঙ্ঘিক থেকে সৃষ্টি হয় গোকুলিক, একব্যবহারিক, বহুশ্রুতীয় প্রভৃতি।

এইসব শাখাগুলি প্রত্যেকে তাদের নিজেদের মতো করে বিনয় ও ধর্মকে ঢেলে সাজায়। সেইসঙ্গে ধর্ম বিষয়ে নিজেদের মতকে আরও বিস্তারিত ও গভীর ভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে তারা অভিধর্ম নামে একটি নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি করে। অভিধর্মও প্রথম দিকে বিনয় ও ধর্মের মতো মৌখিক ভাবেই প্রচলিত ছিল। খ্রিস্টের জন্মের কিছু আগে-পরে (অর্থাৎ বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় পাঁচশো বছর পরে) বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখাগুলি যারযার বিনয়, ধর্ম ও অভিধর্ম লিপিবদ্ধ করে। এই তিনটি বইকে আলাদা আলাদা ঝুড়ি বা পিটকে রাখা হত বলে এদের যথাক্রমে বিনয় পিটক, সূত্র পিটক ও অভিধর্ম পিটক এবং একসঙ্গে ত্রিপিটক বলা হত।

খ্রিস্টের জন্মের সমসাময়িক কাল থেকে বৌদ্ধধর্মে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারার সৃষ্টি হয় যার নাম মহাযান। এই ধারার প্রবক্তারা বেশ কিছু নতুন সূত্র রচনা করেন যেগুলি সূত্র পিটকে নেই। এগুলি "মহাযানী সূত্র" নামে পরিচিত। নতুন সূত্রগুলির প্রামাণ্যতা দেখানোর উদ্দেশ্যে মহাযানীরা অদ্ভুত দাবি করেন। এই সূত্রগুলি নাকি স্বয়ং গৌতম বুদ্ধই বলেছিলেন কিন্তু তাঁর মানুষ শিষ্যেরা এগুলি বুঝতে না পারায় সংগ্রহ করে রাখেন নি। কিছু অলৌকিক প্রাণীর দ্বারা অলৌকিক স্থানে এগুলি এতদিন সংরক্ষিত ছিল। বলা বাহুল্য, এমন দাবির ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্যতা শূন্য। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে প্রখ্যাত দার্শনিক নাগার্জুন এই সূত্রগুলিকে দার্শনিক ভিত্তি দেন। তাঁর প্রচারিত দর্শনের নাম মাধ্যমিক বা শূন্যবাদ। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে অসঙ্গ ও বসুবন্ধু নামে আরও দুজন দার্শনিক মহাযানী সূত্রগুলির অন্য একটি দার্শনিক রূপ প্রচার করেন। এই দর্শনের নাম যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ। মহাযানী সূত্র, মাধ্যমিক ও যোগাচার – সব মিলিয়ে তৈরি হয় মহাযান বৌদ্ধধর্ম। মহাযান কিন্তু একটু আগে উল্লিখিত "আঠারোটি" শাখার মতো বৌদ্ধধর্মের কোনও নতুন শাখা নয়। মহাযানীদের কোনও স্বতন্ত্র ত্রিপিটক নেই। ওই শাখাগুলির মধ্যে কোনও কোনও শাখার একটি অংশ তাঁদের ত্রিপিটকের সঙ্গে সঙ্গে মহাযানী সূত্র ও দর্শনকেও গ্রহণ করেন। এঁরাই মহাযানী হিসেবে পরিচিত হন।

বৌদ্ধধর্মের এই অভিনব রূপটির মহাযান নামকরণের কারণ আছে। পূর্ববর্তী ভিক্ষুরা মনে করতেন, তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য নিজেদের পুনর্জন্ম রোধ করা। মহাযানীরা বললেন, এ তো সুস্পষ্ট স্বার্থপরতা। পৃথিবীর এত অজ্ঞ প্রাণী পুনর্জন্ম রোধ করতে না পেরে দুঃখ পাবে আর আমি একা নির্বাণ লাভ করব? তার চেয়ে ভালো, আমি এইসব অজ্ঞ প্রাণীদের নির্বাণ লাভে সাহায্য করার জন্য বারবার জন্মাব। এই মহত্ত্বের কারণে তাঁরা নিজেদের বললেন মহাযানী আর প্রাচীনপন্থীদের হীনযানী (যদিও বলা বাহুল্য, প্রাচীনপন্থীরা মহাযান নামটি মানলেও নিজেদের কখনোই হীনযানী নামে উল্লেখ করতেন না)।

মহাযানের প্রচলনের পর কিন্তু ভারতের সমস্ত বৌদ্ধ মহাযানী হয়ে যান নি। বরং হীনযানী বৌদ্ধদের সংখ্যাই ভারতে বরাবর বেশি ছিল। কিন্তু খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রবেশ ঘটে। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম

বজ্রযান নামে পরিচিত হয় এবং একসময় তা হীনযান ও মহাযান উভয়কেই অনেকটা গ্রাস করে ফেলে। এইসময় থেকে ভারতে বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। পুনর্জাগ্রত হিন্দুধর্ম ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মকে কোণঠাসা করে ফেলে। দশম-একাদশ শতাব্দীর পর বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় সমাজে প্রান্তিক হয়ে পড়ে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে তুর্কি সেনাদের দ্বারা নালন্দা ও বিক্রমশীলার ধ্বংসলীলার সাথে সাথে গৌতম বুদ্ধের নিজের ভূমিতে তাঁর ধর্মের চূড়ান্ত অবলুপ্তি ঘটে।

বৌদ্ধধর্ম যদি কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে হয়তো আজ পৃথিবীতে এই ধর্মের কোনও অস্তিত্বই থাকত না। সৌভাগ্যের বিষয়, বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন সময়ে ভারতের বাইরে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বিস্তারের সূচনা হয় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে। সম্রাট অশোকের পুত্র ভিক্ষু মহেন্দ্র ও কন্যা ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রা শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তখনও মহাযানের উদ্ভব হয়নি। শ্রীলঙ্কায় যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়, তা ছিল স্থবিরবাদের একটি শাখা। এঁরা পালি ভাষায় বৌদ্ধধর্মের চর্চা করতেন। পরবর্তীকালে শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধরা নিজেদের মূল স্থবিরবাদী বলে দাবি করেন এবং থেরবাদ (সংস্কৃত শব্দ স্থবিরের পালি রূপান্তর হল থের) নাম গ্রহণ করেন। শ্রীলঙ্কা থেকেই এই থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস ও কম্বোডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে খ্রিস্টীয় অব্দের শুরু থেকেই মধ্য এশিয়ার রেশম পথ ধরে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রবেশ করে। সেদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মই প্রাধান্য লাভ করে। চীন থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে কোরিয়ায় এবং সেখান থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে জাপানে পৌঁছায়। আবার বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে তিব্বতে গিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ লুপ্ত হলেও এর তিনটি রূপই এশিয়ার কোনও না কোনও অঞ্চলে প্রচারিত হয়ে আজ পর্যন্ত টিকে আছে : শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হীনযানী থেরবাদ; চীন, কোরিয়া ও জাপানে মহাযান; এবং তিব্বতে বজ্রযান।

এই তিন শাখার মধ্যে যদিও কোনটিই আদি বৌদ্ধধর্ম নয়, তবু এদের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে সবচেয়ে প্রাচীন হল থেরবাদ। কিছুটা এই কারণে এবং কিছুটা শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেনের ঐতিহাসিক যোগাযোগের ফলে আন্তর্জাতিক পণ্ডিত মহলে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে। আমরাও এই প্রবন্ধে থেরবাদী গ্রন্থগুলিকেই মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহার করব। থেরবাদী ত্রিপিটকের ভাষা পালি এবং এর তিনটি অংশ : বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্ম। সুত্ত পিটকেই মূলত বুদ্ধের ধর্ম সংক্রান্ত বক্তব্যগুলি পাওয়া যায়। সুত্ত পিটকের পাঁচটি অংশ। এই অংশগুলিকে নিকায় বলা হয়। এগুলি হল – দীঘ নিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, সংযুত্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় ও খুদ্দক নিকায়। এদের মধ্যে খুদ্দক নিকায়ের অধিকাংশ অংশ পরবর্তী রচনা, যে অল্প কিছু অংশ প্রাচীন সেগুলিও বুদ্ধের মতবাদ জানতে বিশেষ সহায়ক নয়। তাই পণ্ডিতেরা খুদ্দক নিকায়কে বাদ দিয়ে প্রথম চার নিকায়কেই বেশি গুরুত্ব দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাতকের গল্পগুলি খুদ্দক নিকায়ের এরকম পরবর্তী সংযোজন। বুদ্ধ নিজে কখনও তাঁর পূর্বজন্মের কাহিনী শোনান নি।

বুদ্ধের প্রকৃত মতবাদের বিকৃতির সম্ভাব্য কারণ : প্রসঙ্গ-বিচ্ছিন্নতা ও আক্ষরিকতা

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের যে রূপরেখা আমরা দেখলাম, তার থেকে স্পষ্ট যে, আজকের প্রচলিত বৌদ্ধধর্মকে হুবহু গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত আদি বৌদ্ধধর্ম হিসেবে গ্রহণ করার কোনও কারণ নেই। বরং অন্য সবকিছুর মতো বৌদ্ধধর্মও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বিকৃত হয়েছে, এটা মনে করাই স্বাভাবিক। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম খ্যাতনামা পণ্ডিত রিচার্ড গমব্রিচ (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রাক্তন বোডেন অধ্যাপক এবং বর্তমানে "Oxford Centre for Buddhist Studies"-এর অধ্যক্ষ) তাঁর "How Buddhism Began" বইতে বৌদ্ধধর্মের বিকৃতির দুটি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত, গৌতম বুদ্ধ কোনও ধর্মীয় শূন্যতার পরিমণ্ডলে ধর্মপ্রচার করেন নি। তাঁর সময়ে ভারতে অন্য অনেক ধর্মমত প্রচলিত ছিল যাদের মধ্যে অবশ্যই প্রধান ছিল বেদ-উপনিষদ ভিত্তিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মপ্রচারের সময় বুদ্ধকে মূলত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিতর্কের মধ্য দিয়ে তাঁর মতকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। তিনি ব্রাহ্মণদের অনেক মতকে অস্বীকার করেন এবং তার উপর ভিত্তি করে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং বুদ্ধের প্রকৃত মতকে সম্যকরূপে বুঝতে হলে তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের (মূলত উপনিষদের) পটভূমিকায় তাঁর বক্তব্যকে বিচার করা প্রয়োজন। উপনিষদ থেকে তাঁর বক্তব্যকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দেখলে অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে বুদ্ধের পরবর্তীকালে ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছিল। তাঁর মৃত্যুর দুয়েক শতাব্দী পরে যখন বৌদ্ধ সঙ্ঘের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মমতও নিজেই একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল, তখন আর তার উপনিষদের মতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কোনও প্রয়োজন রইল না। ফলে পরবর্তী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা উপনিষদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বুদ্ধের বক্তব্যকে দেখতে শুরু করলেন এবং সম্ভবত অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে ভুল বুঝলেন। এই বিষয়টিকেই আমরা বৌদ্ধধর্মের "প্রসঙ্গ-বিচ্ছিন্নতা" বলতে চেয়েছি।

দ্বিতীয় যে কারণে বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের মত থেকে সরে আসতে পারে, তা হল তাঁর বক্তব্যকে সবসময় আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করার প্রবণতা। বুদ্ধের সব উক্তিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে আমরা অনেক সময় তাঁকে ভুল বুঝব। এর কারণ হল তাঁর কথা বলার একটি বিশেষ কৌশল। এই কৌশলটি উদাহরণের সাহায্যে সবচেয়ে ভালো বোঝা যাবে। দীঘ নিকায়ের (৩১) সিগালক সুত্তে আমরা বুদ্ধকে সিগাল নামে এক যুবকের মুখোমুখি হতে দেখি। সেই সময় ভারতে দিকপূজার প্রচলন ছিল। মানুষ বিশ্বাস করত, ছয় দিকের (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঊর্ধ্ব ও অধঃ) পূজা করলে তারা সুরক্ষিত থাকতে পারবে। সিগাল নামের যুবকটিও তাই সকালে স্নানসিক্ত বসনে ছয় দিকে ঘুরে ঘুরে প্রণাম করছিল। বুদ্ধ তাকে এর কারণ জানতে চাইলে সে তার বিশ্বাসের কথা জানাল। তখন বুদ্ধ তাকে বললেন যে, ছয়দিকের পূজা নিশ্চয় করা প্রয়োজন, তবে কিনা সে যেভাবে করছে সেভাবে নয়, এই পূজার পদ্ধতি অন্য। এরপর স্বাভাবিকভাবেই যুবকটি বুদ্ধের কাছে ছয়দিকের পূজার সঠিক পদ্ধতি জানতে চাইবে। এবং সেই সুযোগে বুদ্ধ এবার তার দর্শনটিকেই সম্পূর্ণ পালটে দেবেন। যা ছিল সামান্য কুসংস্কার, তাই হয়ে যাবে মূল্যবান জীবনদর্শন। বুদ্ধ বললেন, ছয়দিক বলতে নেহাত পূর্ব, পশ্চিম ইত্যাদি দিককে বুঝলে চলবে না। নিজের মাতাপিতাকে পূর্বদিক, স্ত্রী ও

সন্তানদের পশ্চিমদিক, বন্ধু ও সহকর্মীদের উত্তরদিক, শিক্ষকদের দক্ষিণদিক, দাসদাসিদের অধোদিক এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের ঊর্ধ্বদিক রূপে বুঝতে হবে। এরপর বুদ্ধ এইসব মানুষদের কার প্রতি কেমন ব্যবহার করা উচিত, তা বিস্তারিতভাবে বলেন। উপসংহারে তাঁর বক্তব্য : "বৎস, পৃথিবীর ছয়দিকে তোমার প্রণামের কোনও প্রয়োজন নেই। সেই ছয় দিক যথেষ্ট সুরক্ষিতই আছে। তুমি বরং তোমার ছয়দিকে যারা তোমাকে ঘিরে রয়েছে, তাদের প্রতি সেবা, যত্ন ও ভালোবাসা দেখিয়ে নিজের ছয়দিক সুরক্ষিত কর।" এই হল বুদ্ধের মতে দিকপূজার সঠিক পদ্ধতি!

এরকম উদাহরণ সুত্ত পিটকে আরও অনেক আছে কিন্তু আশা করি, এই একটি থেকেই বুদ্ধের জনসংযোগের কৌশলটি বোঝানো গিয়েছে। বুদ্ধ খুব উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাকে প্রথমে গ্রহণ করতেন এবং তারপর সেই ধারণার খোলনলচে পালটে দিয়ে তাকে কার্যত নিজের মতের বাহক করে তুলতেন। মানুষের মতকে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে এটি নিঃসন্দেহে খুব কার্যকর পদ্ধতি এবং ধর্মপ্রচারক হিসেবে বুদ্ধের ব্যাপক সফলতার এটি একটি অন্যতম কারণ। কিন্তু এই কৌশলের একটা ঝুঁকিও আছে। তা হল, মানুষ পরে বুদ্ধের আরোপিত ব্যাখ্যা ভুলে গিয়ে আবার বিষয়টির আক্ষরিক অর্থে ফিরে যেতে পারে। উপরের উদাহরণে একটি কাল্পনিক পরিস্থিতির কথা ভাবা যাক। ওই যুবক পরে তার কোনও বন্ধুকে বুদ্ধের প্রবর্তিত "দিকপূজার" কথা বলল। কিন্তু বিষয়টি ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারার ফলে বন্ধুটি ভাবল, বুদ্ধ আক্ষরিক অর্থেই ছয়দিকের পূজা করতে বলেছেন। তাঁর সব উপদেশকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার বিপদ সম্পর্কে বুদ্ধ নিজেও অবহিত ছিলেন এবং তিনি এই ব্যাপারে তাঁর শিষ্যদের সতর্কও করেছিলেন। মজ্ঝিম নিকায়ের (২২) অলগদ্দওপম সুত্তে দেখা যায়, একজন ভিক্ষুর মনে ধর্ম সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যান্য ভিক্ষুরা তাঁকে বোঝাতে ব্যর্থ হওয়ায় বিষয়টি বুদ্ধকে জানান। বুদ্ধ প্রথমে তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করার জন্য সেই ভিক্ষুকে ভর্ৎসনা করেন। এরপর তিনি সমস্ত ভিক্ষুদের উদ্দেশে বলেন যে, অনেক বিপথগামী ব্যক্তি সূত্র, গাথা, গীত, উদান, উদ্ধৃতি, ব্যাখ্যা, উপমা ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্ম শেখে ঠিকই, কিন্তু তারপর সেইসব শিক্ষার অন্তর্নিহিত অর্থ নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে বিচার করে না। ফলে তারা ধর্মের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। তাদের অধীত শিক্ষা কেবল অন্যদের সমালোচনা করতে বা তর্ক জিততেই কাজে লাগে, কিন্তু তাদের নিজেদের সুখী করতে পারে না (যা কিনা ধর্ম শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য)। অন্যদিকে যারা নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে ধর্মের প্রকৃত অর্থ বিচার করে, তারাই ধর্মের অনুশীলন করে সুখী হয়। একটি উপমা দিয়ে বুদ্ধ এই পার্থক্যটি বুঝিয়েছেন। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিরা যেন একটি বিষধর সর্পকে ধরতে গিয়ে তার লেজ ধরে টানে, ফলে সর্প তাদের ফিরে দংশন করে। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা চিমটে দিয়ে সর্পের ঘাড়ে ধরে। তাঁর ধর্মকে অর্থ না বুঝে গ্রহণ করলে তা যে কত ক্ষতিকর হতে পারে, এই সর্পের উপমাই তার প্রমাণ।

এরপর বুদ্ধ আরও একটি উপমা দিয়েছেন। ধরা যাক, কোনও ব্যক্তি নদী পার হতে গিয়ে দেখল, কোনও সেতু বা নৌকা নেই। তখন সে গাছের ডালপালা ও লতাগুল্ম সংগ্রহ করে একটি ভেলা বানিয়ে তার সাহায্যে নদী পার হল। এরপর সেই ব্যক্তি যদি ভাবে, এই ভেলা আমার অনেক কাজে লেগেছে, সুতরাং আমি এটিকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাব, তাহলে সেটা নিশ্চয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বুদ্ধের ধর্মে সূত্র, গাথা, গীত, উদান, উদ্ধৃতি ইত্যাদির ভূমিকাও

ওই ভেলার মতো। এগুলি আমাদের ধর্মের অন্তর্নিহিত অর্থে পৌঁছাতে সাহায্য করে মাত্র, কিন্তু তারপর এদের আঁকড়ে ধরে থাকার কোনও মানে হয় না।

অবশ্য বৌদ্ধধর্মের সমস্ত বিষয়কেই যে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে তা নয়। কোনও কোনও বিষয় সরাসরি বলা হয়েছে, সেগুলির ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আবার কোনও কোনও বিষয় ইঙ্গিতে বলা হয়েছে, সেগুলি ব্যাখ্যার প্রয়োজন। বুদ্ধের ধর্মকে তারাই সঠিকভাবে প্রচার করে যারা যে বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই তার ব্যাখ্যা করে না এবং যে বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে তার ব্যাখ্যা করে। যারা উল্টোটা করে তারা বুদ্ধের ধর্মের অপপ্রচার করে (অঙ্গুত্তর নিকায় ২.২৪-২৫)।

পুনর্জন্মের প্রচলিত ব্যাখ্যা : মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম

পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মে পুনর্জন্মের ধারণার সঙ্গে আত্মার ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এসব ধর্মে স্বীকার করা হয়, মানুষের দেহের অতিরিক্ত একটি সূক্ষ্ম সত্তা থাকে যা স্বতন্ত্র ও অপরিবর্তনীয়। এই সত্তাটি দেহের মৃত্যুর পরেও টিকে থাকে এবং অন্য দেহ ধারণ করে। এই সূক্ষ্ম সত্তাকেই আত্মা বলা হয়। বৌদ্ধধর্মে পুনর্জন্মকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না কারণ বৌদ্ধধর্মে আত্মাকেই স্বীকার করা হয় না। এই ধর্মের একটি ভিত্তিপ্রস্তর হল "অনাত্মা"-র তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে মানুষের দেহের মধ্যে স্বতন্ত্র ও অপরিবর্তনীয় কোনও সত্তা নেই যাকে সে "আমি" বলে ভাবতে পারে। মানুষ মোহের বশে এরকম একটি আমিত্বে বিশ্বাস করে এবং এই মোহই তার দুঃখের কারণ। প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে একটি মানুষকে পাঁচটি অংশে বিভক্ত করা হয় : রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এই অংশগুলিকে একেকটি স্কন্ধ বলা হয়। এই পঞ্চ স্কন্ধ (five aggregates) মিলেই হয় মানুষ। রূপ (form) বলতে বোঝানো হয় মানুষের জড় দেহকে। বেদনা (feeling) হল সবরকম অনুভূতি : সুখের অনুভূতি, দুঃখের অনুভূতি বা নিরপেক্ষ অনুভূতি (লক্ষণীয়, বর্তমান বাংলা ভাষায় বেদনা বলতে শুধু দুঃখের অনুভূতিকে বোঝায় কিন্তু পালিতে তা বোঝাত না। সুতরাং বৌদ্ধধর্মের পরিভাষাগুলিকে সবসময় বর্তমান বাংলা অর্থে গ্রহণ করলে ভুল হতে পারে। এজন্য পরিভাষাগুলির ইংরেজি অর্থও দেওয়া হল।)। সংজ্ঞা (perception) হল কোনও বিষয়কে সনাক্ত করা। সংস্কার (volitional action) বলতে বোঝায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম। বিজ্ঞান (consciousness) হল চেতনা (পুনরায় লক্ষণীয়, বর্তমান বাংলায় বিজ্ঞান শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন)। এখন এই রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের প্রত্যেকটিই পরিবর্তনশীল এবং এদের কোনটিকেই কেউ "আমার" বলে দাবি করতে পারে না। সুতরাং পঞ্চস্কন্ধের কোনটিই আত্মা নয়। আর মানুষ যেহেতু পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি, তাই মানুষের মধ্যে আত্মা বলে কিছু নেই। এই হল অনাত্মার তত্ত্ব।

তাহলে আত্মাকে বাদ দিয়ে বৌদ্ধধর্ম কিভাবে পুনর্জন্মকে ব্যাখ্যা করে? বৌদ্ধধর্ম অনুসারে মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই পাঁচটি স্কন্ধের সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না, বরং এরা আবার নতুন রূপে সংযোজিত হয়ে নতুন একটি মানুষ (বা অন্য কোনও প্রাণী) সৃষ্টি করে। এইভাবে পঞ্চস্কন্ধের মাধ্যমে পুনর্জন্মের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় "প্রতীত্য-সমুৎপাদ"

(dependent origination) তত্ত্বে। প্রতীত্য-সমুৎপাদকে বৌদ্ধধর্মের সারবস্তু বলা হয়। বুদ্ধ এই তত্ত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন, "যিনি প্রতীত্য-সমুৎপাদ জানেন, তিনি ধর্ম জানেন। আর যিনি ধর্ম জানেন, তিনি প্রতীত্য-সমুৎপাদ জানেন" (মহাহত্থিপদওপম সুত্ত, মজ্ঝিম নিকায় ২৮)। এই তত্ত্বে বারোটি বিষয় (এই বিষয়গুলিকে নিদান বলা হয়) একটি কার্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। এই বিষয়গুলির প্রত্যেকটি তার পূর্ববর্তী বিষয়টির ফল এবং পরবর্তী বিষয়টির কারণ। তত্ত্বটি হল এরকম : অবিদ্যা (ignorance) থেকে সংস্কার, সংস্কার থেকে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান থেকে নাম-রূপ (name and form), নাম-রূপ থেকে ষড়ায়তন (six sense bases), ষড়ায়তন থেকে স্পর্শ (contact), স্পর্শ থেকে বেদনা, বেদনা থেকে তৃষ্ণা (craving), তৃষ্ণা থেকে উপাদান (clinging), উপাদান থেকে ভব (becoming), ভব থেকে জাতি (birth) এবং জাতি থেকে জরামরণ (decay and death) ও দুঃখ (suffering) উৎপন্ন হয়। আবার অবিদ্যার নিরোধে সংস্কারের নিরোধ, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ, বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপের নিরোধ, নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তনের নিরোধ, ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শের নিরোধ, স্পর্শের নিরোধে বেদনার নিরোধ, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদানের নিরোধ, উপাদানের নিরোধে ভবের নিরোধ, ভবের নিরোধে জাতির নিরোধ এবং জাতির নিরোধে জরামরণ ও দুঃখের নিরোধ হয়।

প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে প্রতীত্য-সমুৎপাদের তত্ত্বটিকে তিনটি জন্ম বা জীবনকাল জুড়ে ব্যাখ্যা করা হয়। অতীত জন্মের অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞতা এবং সেই অজ্ঞতা জনিত সংস্কারের ফলে আমরা মাতৃগর্ভে এমন একটি বিজ্ঞান বা চেতনা নিয়ে আবির্ভূত হই যা ওই অতীত সংস্কারের দ্বারা নিরূপিত। এই চেতনাই আবার আমাদের নাম-রূপ অর্থাৎ মানসিক ও দৈহিক সত্তা সৃষ্টি করে যা নিয়ে আমরা ভূমিষ্ঠ হই। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে আমাদের ষড়ায়তন অর্থাৎ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের (বৌদ্ধধর্মে পাঁচটি বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনকেও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হিসেবে ধরা হয়) সঙ্গে বাইরের (ও ভেতরের) বিভিন্ন অভিজ্ঞতার স্পর্শ বা যোগাযোগ ঘটে। এই যোগাযোগের ফলস্বরূপ আমরা বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি বা বেদনা অনুভব করি। এইসব অনুভূতির মধ্যে কিছু আমরা পছন্দ করি, আবার কিছু অপছন্দ করি। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। তৃষ্ণার ফলে আমরা কিছু অনুভূতির প্রতি আকৃষ্ট হই ও কিছু অনুভূতির প্রতি বিকর্ষণ অনুভব করি। একে বলা হয় উপাদান। এইভাবে বারবার আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে একসময় এগুলিই আমাদের স্বভাব হয়ে যায়, কিংবা অন্যভাবে বললে আমরা নিজেরাই এগুলি হয়ে যাই। একে বলা হয় ভব। এতদূর পর্যন্ত গেল বর্তমান জন্মের কথা। মৃত্যুর পর বর্তমান জীবনের ভবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আমরা আবার নতুন জন্ম বা জাতি লাভ করব। এবং একসময় জরাগ্রস্ত হয়ে আমাদের মৃত্যু হবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে প্রতীত্য-সমুৎপাদের চক্রটিকে তিনটি জন্ম জুড়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

প্রথম জন্ম – অবিদ্যা, সংস্কার।

দ্বিতীয় জন্ম – বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব।

তৃতীয় জন্ম – জাতি, জরামরণ।

তাহলে দেখা গেল, অবিদ্যা বা অজ্ঞতাই আমাদের বারবার জন্মগ্রহণ ও দুঃখভোগের মূল কারণ। অজ্ঞতা যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দূর হয়, ততক্ষণ এই জন্মমৃত্যুর চক্র চলতেই থাকবে। কিন্তু একবার অজ্ঞতাকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারলেই প্রতীত্য-সমুৎপাদের চক্রটি ছিন্ন হয়ে যাবে এবং আমাদের আর জন্ম হবে না। আমরা নির্বাণ লাভ করব। বলা বাহুল্য, এই অজ্ঞতা কোনও বিশেষ বিষয়ের অজ্ঞতা নয়। এই অজ্ঞতা হল জগত ও জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক সঠিক দৃষ্টির অভাব।

পুনর্জন্মের প্রচলিত ব্যাখ্যার সমস্যা : বৌদ্ধধর্মের অন্যান্য ধারণার সঙ্গে অসঙ্গতি

এখন প্রশ্ন হল, পুনর্জন্মের যে প্রচলিত তত্ত্বটি আলোচনা করা হল, তা কি গৌতম বুদ্ধের নিজের প্রচারিত মত, নাকি পরবর্তীকালের বিকৃতি? যদিও আজকের যুগে যেকোনো সাধারণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলে তিনি এই তত্ত্বকে স্বয়ং বুদ্ধের দ্বারা প্রচারিত বলেই দাবি করবেন, কিন্তু সেই দাবিকে যথার্থ বলে মানার ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুতর সমস্যা রয়েছে।

সমস্যা ১ : পুনর্জন্মের প্রচলিত ব্যাখ্যা অভিজ্ঞতাবাদের বিরোধী

আমরা এই প্রবন্ধের শুরুতেই দেখেছি যে, পুনর্জন্মের প্রচলিত তত্ত্ব বৌদ্ধধর্মের অভিজ্ঞতাবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। মৃত্যুর পর আমাদের পুনর্জন্ম হবে কিনা তা জানতে হলে আগে আমাদের মরতে হবে! তার আগে এই জীবনে সেটা জানা সম্ভব নয়। পালি সুত্ত পিটকের কিছু কিছু সুত্তে দেখা যায়, বুদ্ধ পুনর্জন্মের এই অভিজ্ঞতাবাদ-বিরোধী চরিত্রের জন্য তাকে ভ্রান্ত বলেছেন। সংযুত্ত নিকায়ের (৩৬.২১) সীবক সুত্তে মোড়িয়সীবক নামে একজন পরিব্রাজক বুদ্ধকে প্রশ্ন করছেন, "কিছু কিছু শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যে প্রচার করেন, মানুষ যাকিছু দুঃখ বা সুখ অনুভব করে তা অতীত কর্মের ফল, তাঁদের এই মতবাদ সম্পর্কে প্রভু বুদ্ধের বক্তব্য কী?" এর উত্তরে বুদ্ধ আয়ুর্বেদের "ত্রিদোষবাদ" ব্যবহার করে বলেন যে, কোনও ব্যক্তির শরীরে বায়ু, পিত্ত বা কফের অনিয়মের ফলে শারীরিক কষ্ট হলে সে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সেই কষ্টের কারণ জানতে পারে। কিন্তু অতীত কর্মের ফলে দুঃখ বা সুখ অনুভূত হয়, এই তত্ত্বকে এরকম অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করা যায় না। সুতরাং ঐসব শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের তত্ত্ব ভ্রান্ত।

বুদ্ধের সঙ্গে নিগ্রন্থ অর্থাৎ জৈনদের কথোপকথনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায় মজ্ঝিম নিকায়ের (১০১) দেবদহ সুত্তে। জৈনরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন। তাঁরা মনে করেন, মানুষ অতীত কর্মের কারণেই সুখ বা দুঃখ অনুভব করে। সুতরাং তপস্যা বা কৃচ্ছসাধনের দ্বারা অতীত কর্মের ক্ষয় করলে এবং নতুন কর্ম না করলে দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। উল্লিখিত সুত্তে বুদ্ধ কয়েকজন নিগ্রন্থকে প্রশ্ন করেন যে, তাঁরা কি জানেন তাঁরা অতীতে জন্মেছিলেন কিনা? উত্তরে নিগ্রন্থরা জানান যে, তাঁরা তা জানেন না। এরপর বুদ্ধ তাঁদের পরপর আরও কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তাঁরা কি জানেন তাঁরা অতীতে কি কি খারাপ কর্ম করেছিলেন? তাঁরা কি জানেন কৃচ্ছসাধনের ফলে তাঁদের দুঃখের কতটা নিরোধ

হয়েছে আর কতটা বাকি আছে (যার জন্য আরও কৃচ্ছসাধনের প্রয়োজন)? নিগ্রন্থরা সবগুলি প্রশ্নেরই নঞর্থক উত্তর দিলে বুদ্ধ বলেন যে, সেক্ষেত্রে তাঁদের মতবাদ ভিত্তিহীন। যদি তাঁরা সত্যিই জানতেন যে, তাঁরা অতীতে জন্মেছিলেন, অতীতে এই এই খারাপ কর্ম করেছিলেন এবং বর্তমান জীবনে কৃচ্ছসাধনের ফলে তাঁদের এতটা দুঃখের নিরোধ হয়েছে ও এতটা বাকি আছে, তবেই তাঁদের মত যুক্তিযুক্ত হত। এরপর বুদ্ধ একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। কোনও ব্যক্তি বিষাক্ত তীরের আঘাতে আহত হলে চিকিৎসক এসে তীরটি বের করে ওষুধ লাগিয়ে দেন। সুস্থ হওয়ার পর ওই ব্যক্তি মনে করতে পারে যে, সে পূর্বে তীরের আঘাতে কষ্ট পেয়েছিল এবং চিকিৎসার ফলে সেই কষ্টের নিরসন হয়েছে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটি সে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে জানতে পারে। কিন্তু নিগ্রন্থদের বিশ্বাসের এরকম কোনও অভিজ্ঞতা-নির্ভর ভিত্তি নেই।

সমস্যা ২ : পুনর্জন্মের প্রচলিত ব্যাখ্যা অনাত্মার তত্ত্বের বিরোধী

বাস্তব অভিজ্ঞতায় পুনর্জন্মের কোনও প্রমাণ না পাওয়া গেলেও মানুষ যে এটি বিশ্বাস করে তার কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তর বৌদ্ধধর্মের মধ্যেই রয়েছে। মানুষ তার আমিত্বের প্রতি মোহের কারণে এটা কিছুতেই মানতে পারে না যে, মৃত্যুর পর তার এই প্রিয় "আমি"-টির আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। তাই একপ্রকার আত্ম-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সে আত্মা ও পুনর্জন্মের কল্পনা করেছে (ঠিক যেমন আত্ম-সুরক্ষার জন্য সে কল্পনা করেছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের)। বৌদ্ধধর্ম অনুসারে এই আমিত্বের প্রতি মোহই মানুষের দুঃখের মূল কারণ। সেই কারণে বুদ্ধ অনাত্মার তত্ত্ব প্রচার করেছেন। সেদিক থেকে অনাত্মা ও পুনর্জন্ম একেবারে বিপরীতমুখী। যে ধর্মে অনাত্মাকে কেন্দ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে, সেই ধর্মে পুনর্জন্ম থাকে কিভাবে? যার আমিত্বের প্রতিই কোনও মোহ নেই, তার পুনর্জন্মের কল্পনারও কোনও প্রয়োজন নেই (ঠিক এই কারণে বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের কল্পনারও কোনও প্রয়োজন হয়নি)।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি কে, আমি কোথা হইতে আসিয়াছি বা আমি কোথায় যাইব ইত্যাদি যে প্রশ্নগুলি মানুষের মনে পুনর্জন্মের মতো কাল্পনিক ধারণার সৃষ্টি করে (এবং যে প্রশ্নগুলি আবার সাধারণত ধর্মজিজ্ঞাসুর মৌলিক প্রশ্ন রূপে বিবেচিত হয়), অনাত্মা-কেন্দ্রিক বৌদ্ধধর্মে সেই প্রশ্নগুলিরই কোনও স্থান নেই, উত্তর তো দূরের কথা। মজ্ঝিম নিকায়ের (২) সব্বাসব সুত্তে ধর্মে প্রশিক্ষণহীন সাধারণ মানুষের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা মূর্খের মতো চিন্তা করে, "আমি কি অতীতে ছিলাম? থাকলে আমি কী ছিলাম বা কেমন ছিলাম? অতীতে আমি কী থেকে কী হয়েছিলাম? কিংবা আমি কি ভবিষ্যতে থাকব? থাকলে আমি কী হব বা কেমন হব? ভবিষ্যতে আমি কী থেকে কী হব?" এরকম ব্যক্তি বর্তমান সম্পর্কেও বিভ্রান্ত থাকে : "আমি কী বা আমি কেমন? আমি কোথা থেকে এসেছি? আমি কোথায় যাব?" এ তো গেল ধর্মে প্রশিক্ষণহীনদের কথা। ধর্মে প্রশিক্ষিতরা কি এরকম চিন্তা করে? মজ্ঝিম নিকায়ের (৩৮) মহাতনহাসঙ্খয় সুত্তে বুদ্ধ একদল ভিক্ষুকে ধর্মোপদেশ দেওয়ার পর তাঁদের প্রশ্ন করছেন, তাঁরা উপরের মতো ভাবেন কিনা এবং তাঁরা একসঙ্গে জানাচ্ছেন যে, তাঁরা এরকম ভাবেন না।

সংযুক্ত নিকায়ের (২২.৮৫) যমক সুত্তে যমক নামে এক ভিক্ষুর মনে এরকম ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, কোনও ভিক্ষুর আসবের ক্ষয় হলে (আসব হল মনের কলুষতা, আসবের ক্ষয় হওয়ার অর্থ নির্বাণ লাভ করা) তাঁর দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বিনাশ ঘটে এবং তাঁর আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না। লক্ষণীয়, প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম অনুসারে এটি মোটেই ভুল ধারণা নয়। যাইহোক, অন্যান্য ভিক্ষুরা যমকের এই ভুল সংশোধন করতে না পেরে বুদ্ধের প্রধান শিষ্য সারিপুত্তকে বিষয়টি জানালে তিনি যমকের ধারণার পরিবর্তন করতে সমর্থ হন। সারিপুত্ত মূলত অনাত্মার তত্ত্বকেই তাঁর যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর যুক্তি ছিল এরকম : যমক মৃত্যুর পর যে ভিক্ষুর অনস্তিত্বের কথা ভাবছেন, তাঁর কি মৃত্যুর আগেই কোনও অস্তিত্ব আছে? জীবিত অবস্থাতেও তো ওই ভিক্ষু পরিবর্তনশীল পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি মাত্র এবং ওই স্কন্ধগুলির মধ্যে কোনটিকেই "ওই ভিক্ষু" বলে চিহ্নিত করা যায় না। সুতরাং মৃত্যুর আগেই যার কোনও অস্তিত্ব নেই, তার মৃত্যুর পরে কি হবে তা ভাবাটাই অনর্থক। সারিপুত্তের যুক্তি থেকে স্পষ্ট যে, অনাত্মাকে মানলে পুনর্জন্ম নিয়ে ভাবার কোনও প্রশ্নই আসে না।

সমস্যা ৩ : পুনর্জন্মের প্রচলিত ব্যাখ্যা মজ্ঝিম পন্থার বিরোধী

সকলেই জানেন, বৌদ্ধধর্মকে মজ্ঝিম পন্থা বা মধ্য পথের ধর্ম বলা হয়। এই নামকরণের যে কারণটি সাধারণত প্রচলিত সেটি হল এই যে, বৌদ্ধধর্ম অতিরিক্ত ভোগ এবং অতিরিক্ত কৃচ্ছসাধনা এই দুই চরম পথকে পরিহার করে মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করতে বলে। এই কারণটি হয়তো ভুল নয়, কিন্তু মজ্ঝিম পন্থা নামকরণের অন্য একটি কারণ আছে যা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। বৌদ্ধধর্ম হল তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রচলিত দুটি চরম মত শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদের মধ্যবর্তী। শাশ্বতবাদে মৃত্যুর পরে পুনর্জন্মকে স্বীকার করা হত এবং মানুষের সুখদুঃখের জন্য তার পূর্বজন্মের কর্মকে দায়ী করা হত। এই মত অনুসারে ভালো কাজের ভালো ফল এবং খারাপ কাজের খারাপ ফল হতে বাধ্য, এই জন্মে না হোক পরের জন্মে তা হবেই। এই মতের প্রচারক ছিলেন ব্রাহ্মণ ও জৈনরা। অন্যদিকে উচ্ছেদবাদীরা মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম মানতেন না। ফলে তাঁরা শাশ্বতবাদীদের মতো কোনও মহাজাগতিক ন্যায়বিচারকেও স্বীকার করতেন না। এঁদের কাছে রাজার বিচার ছাড়া নৈতিকতার আর কোনও ভিত্তি ছিল না। লোকায়ত বা চার্বাকপন্থীরা ছিলেন এই মতের প্রচারক। উচ্ছেদবাদীদের একালের nihilist-দের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ধর্মপ্রচারের সময় বুদ্ধ খুব সযত্নে এই দুটি মতকেই পরিহার করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে যাচাই করার নীতির কারণে তাঁর পক্ষে ওই দুটি মতের কোনটিকেই গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। বস্তুত তিনি কোনোদিন এমন কিছুই বলেন নি যাকে অভিজ্ঞতার নিরিখে যাচাই করা সম্ভব নয়। এই কারণে তিনি সরাসরি ঈশ্বর নেই একথা বলেন নি। তিনি শুধু বলেছেন, যদি কেউ নিজের অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরকে খুঁজে পায় তবেই সে ঈশ্বর আছে বলে দাবি করতে পারে। তিনি ঈশ্বর আছে তাও বলেন না, আবার ঈশ্বর নেই তাও বলেন না। কিন্তু তাঁর ধর্মে তিনি ঈশ্বরকে কোনও স্থান দেননি। শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদের বিতর্কেও (যা সেই সময়ের একটি "উষ্ণ বিতর্ক" ছিল) বুদ্ধ এইরকম অবস্থান নিয়েছিলেন। কেউ তাঁকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি হ্যাঁও বলতেন না, নাও বলতেন না। বৌদ্ধধর্মে এই সংক্রান্ত

প্রশ্নগুলি "অব্যক্ত" হিসেবে পরিচিত। মজ্ঝিম নিকায়ের (৬৩) চুলমালুঙ্ক্য সুত্তে মালুঙ্ক্যপুত্ত নামে এক ভিক্ষু বুদ্ধের কাছে এই প্রশ্নগুলি করে বলেন যে, এগুলির উত্তর না পেলে তিনি ভিক্ষুত্ব ছেড়ে গৃহী জীবনে ফিরে যাবেন : জগত শাশ্বত নাকি অশাশ্বত, জগত সসীম নাকি অসীম, জীবাত্মা ও শরীর এক নাকি ভিন্ন, মৃত্যুর পরে তথাগতের (সাধারণত বুদ্ধকেই তথাগত বলা হত, তবে তথাগত বলতে মুক্তি লাভ করেছেন এমন যেকোনো ব্যক্তিকেও বোঝাতে পারে) পুনর্জন্ম হয় নাকি হয় না, নাকি একইসঙ্গে পুনর্জন্ম হয় এবং হয় না, নাকি পুনর্জন্ম হয় এটাও ঠিক নয় এবং পুনর্জন্ম হয় না এটাও ঠিক নয়? বুদ্ধ উত্তরে মালুঙ্ক্যপুত্তকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি কখনও তাঁকে এই প্রতিশ্রুতি দেন নি যে, ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করলে তিনি এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবেন। বুদ্ধ আরও বলেন যে, যদি কেউ স্থির করে, বুদ্ধ যতদিন না ওই বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করবেন ততদিন সে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করবে না, তাহলে সেই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার মৃত্যুকালও উপস্থিত হতে পারে কারণ তখনও বিষয়গুলি অব্যাখ্যাতই থাকবে।

আমরা লক্ষ্য করতে পারি, উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার অর্থ হল শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করা। শাশ্বতবাদ অনুসারে জগত শাশ্বত ও অসীম। তবেই তো প্রাণীরা চিরদিন ধরে বিভিন্ন স্থানে জন্মানোর সুযোগ পাবে! উচ্ছেদবাদ অনুসারে জগত অশাশ্বত ও সসীম। জীবাত্মা ও শরীরকে এক বলার অর্থ হল শরীরের বিনাশের সাথে সাথেই জীবের বিনাশ, অর্থাৎ উচ্ছেদবাদ। জীবাত্মা শরীরের থেকে ভিন্ন হলে শরীরের বিনাশের পরেও জীবের জন্মানোর সুযোগ থাকছে, অর্থাৎ শাশ্বতবাদ। একইভাবে শাশ্বতবাদ অনুসারে মৃত্যুর পর তথাগতের পুনর্জন্ম হবে, আর উচ্ছেদবাদ অনুসারে হবে না। শেষ দুটি প্রশ্ন সম্ভবত শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদের কোনও জটিল সংমিশ্রণ।

বুদ্ধ এই প্রশ্নগুলির উত্তর না দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, তিনি মৃত্যু-পরবর্তী বিষয়ে আদৌ আগ্রহী নন, তাঁর চিন্তার ক্ষেত্র হল মানুষের বর্তমান জীবন যার অস্তিত্ব নিয়ে কোনও তর্ক চলে না। সম্ভবত তাঁর এই অবস্থানটি পরিষ্কার করার জন্য তিনি এরপর মালুঙ্ক্যপুত্তকে একটি উপমা দেন। কোনও ব্যক্তি বিষাক্ত তীরের দ্বারা আহত হলে তার আত্মীয়েরা একজন শল্য চিকিৎসককে ডেকে আনে। এই অবস্থায় সেই ব্যক্তি নিশ্চয় চিকিৎসককে বলবে না যে, কে তীর ছুঁড়েছিল, তার জাতি-গোত্র কী, সে দেখতে কেমন, তার ধনুকটিই বা কেমন, তীরের গোড়ায় কোন পাখির পালক রয়েছে এসব প্রশ্নের উত্তর না পেলে সে তীরটি বের করতে দেবে না। এরকম করলে বিষের ক্রিয়ায় ওই ব্যক্তির মৃত্যুও ঘটতে পারে কিন্তু সে ঐসব প্রশ্নের উত্তর পাবে না। ঠিক সেইরকম মানুষ মৃত্যু-পরবর্তী বিষয় নিয়ে ভাবলে তার বর্তমান জীবনের দুঃখের অবসান হবে না। বুদ্ধ হলেন সেই চিকিৎসক যার কাজ বর্তমান জীবনের দুঃখের নিরসন করার পথ বাতলে দেওয়া, মৃত্যুর পর কী হবে তা বলা নয়।

তাহলে এই হল বুদ্ধের মজ্ঝিম পন্থার প্রকৃত তাৎপর্য। এখন প্রশ্ন, পুনর্জন্মের প্রচলিত ব্যাখ্যা কি এই মজ্ঝিম পন্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? আমাদের দৃষ্টিতে তো তা ছদ্ম-শাশ্বতবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

সমস্যা ৪ : পুনর্জন্মের প্রচলিত ব্যাখ্যা এই জীবনে নির্বাণের বিরোধী

গৌতম বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় না। তবে যে সামান্য কিছু আলোচনা আছে, সেখানে একটা বিষয়ে সবাই একমত : বুদ্ধ ঊনত্রিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে নির্বাণ লাভ করেছিলেন এবং আশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কোথাও একথা লেখা নেই যে, তিনি মৃত্যুর পর নির্বাণ লাভ করেছিলেন। প্রথম দিকের সমস্ত গ্রন্থে মৃত্যু বোঝাতে পরিনির্বাণ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (বুদ্ধের মৃত্যুর ক্ষেত্রে মহাপরিনির্বাণ)। নির্বাণ ও পরিনির্বাণ স্পষ্টতই ভিন্ন যদিও পরবর্তীকালে অনেক সময় পরিনির্বাণকে নির্বাণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার একটা প্রবণতা চোখে পড়ে। এছাড়া অন্যান্য বহু ভিক্ষুর সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, তাঁরা মৃত্যুর আগেই নির্বাণ লাভ করে অর্হত হয়েছিলেন। সুত্ত পিটকের অসংখ্য স্থানে আমরা বুদ্ধের মুখে শুনি যে, তাঁর ধর্মের চূড়ান্ত ফল এই জীবনেই পাওয়া যায়, মৃত্যুর পরে নয়।

এই বিষয়টিতেও পুনর্জন্মের প্রচলিত ব্যাখ্যা সমস্যার মুখে পড়ে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী নির্বাণ ও দৈহিক মৃত্যু একসঙ্গে ঘটা উচিত। নির্বাণ লাভের পর কারও পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এই তত্ত্ব অনুসারে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই বুদ্ধের মৃত্যু হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ঘটনা হল, বুদ্ধ আরও পঁয়তাল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন।

তাছাড়া প্রতীত্য-সমুৎপাদকে তিন জন্ম জুড়ে ব্যাখ্যা করার ফলে কেউ যে বর্তমান জীবনের শেষেই নির্বাণ লাভ করতে পারবে, তেমন নিশ্চয়তাও দেওয়া যাচ্ছে না। সেটা নির্ভর করছে সে প্রথম, দ্বিতীয় না তৃতীয় কোন জন্মে আছে তার উপর। যদি কেউ প্রথম জন্মে থাকে, তাহলে অবিদ্যা ও সংস্কারের নিরসন করে সে এই জন্মের শেষেই নির্বাণ লাভ করতে পারে। কিন্তু কেউ দ্বিতীয় বা তৃতীয় জন্মে থাকলে তার প্রথম জন্মের অবিদ্যা ও সংস্কারের জন্য প্রতীত্য-সমুৎপাদের বর্তমান চক্রটি চলতে থাকবে এবং নির্বাণ লাভের জন্য তাকে পরবর্তী প্রথম জন্মের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

প্রসঙ্গত, প্রতীত্য-সমুৎপাদের চক্রটি তিন জন্ম জুড়ে ক্রিয়া করলে তিনবার জন্ম ও তিনবার মৃত্যুর উল্লেখ থাকার কথা। কিন্তু চক্রটিতে একবার করেই জন্ম ও মৃত্যুর উল্লেখ আছে।

পুনর্জন্মের বিকল্প ব্যাখ্যা : এই জীবনেই পুনর্জন্ম

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, পুনর্জন্মকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে তাকে বৌদ্ধধর্মের সামগ্রিক মেজাজের সঙ্গে মেলানো কঠিন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে রিচার্ড গমব্রিচ উল্লিখিত বৌদ্ধধর্মের বিকৃতির যেদুটি কারণ আমরা দেখেছি, তার মধ্যে দ্বিতীয়টি হল সমস্ত ধারণাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার প্রবণতা। পুনর্জন্মকে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মেলাতে হলে তাকে আক্ষরিক অর্থে না নিয়ে অন্য কোনও উপায়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। তার জন্য পুনর্জন্ম সংক্রান্ত কিছু কিছু বিষয়কে আমাদের একটু অন্যভাবে বুঝতে হবে।

আমরা শুরু করব নাম ও রূপ এই দুটি বিষয় দিয়ে। এই দুটি বিষয়কে আমরা একসঙ্গে পেয়েছি প্রতীত্য-সমুৎপাদের চতুর্থ নিদান হিসেবে এবং কেবল রূপকে পেয়েছি পঞ্চস্কন্ধের প্রথম স্কন্ধ হিসেব । প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে রূপ বলতে বোঝানো হয় আমাদের জড় দেহকে। নামরূপকে ব্যাখ্যা করার সময় বলা হয়, নাম হল পঞ্চস্কন্ধের বাকি চারটি স্কন্ধ, অর্থাৎ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের সমষ্টি। এই চারটি স্কন্ধ মানুষের মানসিক দিককে প্রকাশ করে যেমন রূপ প্রকাশ করে দৈহিক দিককে। ফলে নামরূপ বলতে বোঝায় মানুষের সামগ্রিক সত্তাকে, যার মধ্যে নাম হল মন ও রূপ দেহ। অথচ প্রতীত্য-সমুৎপাদের চক্রটি ব্যাখ্যা করার সময় নামরূপের এই সংজ্ঞাকে সামান্য পরিবর্তিত করে বলা হয়, বিজ্ঞান নামের অংশ নয়। নাম হল কেবল বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের সমষ্টি। এইভাবে বিজ্ঞানকে নাম থেকে বাদ দেওয়ার ফলে নামরূপের যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যাটি উপরে দেওয়া হল, তার হানি ঘটে। প্রচলিত ব্যাখ্যাকাররা এই অসঙ্গতি ঘটাতে বাধ্য হন কারণ প্রতীত্য-সমুৎপাদের চক্রে নামরূপের ঠিক আগেই বিজ্ঞান আছে। একই জন্মে দুবার বিজ্ঞানের সৃষ্টি হতে পারে না (প্রচলিত মতে বিজ্ঞান থেকে ভব পর্যন্ত একটি জন্ম)। কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা হয় কি? প্রতীত্য-সমুৎপাদের চক্রে একটু পরেই আমরা পাই বেদনাকে যা ওই একই জন্মের অন্তর্গত। তাহলে হিসেবমত বেদনাকেও নামের অংশ বলা চলে না। প্রচলিত ব্যাখ্যাকাররা বোধহয় এই ব্যাপারটা ভেবে দেখেন নি।

এই প্রসঙ্গে রিচার্ড গমব্রিচের উল্লিখিত বৌদ্ধধর্মের সম্ভাব্য বিকৃতির প্রথম কারণটি বিবেচনা করা যাক। বুদ্ধের মতবাদকে সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্যধর্মের মতবাদের পরিপ্রক্ষিতে বিচার করলে অনেক সময় আমরা বুদ্ধের প্রকৃত বক্তব্যকে সহজে বুঝতে পারি। গমব্রিচের ছাত্রী সিউ হ্যামিলটন তাঁর "Identity and Experience" (যা গমব্রিচের তত্ত্বাবধানে করা তাঁর গবেষণা-সন্দর্ভের পুস্তকাকার) বইতে দেখিয়েছেন, উপনিষদ ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যে নাম ও রূপকে কখনোই মন ও দেহ হিসেবে ধরা হয় নি। সেখানে বরং এই দুটি শব্দকে তাদের আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে : নাম হল কোনকিছুর ধারণাগত পরিচয় এবং রূপ হল তার দৃষ্টিগ্রাহ্য আকার। এরপর হ্যামিলটন সুত্ত পিটকের কিছু কিছু অংশ উল্লেখ করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, বুদ্ধও সম্ভবত নাম ও রূপকে আক্ষরিক অর্থেই বুঝতেন। নাম ও রূপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, এরা একে অপরের পরিপূরক। নাম রূপকে একটি ধারণাগত বা বিমূর্ত অভিব্যক্তি দেয় এবং বিপরীতক্রমে রূপ নামকে একটি দৃশ্যগত বা মূর্ত অভিব্যক্তি দেয়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধরা উপনিষদের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাওয়ার ফলে এই দুটি ধারণার অন্যরকম অর্থ করতে শুরু করেন। হ্যামিলটন এটাও উল্লেখ করেছেন যে, নাম ও রূপকে উপনিষদের অর্থে গ্রহণ করলেই আমরা প্রতীত্য-সমুৎপাদের সূত্রটিকে অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে বুঝতে পারি।

রূপ বলতে যে দেহ বোঝাতে পারে না, তা আমরা অন্যভাবেও বুঝতে পারি। রূপ হল পঞ্চস্কন্ধের একটি স্কন্ধ। এখন বুদ্ধ এই পঞ্চস্কন্ধের তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন মূলত ব্রাহ্মণ্যধর্মের আত্মার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করার জন্য। তাঁর যুক্তি ছিল এরকম : রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের কোনটিই স্বতন্ত্র, অপরিবর্তনীয় ও "আমার" নয়। অথচ আত্মার সংজ্ঞা অনুযায়ী এই বৈশিষ্ট্যগুলি না থাকলে কোনকিছুকে আত্মা বলে দাবি করা যায় না। সুতরাং পঞ্চস্কন্ধের কোনটিকেই আত্মা বলা যায় না। আমরা জানি, ব্রাহ্মণ (ও জৈনরা) আত্মা বলতে কখনোই দেহকে বুঝতেন না,

দেহাতিরিক্ত কোনও সত্তাকে বুঝতেন। সুতরাং রূপ বলতে যদি দেহকে বোঝানো হয়, তাহলে "রূপ আত্মা নয়" এই যুক্তির কোনও অর্থ হয় না। এরকম যুক্তি দিলে আত্মার সমর্থকরা নিশ্চয় বুদ্ধকে বলতেন, "আমরা তো দেহকে আত্মা ভাবিই না। কাজেই দেহ আত্মা নয় বলে আপনি নতুন কি বলছেন?" সুত্ত পিটকে আত্মার সমর্থকদের এরকম কোনও উক্তি পাওয়া যায় না। বরং দেখা যায় যে, আত্মার সমর্থকরা রূপকেও আত্মা বলে দাবি করছেন (যদিও বুদ্ধ পরে সেই দাবিকে খণ্ডন করছেন)। মজ্ঝিম নিকায়ের (৩৫) চুলসচ্চক সুত্তে সচ্চক (সত্যক) নামে একজন জৈন বুদ্ধের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে এরকম দাবি করেছিলেন।

তাছাড়া বৌদ্ধধর্মে দেহ বোঝানোর জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পরিভাষা ছিল : কায়া। যেসব ক্ষেত্রে স্পষ্ট করে দেহের প্রসঙ্গ এসেছে, সেখানে কায়া শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে, রূপ নয়। আমরা কায়া ও রূপের পার্থক্য এইভাবে বুঝতে পারি : কায়া হল মানুষের জড় দেহ এবং রূপ হল সেই জড় দেহের বাহ্যিক, দৃষ্টিগ্রাহ্য আকার। কায়ার ভিত্তির উপর রূপের প্রতিষ্ঠা। মানুষ আনন্দে থাকলে তার একরকম রূপ হয়, দুঃখে থাকলে আরেকরকম, আবার রেগে গেলে আরেকরকম। এই সবরকম রূপই কিন্তু তার জড় দেহ বা কায়ার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। পঞ্চস্কন্ধের দৈহিক দিকের মধ্যে এই রূপকেই রাখা হয়েছে, কায়াকে নয়।

পঞ্চস্কন্ধের দৈহিক দিককে এইভাবে ভাবলে তা মানসিক দিকের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়। পঞ্চস্কন্ধের মানসিক দিক হল বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এখন এই চারটি বিষয়ের কোনটিই কিন্তু মানুষের "মন" নয়, এগুলি মনের ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা কিছু বিষয়। এখানে আমরা "মন" বলতে মানুষের মনের শূন্য আধারটিকে বোঝাচ্ছি। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, একজন মানুষ স্বপ্নহীন, গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এই অবস্থায় তার বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার বা বিজ্ঞান কোনটিরই অস্তিত্ব নেই। তাহলে কি আমরা বলব যে, ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের মনের অস্তিত্ব থাকে না? মনের শূন্য পাত্রটা থাকে, কিন্তু তার মধ্যে কোনও অনুভূতি থাকে না। বৌদ্ধধর্মে এই শূন্য মনের জন্য একটা পরিভাষা আছে : চিত্ত। চিত্ত হল সেই আধার যার উপর ভিত্তি করে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের অস্তিত্ব। চিত্ত কিন্তু পঞ্চস্কন্ধের অংশ নয়। স্পষ্টতই, আমরা পঞ্চস্কন্ধের দৈহিক দিকের ক্ষেত্রে কায়াকে যে স্থান দিয়েছি, মানসিক দিকের ক্ষেত্রে চিত্তের স্থান তাই। এইভাবে ভাবলে আমরা পঞ্চস্কন্ধের একটা সুষম চিত্র পাই। একজন মানুষের দুটি দিক : দৈহিক ও মানসিক। দৈহিক দিকের আধার কায়া, মানসিক দিকের আধার চিত্ত। কায়ার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে রূপ। আর চিত্তের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এই রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকেই একসঙ্গে বলি পঞ্চস্কন্ধ।

নাম ও রূপকে নতুনভাবে বুঝে নেওয়ার পর এবার আমরা প্রতীত্য-সমুৎপাদের সূত্রটিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে পারি। এযুগে থাইল্যান্ডের দুজন প্রখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু বুদ্ধদাস ভিক্ষু এবং প্রায়ুধ পায়ুত্তো প্রতীত্য-সমুৎপাদের একটি বিকল্প ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এঁদের মতে প্রতীত্য-সমুৎপাদ আমাদের মনের মধ্যে আমিত্বের ধারণার উৎপত্তি ও বিনাশকে বর্ণনা করে। যদিও বৌদ্ধধর্ম অনুসারে আমাদের মধ্যে কোনও স্বতন্ত্র "আমি"-র অস্তিত্ব নেই, কিন্তু আমরা নিজেদের অজ্ঞতা বশত প্রতিনিয়ত এরকম একটি "আমি"-র মিথ্যে ধারণার জন্ম দিচ্ছি এবং নিজেদের

দুঃখের কারণ হচ্ছি। অজ্ঞতা দূর করতে পারলেই এই মিথ্যে আমিত্বের ধারণার আর জন্ম হবে না এবং আমরা দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করব। এই হল বৌদ্ধধর্মের পুনর্জন্মের প্রকৃত অর্থ। বলা বাহুল্য, পুনর্জন্মের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক। এখানে আক্ষরিক অর্থে মানুষের মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মের কথা বলা হচ্ছে না, মৃত্যুর আগেই মানুষের মনে একটি ধারণার জন্মের কথা বলা হচ্ছে।

এবার এই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতীত্য-সমুৎপাদের চক্রটিকে বিস্তারিত ভাবে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

অবিদ্যা থেকে সংস্কার : আমরা সাধারণভাবে জীবন ও জগতকে যে দৃষ্টিতে দেখি তা ভুল। আমাদের দৃষ্টি আমাদের আমিত্বের ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের ভেতরে একটি স্বতন্ত্র, অপরিবর্তনীয় "আমি"-র অস্তিত্ব আছে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসই হল আমাদের অবিদ্যা বা অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা থেকে আমরা কিছু কিছু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম করি যেগুলি আমাদের অভ্যাস বা সংস্কার হয়ে যায়। আমরা যেহেতু মনের ভেতরের গতিবিধি নিয়ে কখনও গভীরভাবে ভাবি না, তাই আমরা জানতেও পারি না যে, আমরা যা করছি তা আসলে আমিত্বের মিথ্যে বিশ্বাস থেকে করছি।

সংস্কার থেকে বিজ্ঞান : এবার আমাদের এই সংস্কারগুলিই ঠিক করে দেয় আমাদের বিজ্ঞান বা চেতনাগুলি কিভাবে কাজ করবে। একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে আমরা কি দেখব বা শুনব তা নির্ভর করছে আমরা কি দেখতে বা শুনতে চাইছি তার উপর। আবার আমরা কোন পরিবেশে থাকব তাও অনেকটা আমাদের ইচ্ছের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হবে। আমরা যখন গভীর মনোযোগ দিয়ে কোনও বই পড়ি, তখন আশেপাশের শব্দ শুনতে পাই না। শুনতে পাই না, তার কারণ এই নয় যে, আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় খারাপ হয়ে যায়। শুনতে পাই না কারণ ওই সময় আমাদের কর্ণ-বিজ্ঞান নিষ্ক্রিয় থাকে। একইভাবে আমরা তন্ময় হয়ে গান শোনার সময় সামনের দৃশ্যও দেখতে পাই না কারণ চক্ষু-বিজ্ঞান কাজ করে না। এই দুটি উদাহরণে আমরা দেখলাম, নির্দিষ্ট পরিবেশে সংস্কার কিভাবে আমাদের বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার সংস্কার আমাদের পরিবেশকেও ঠিক করে দিতে পারে। যে বই পড়তে ভালোবাসে, সে গ্রন্থাগারে বেশি সময় কাটাবে। আবার যে গান শুনতে ভালোবাসে, গানের জলসায় তাকে বেশি পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞান থেকে নামরূপ : কোনও নির্দিষ্ট মুহূর্তে আমাদের কোন বিজ্ঞানগুলি কতটা সক্রিয় আছে, তার উপর আমাদের নাম ও রূপ নির্ভর করে। আমরা যখন বই পড়ি, তখন নিজেকে একজন পাঠক হিসেবে ভাবি এবং গান শোনার সময় ভাবি, আমি একজন শ্রোতা। এইভাবে পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের একটা নাম তৈরি হয়ে যায়। একইভাবে আমাদের রূপও অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। বই পড়া আর গান শোনার সময় নিশ্চয় আমাদের দেহের আকার-আকৃতি একরকম থাকে না।

নামরূপ থেকে ষড়ায়তন : বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে যেমন আমাদের নামরূপ পরিবর্তিত হয়েছিল, তেমনি এবার এই পরিবর্তিত নামরূপই ঠিক করে দেয়, আমাদের কোন ইন্দ্রিয়গুলি কতটা সক্রিয় থাকবে। আগের দুটি উদাহরণের জের টেনে বলা যায়, বই পড়ার সময় আমাদের চোখ সক্রিয় হয় এবং গান শোনার সময় কান সক্রিয় হয়।

ষড়ায়তন থেকে স্পর্শ : আমাদের ছয়টি ইন্দ্রিয় যেমন যেমন সক্রিয় হয়, তেমনিভাবেই বাইরের ও ভেতরের বস্তুর সঙ্গে তাদের স্পর্শ বা সংযোগ ঘটে। এইভাবে চোখের সঙ্গে দৃশ্য বস্তুর, কানের সঙ্গে শব্দের, নাকের সঙ্গে গন্ধের, জিভের সঙ্গে স্বাদের, ত্বকের সঙ্গে স্পর্শযোগ্য বস্তুর এবং মনের সঙ্গে চিন্তার সংযোগ ঘটে।

স্পর্শ থেকে বেদনা : স্পর্শ হলেই আমাদের মধ্যে তিন প্রকার বেদনা বা অনুভূতির একটি সৃষ্টি হয় – সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষা (না-সুখ না-দুঃখ)।

বেদনা থেকে তৃষ্ণা : আমরা স্বাভাবিকভাবেই সুখের প্রতি আকৃষ্ট হই, দুঃখের প্রতি বিকর্ষণ অনুভব করি এবং উপেক্ষা আমাদের কাছে একঘেঁয়ে লাগে। এই তিন প্রকার প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা।

তৃষ্ণা থেকে উপাদান : তৃষ্ণা শক্তিশালী হয়ে একসময় উপাদান বা আসক্তিতে পরিণত হয়। আমরা পছন্দের ব্যক্তি বা বস্তুকে আঁকড়ে ধরতে চাই এবং অপছন্দের ব্যক্তি বা বস্তুর থেকে দূরে পালাতে চাই।

উপাদান থেকে ভব : এই উপাদান বা আসক্তিগুলি একসময় আমাদের এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে তোলে যে, এগুলি তখন আমাদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, এগুলিই আমরা হয়ে যাই। একে বলা হয় ভব। এটি হল আমিত্বের ধারণার জন্মের প্রথম ধাপ।

ভব থেকে জাতি : আমিত্বের ধারণা যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাকে বলা হয় জাতি বা জন্ম।

জাতি থেকে জরামরণ : আমিত্বের ধারণা সম্পূর্ণরূপে তৈরি হওয়ার পরেই আসে সেই ধারণাকে রক্ষা করার চাপ। বাইরের জগত প্রতিনিয়ত আমাদের আমিত্বকে আঘাত করে। ফলে আমরা দুঃখ, বিরক্তি, হতাশা, রাগ, অবসাদ ইত্যাদি অনুভব করি। আবার এইসব আঘাতের ফলে আমাদের আমিত্বের ধারণাও দুর্বল হতে থাকে এবং একসময় তা ধ্বংস হয়ে যায়। এই ঘটনাকে মানুষের শরীরের পরিণতির সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে জরামরণ।

প্রতীত্য-সমুৎপাদের চক্রটি এখানেই শেষ হয় ঠিকই, কিন্তু আমাদের মধ্যে যতক্ষণ না অবিদ্যার সম্পূর্ণ নিরসন হচ্ছে, ততক্ষণ একের পর এক চক্র চলতেই থাকে এবং আমরা একের পর এক আমিত্বের মিথ্যে মূর্তি গড়ে তুলতে থাকি। পরিবেশের আঘাতে মূর্তি ভাঙে, আমরা কষ্ট পাই, আবার নতুন মূর্তি গড়ে তুলি। এই হল সাধারণভাবে আমাদের জীবন! এই দুঃখের চক্র থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হল সম্যক চেষ্টার দ্বারা চক্রের মূল কারণ অবিদ্যাকে সমূলে উৎপাটিত করা।

উপসংহার : যুক্তিবাদীর ধর্ম বৌদ্ধধর্ম

প্রবন্ধের শুরুতে আমরা দেখেছিলাম, যুক্তিবাদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মকে মেলানোর ক্ষেত্রে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বাধা হল পুনর্জন্মের ধারণা। সেই কারণেই এতক্ষণ এই ধারণাটিকে নতুন আলোকে বিচার করার চেষ্টা করা হল। এই দীর্ঘ আলোচনার সারসংক্ষেপ হিসেবে নিচের বিবৃতিগুলি করা যেতে পারে :

প্রথমত, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস থেকে একথা বলা যায় যে, বর্তমানে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের সমস্ত ধারণাই স্বয়ং বুদ্ধের দ্বারা প্রচারিত, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই।

দ্বিতীয়ত, পুনর্জন্মের প্রচলিত তত্ত্ব অর্থাৎ দৈহিক মৃত্যুর পর পুনর্জন্মের ধারণাকে বুদ্ধের দ্বারা প্রচারিত ভাবলে আমরা বেশ কিছু গুরুতর অসঙ্গতির সম্মুখীন হই যেগুলির কোনও উত্তর পাওয়া যায় না।

তৃতীয়ত, পুনর্জন্ম বলতে আমরা যদি এই জীবনেই আমাদের মনের মধ্যে ভ্রান্ত আমিত্বের ধারণার পুনর্জন্ম বুঝি, তাহলে পূর্বোক্ত অসঙ্গতিগুলি আর থাকে না।

এই বিবৃতিগুলি থেকে আমরা একটিই স্বাভাবিক যৌক্তিক সিদ্ধান্ত টানতে পারি : প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মে পুনর্জন্ম বলতে মনের মধ্যে আমিত্বের ধারণার পুনর্জন্মই বোঝাত। বুদ্ধ নিজে এই অর্থেই পুনর্জন্মের তত্ত্ব প্রচার করেন। পরবর্তীতে এই তত্ত্ব বিকৃত হয়ে মৃত্যুর পর পুনর্জন্মের তত্ত্বে পরিণত হয়।

এবং এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের যুক্তিবাদী হওয়ার ক্ষেত্রে যে একটিমাত্র বাধা ছিল, তাও অপসৃত হয়ে যায়। আমরা আগেই দেখেছিলাম, বৌদ্ধধর্ম সাধারণভাবে অন্ধবিশ্বাসকে সমর্থন করে না এবং এই ধর্মে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরও কোনও স্থান নেই। এখন আমরা বলতে পারি, বৌদ্ধধর্মে মৃত্যু-পরবর্তী জগতে বিশ্বাস করারও কোনও প্রয়োজন নেই। একজন যুক্তিবাদী এর চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারেন? ধর্ম মানেই অযৌক্তিক বিশ্বাসের কারখানা, এই পূর্ব ধারণাকে বর্জন করে যুক্তিবাদী ব্যক্তিরা এই নতুন আলোয় বৌদ্ধধর্মকে দেখার চেষ্টা করতে পারেন। তাতে হয়তো তাঁরা এক নতুন জীবনদর্শনের সন্ধান পেতে পারেন, "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী"-তে যে জীবনদর্শন আমাদের খুব বেশি করে প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র :

Edward Conze, Buddhism : A Short History, Oneworld, Oxford, 2008

A. K. Warder, Indian Buddhism, Motilal Banarsidass, Delhi, 2004

Richard Gombrich, How Buddhism Began : The conditioned genesis of the early teachings, Routledge, 2006

Richard Gombrich, What the Buddha Thought, Equinox, 2009

Walpola Rahula, What the Buddha Taught, Grove Press, New York, 1974

Rupert Gethin, The Foundations of Buddhism, Oxford University Press, 1998

Maurice Walshe, The Long Discourses of the Buddha, A Translation of the Digha Nikaya, Wisdom Publications, Boston, 1995

Bhikkhu Nanamoli & Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of the Buddha, A Translation of the Majjhima Nikaya, Wisdom Publications, Boston, 2009

Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, A Translation of the Samyutta Nikaya, Wisdom Publications, Boston, 2000

Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha, A Translation of the Anguttara Nikaya, Wisdom Publications, Boston, 2012

Sue Hamilton, Identity and Experience : The Constitution of the Human Being According to Early Buddhism, Luzac Oriental, London, 1996

Buddhadasa Bhikkhu, Paticcasamuppada : Practical Dependent Origination

P. A. Payutto, Dependent Origination : The Buddhist Law of Conditionality, Buddhadhamma Foundation, Bangkok, 1994

ভ্যালেনটাইনস্ ডে

তৃতীয় পাণ্ডব

জুলাই ৬, ২০১৬

আজকাল বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যে গুলোতেও কেমন যেন একা হয়ে যাই। অথচ এই কিছুদিন আগে অব্দিও বৃষ্টি নিয়ে আদেখলামির শেষ ছিল না। বাড়িতে থাকলে বৃষ্টির সময় রবীন্দ্রনাথ বা অতুলপ্রসাদের গান শোনা, ছাদে একলা ভেজা, আরো কত কি! এখন শুধু চুপ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসে থাকি। পুরোনো কথা ভাবি, আবার ভাবিও না। একলা জানলার বাইরে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামে, আমি চেয়ে দেখি। আকাশের রঙ পাল্টে যায়, কিন্তু আগের মত কারো জন্যেই আর মন টা হু হু করে ওঠে না। ফোনে হাতও চলে যায় না, অজান্তে। তোর অভাবটাও কি তাহলে অভ্যেস হয়ে গেল আস্তে আস্তে?

সেদিন হঠাৎ তোর ভাইকে দেখলাম, জানিস? নেতাজীভবন মেট্রোর সামনে। বাপীর জুয়েলারী স্টোর্স টাতো ওদিকেই কোথাও, না? অনেকবার চিনিয়ে দিয়েছিস, তাও খুঁজে পাবোনা। আমার রাস্তা চেনার প্রতিভা তো তোর অজানা নয়। নিজেই মজা করে নাম দিয়েছিলি, লেডি কলম্বাস। যখন দক্ষিণ কলকাতার অলিগলি ঘুরে বেড়াতাম একসাথে, তখনও পড়া ধরার মত করে জানতে চাইতিস, "একা এখানে ছেড়ে দিলে, বাড়ি ফিরতে পারবি?" সেই দেখ, একাই তো চলে এলাম এতটা রাস্তা, হারাইনি কোথাও! ইচ্ছে করে না হলে, কেউ সত্যি সত্যি হারায়ও না, হয়ত।

পিকু কত বড় হয়ে গেছে! তোদের ভবানীপুরের বাড়ি যেতাম যখন, ক্লাস সিক্সের পুচকি মিষ্টি বাচ্চা একটা। প্রত্যেক দিন একটা করে ডেয়ারী মিল্ক দিয়ে দলে টেনেছিলাম ওকে। আমাদের ঝগড়া দেখলে, ও মামণির কাছে একছুটে গিয়ে বলত, "মা, দাদা আবার ইতুদির সাথে ঝগড়া করছে। তুমি বকবে চলো।" আমি ঝগড়া ভুলে, হেসে গড়িয়ে পড়তাম, ওর পাকামো দেখে। আর, তুই আরো খেপে যেতিস। সেই পিকু এখন হিসেব মতো ক্লাস টুয়েলভ হওয়ার কথা। বেশ খানিকক্ষন তাকিয়ে রইলাম। অবিকল তোকে দেখতে পেলাম ওর মধ্যে, জানিস? সেই কাটা কাটা নাক, মুখ, স্বপ্নভেজা দুটো নীলচে চোখ, আলো পিছলানো রেশম চুল, সরু ঠোঁটদুটোর ওপর নরম ঘাসের রেখা।

টাইমমেশিনে করে এক ধাক্কায় পিছিয়ে গেলাম বেশ কয়েক বছর। মনে পড়ল, আমাদের প্রথম একা দেখা, ঠিক এই জায়গাটাতেই। হেডফোন কানে অপেক্ষা করছি স্টেশনের বাইরে, তুই এলি হেলতে দুলতে। মাত্র পনেরো মিনিট দাঁড় করিয়ে রেখে। ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি! আমার ওপরই চোটপাট করলি উল্টে, মেট্রোতে ওঠার আগে ফোন না করার জন্য। কি যেন একটা নোটস্ নেওয়ার ছিল তোর থেকে। কথায় কথায় আগেই বলেছিলি, কেউ বাড়িতে থাকবে না। মুখে না বললেও, বুঝতে পারতাম, তোরও ভাল্লাগে আমাকে। তাই আর আপত্তি করিনি তোর সাথে একা হতে। তোদের সেই পুরোনো সবুজ বাড়ির দোতলা, তোর নিজস্ব ঘরটা। একদম রাস্তার পাশে, উল্টোদিকে হরিশ মুখার্জী

পার্ক। কত হাসি, আড্ডা, ফ্রীজ থেকে মামণির হাতে বানানো কেক, অনুরোধের আসর। ওঠার আগে টেনে নিলি নিজের দিকে। ভেজা ঠোঁটে চোখ বুজলাম আবেশে।

সেই শুরু। তারপর, দুদিন দেখা না হলেই জানলা বেয়ে মনখারাপ নামত শরীরে। ঝগড়া হলে, মনে হত, তিনতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিই, কখনো। বেশ কয়েকবার তো না জানিয়ে, তোদের বাড়ির সামনের পার্কটাতেও গিয়ে বসে থেকেছি, একা। ফোন করে বলেছি, "একবার বেরো, একটু কথা বলেই চলে যাবো।" তুই বিরক্ত হয়েছিস, বকেছিস, কিন্তু শুনতাম না। তিনটে বছর গাঙচিলের ডানায় ভর করে উড়ে গেল, বুঝতেই পারলাম না। আমার শহরটা যে এত সুন্দর, এত সবুজ, এমন ভেজা, নাম ভুলে যাওয়া গলির বাঁকের অন্ধকারটা যে এত আদরের বুঝিনি আগে। ইলেকট্রিকের তারে ঝুলে থাকা বুড়ো চাঁদটাও যে এমন ম্যাজিক জানে, জানতেই পারতাম না কখনো, তুই না পাশে থাকলে।

মা আমার সব বুঝত, হাবে ভাবে। বাবা কোনোদিনই খুব একটা কাছের মানুষ ছিল না। দুজনের মধ্যে মা ই ছিল যোগসূত্র। মনে আছে, মা বড়ি, নাড়ু, সন্দেশ বানিয়ে আমাকে দিত, তোকে দেওয়ার জন্য। কই, আরো তো কত বন্ধু ছিল, কিন্তু আগ্রহ ছিল শুধু তোর খবরেই। সব গল্প অবশ্যি সুখের ছিল না। প্রচুর মন কষাকষিতে কেটেছে বিকেল থেকে সন্ধ্যে। আমাকে সব বলতিস তুই। আমার আগে একজনের সাথে সম্পর্ক ছিল তোর – অনু। তুই নিজেই বেরিয়ে এসেছিস সে সম্পর্ক থেকে, কিন্তু অনু নাকি বুঝতে চায়না। সুইসাইডের কথা বলে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করে, দেখা করতে চায় যখন তখন। তুইও বন্ধু হিসেবে না করতে পারিস না। আমি এটা মানতে পারতাম না। চেঁচিয়ে মাথায় করতাম রাস্তাঘাট। তোকে পার্কের ঘাসে, কখনো নদীর কাছে একা ফেলে, হাঁটা দিতাম দিকশূণ্যপুরের দিকে। এদিক ওদিক ঘুরে মাথা ঠাণ্ডা করে ঘরে ফিরতাম। চেয়ে বসে থাকতাম ফোনের দিকে, যদি আমার নীললোহিত, তুই, ফোন করিস একবার। পরে না পেরে, নিজেই গভীর রাতে ফোন করে স্যরি বলতাম। পাগলী ছিলাম একদম, সত্যিই। জানিস, আমাদের বংশে পাগলামি কিন্তু নতুন নয়। দাদুর এক পিসী পাগল ছিল পুরোপুরি। অল্পবয়সে পাড়ার একজনের সাথে ঘর ছেড়েছিল, ভালোবেসে। সে ছেলে এক বেশ্যাপাড়ায় নিয়ে গিয়ে তোলে, বিয়ের বদলে। মেয়ে পালিয়ে আসে কোনোরকমে, কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গের ধাক্কাটা মেনে নিতে পারেনি। খুব ছোট্টবেলায় দেখতাম, ছাদের চিলেকোঠার ঘরে বন্ধ করে রাখা হত সেই পিসীদিদাকে। আমাকে দেখলেই কেমন ফোকলা হাসি হেসে কাছে ডাকত। ভয় পেয়ে ছুটে নীচে পালিয়ে আসতাম, মায়ের কাছে। খুব চিন্তা হত, আমি কখনো ওরকম হয়ে যাবো না তো!

দিনটা এখনো মনে আছে। সরস্বতী পূজো, ভ্যালেনটাইনস্ ডে একদিনে পড়েছিল সে বছর। খুব করে বলেছিলাম, দেখা করি। তুই বললি, কাকুদের ওখানে পূজোতে বাড়ির সবার নেমন্তন্ন, না গেলে বাপী রাগারাগি করবে। কেন জানি, কোথায় যেন খটকা লাগল। সত্যি বলছি, মন মানতে চায়নি তুই মিথ্যে বলতে পারিস। একা গিয়ে পার্কটাতে বসলাম। বাড়ির মেইন গেট ভিতর থেকে আটকানো। তোর জানলা খোলা, দেখা যায়না বাইরে থেকে কিছু। আধঘণ্টা কেটে গেল। একবার ভাবলাম, বাড়ির মধ্যেই আছিস যখন, কলিংবেলটা বাজাই গিয়ে। এইসব ভাবছি আকাশ পাতাল, দরজা খুলে রাস্তায় নামলি তুই। অনুর হাতটা এখনও তোর মুঠোর মধ্যে ধরা। তোরা হাসছিস, খুনসুটি করছিস

একসাথে। তোর চোখের ওই দৃষ্টি আমি চিনি। প্রত্যেকবার নিজেদেরকে তুমুল ভালোবাসার পর, তোর খোলা বুকে মাথা রেখে শুয়ে থাকতাম যখন, তোর চোখদুটো ঠিক এই ভাষাতেই কথা বলত আমার সাথে। প্রথমদিনের চুমুটা হঠাৎ শেষবিকেলের হাওয়া হয়ে আমার শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁটদুটো ভিজিয়ে দিয়ে গেল। বৃষ্টি এল প্রথমে হালকা চালে, মিহি তুষারপাতের মত। পরে, আরো জোরে।

বাকিটা রাস্তা কিভাবে এসেছিলাম, মনে নেই। বাড়ির গেট পেরিয়ে, সোজা তিনতলার ছাদে। ওপর থেকে নিজেকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে, সেই পাগল পিসীদিদার কথা মনে পড়ল হঠাৎ। জানি না, কেন। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সেই ফোকলা দাঁতের হাসি, সেই আয় আয় আয় ডাক। তবে, আর ভয় করছিলনা একটুও। কেমন অদ্ভুত নির্ভার হয়ে চোখ বুজলাম, মাটি ছোঁয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে।

তারপর থেকে, এই চিলেকোঠার ঘরটাই আমার আস্তানা। মরচে ধরা জানলার শিক বেয়ে সন্ধ্যে নামে, পুরোনো পাগলা-গারদে। নিরাবয়ব আমি চেয়ে থাকি, বাইরের চেনা মুখগুলোর দিকে। তাদের রাগ, হতাশা, অভিমান, আনন্দ, সুখ, কান্না সব পড়তে পারি কপালের ভাঁজগুলোতে। চুপচাপ দেখে যাই শুধু। দেখি, কিভাবে জীবন বয়ে চলেছে, নিজের নিয়মে। তুই এখন শর্মি কে বিয়ে করেছিস, বেশ কয়েক মাস প্রেমের পর। তোর হিউস্টনের অ্যাপার্টমেন্টে এখন সকাল হচ্ছে। আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরছিস তুই। শর্মিকে জড়িয়ে ধরছিস, ভালোবেসে। এসবই তো হওয়ার কথা ছিল। কোথাও কিছু থেমে থাকেনি, আমার না থাকাতে। শুধু, মা বাবার বিয়েটা টিকল না, জানিস। পরে বুঝেছিলাম, আমিই ছিলাম দুজনের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। হঠাৎ করে সেটা ছিঁড়ে যাওয়ায়, আর কোনো টানই দুজনকে এক ছাদের তলায় রাখতে পারেনি। এখন দুটো মানুষ, দুটো আলাদা শহরে বসে, যে যার নিজের মত করে, একই শোক উদযাপন করে। আর, চেনা শহরটা প্রতিদিন একটু একটু করে পাল্টে যায়, আমার চিলেকোঠার বাইরে। আমি চুপ করে চেয়ে চেয়ে দেখি। অনন্তকাল।

ভগ্নস্তূপ ও এক ষষ্ঠবর্ষীয় শিশু

হস্তিমূর্খ

এপ্রিল ২, ২০১৬

একটা বেশ বড় সময় এই পাড়ায় আসা হচ্ছে না। আমার বন্ধুরা অনেকেই বেশ ক্ষুব্ধ বুঝতে পারি। প্রকাশিত লেখাগুলিও বেশ কয়েকদিন বা মাস হয়ে গেল পড়া হয়ে ওঠেনি। তাঁদের এই মনোভাব আমায় ব্যথিত করে কারণ দোষ তো আমারই। দেওয়ার জন্যে আমার কাছে আছে সেই বহুচর্চিত অজুহাত। সেটা আর পেশ করলাম না, বরং বলা যায় ক্ষমাপ্রার্থী। ক্ষমার অযোগ্য কাজে যুক্ত মানুষজনও তো ক্ষমা চায়, পাবে কি পাবে না সে প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিত রেখেই চায়।

মাঝে কিছু সময় পেয়ে আবার শুরু করছি আমার এই সব অবান্তর লেখার কাজ। আজকেও সেইরকমই একটা। তবে এই লেখা আমি আজ পোস্ট করব কিংবা আদৌ লিখব এটা গত পরশুদিন সন্ধ্যেবেলাতেও আমার মাথায় আসেনি। এমনকি পুরো লেখাটাও আমার নয়। অন্য একটা লেখা লিখেছিলাম, ভেবেছিলাম সেটাই দেব। কিন্তু মানুষ ভাবে একরকম হয় অন্যরকম। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। গত বৃহস্পতিবার যথেষ্ট রাগ নিয়েই অফিস থেকে বেরিয়ে পৌঁছই এক বন্ধুর বাড়ি। রোজই যাই, সেই মার্চ মাসের শেষ দিনেও গেলাম। ঢোকার মুখেই মুখোমুখি বন্ধুর ষষ্ঠবর্ষীয় পুত্রের। প্রথমেই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে জানালো – জানো আজ কি হয়েছে?

- কি হয়েছে?

- একটা ব্রিজ ভেঙে পড়ে গেছে।

- তাই!! কি করে !!!

আমার প্রশ্নে কপট বিস্ময়। একঝলক তাকিয়ে দেখলাম বাংলা একটা নিউজ চ্যানেলে দেখানো হচ্ছে কলকাতার বিবেকানন্দ রোডে নির্মীয়মান উড়ালপুল ভেঙে পড়ার দৃশ্য। সারাদিন তাকে টিভির সামনে থেকে ওঠাতে ব্যর্থ হয়েছে তার গুরুজনেরা। নাহ, সেদিন কার্টুন চ্যানেল দেখার বায়না সে করেনি, বায়না ধরেনি কম্পিউটারে গেম খেলার। শেষে একরকম বাধ্য হয়ে বাড়ির সবাই টিভি দেখা বন্ধ করেছে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? টিভি খুললেই আবার বসেছে নিউজচ্যানেলের সামনে। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে একেবারেই দেরি হল না

- ব্রিজ বানাতে জানে না, তবু ব্রিজ বানিয়েছে!

সিমেন্ট, বালি কোনটা বেশি কোনটা কম তার একটা মোটামুটি হিসেবও দেখলাম তার কণ্ঠস্থ। আমাকে বলে উঠতে পারার প্রাথমিক উত্তেজনা থিতিয়ে যেতেই তার প্রশ্ন – এটা কি ঠিক হয়েছে?

এতক্ষণ অন্য দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলাম, এবারে ওর চোখের দিকে তাকালাম। উত্তরের আশায় থাকা চোখদুটিকে নিরাশ করতে হলই। সোজা চলে গেলাম বন্ধুর কম্পিউটারে। বাড়ি ফিরতে হবে, ফেসবুকে বিপ্লব করতে হবে, আমার তখন অনেক কাজ। কিন্তু সেই বালক সেই দিনও আমার পেছন পেছন এল। অন্যান্য দিনের মত গান শোনার বায়না তার নেই। ক্রমাগত মুখ চলে যাচ্ছে। এর পরের অংশে তার সেই অসম্পাদিত বক্তব্য যা আমি শ্রুতিটাইপ করেছিলাম। শুধুমাত্র দুটি নাম ব্যবহৃত হয়েছিল সেইদুটি পাল্টে অমুক এবং তমুক করে দিলাম। বুঝতে একটু অসুবিধে হতে পারে তাই বলি তমুক হল অমুকের ছেলে।

"ঠাকুর আমাদের খুব বাজে জিনিস করছে কিন্ত আমরা একটা কাজ করতে হবে। আমরা ঠাকুরকে যে করেই হোক, ঠাকুরকে ভাল করতে হবে। কেন ঠাকুরকে আমরা ভাল করব? তার কারণ হচ্ছে আজ ফ্লাইওভার ভেঙেছে কিন্তু গাড়ি আর টাটাসুমো আর মানুষের ওপরে এসে পড়েছে ফ্লাইওভারটা। কিন্তু আজ অনেক মানুষদের ক্ষতি করেছে। এগুলি ঠাকুর ভাল করছে না। এবার আমরাও ঠাকুরকে এমন একটা জিনিস দেব যাতে ঠাকুর আর আমাদের এইরকম কাজ আর কক্ষনও করবে না। যেটা আমরা ঠাকুরকে জিনিসটা দেব সেই জিনিসটার নাম হচ্ছে বোম তার গায়ে একটা গায়ে কাগজ। পেরেক দিয়ে লাগানো থাকবে আর ঐ কাগজটার মধ্যে লেখা থাকবে তুমি আগে আমাদের অনেক ভাল জিনিস দিতে এখন সেটা আর করতে পারছ না, আরও বাজে জিনিস করিয়ে দিচ্ছ। তুমি যেই শাস্তিটা আমাদেরকে দিচ্ছ সেটা অনেক অনেক খুব বাজে। এবার ওর থেকেও বাজে শাস্তি দেব যাতে তুমি সব দেশকেই ভাল করে রাখবে। কোনও দেশকেই তুমি বাজে ভাবে চালাবে না আর এইরকম কাজ দেখলে কিন্তু আরও বাজে শাস্তি তোমাকে দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা এবার কিন্তু সহ্য করেছি এর পরেরবার আর সহ্য করা হবে না। ভূমিকম্প হয়েছে সেটা তোমার দোষ নয়, এই যে আজকে তুমি অনেক মানুষদের অনেক অনেক ক্ষতি করেছ সেটা দেখে আমরা সবাই দুঃখ পেয়েছি। সেটা কি? একটা মানুষ দুটো ট্যাক্সির মাঝখানে আটকে গেছে। পুলিস চেষ্টা করে তাকে বের করতে পেরেছে। একটা মানুষের ফ্লাইওভারের একটা লোহা বুকের ভেতর দিয়ে পিঠ কেটে বেরিয়ে গেছে। আর তার মুখ থেকে সেই রক্ত বের হচ্ছে। আর বুক থেকেও রক্ত বের হচ্ছে আর সে হাঁ করে আছে। সে কি বাঁচবে কিনা কেউ জানে না। ফ্লাইওভারের নিচ থেকে তাকে বের করেছে তবুও সে বাঁচবে কিনা আমরা সেটা নিয়েই চিন্তা করছি। হাসপাতালেও তাকে ভর্তি করা হয়েছে কিন জানি না। তাকে যদি কেউ যদি না খেয়াল করে, নাও করে থাকতে পারে, যখন ব্রিজ তুলবে তখন যদি নিয়ে যায় তালে বাঁচবে। যদি ব্রিজ তুলে তাকে নিতে ভুলে যায় তালে সে আর বাঁচবে না কোনওদিনও। সে যেই বাড়ির থেকে এসেছিল তারা তো কাঁদবে। তাকে তো ভগবান নিয়ে নিল। এইভাবে যদি ভগবান চালাতেই থাকে তালে তো আমাদেরও ভগবান নিয়ে নেবে। আমি হচ্ছি অমুকের ছেলে। ক্লাস ওয়ানে পড়ি। বড় হওয়ার আগেই যদি আমাদেরকে নিয়ে নেয় তালে কি করে আমি বড় হব? তালে আমরা এবার তমুকের বন্ধু বাড়িতে আসবে। তমুকের বাবার বন্ধুরাও তমুকের বাড়িতে আসবে। তারপরে যারা যারা তমুকের বাড়িতে এসেছে তমুকের সঙ্গে সবাই মিলে আয়োজন করা হবে যাতে ঠাকুর ভাল হয়ে যাবে। ঠাকুর যদি ভাল না হয় তখন আমরা আরও ঠাকুরকে বেশি বেশি শাস্তি দেওয়া হবে। হ্যাঁ। আমি যা যা বললাম তা তা ঠিকঠাক করতে হবে। যা যা আমি সব লিখলাম সেই কাজগুলো ঠিক সব ভগবানদের জায়গায় পৌঁছে যায়, কিন্তু না পৌঁছালে তো আমিও আছি। বোম

যদি ঠাকুরের কাছে না পৌঁছায় তালে আমরা সব রকেটে করে গিয়ে বোম ছুঁড়ব। আমরা না হলে ৩৫টা রকেট নিয়ে যাব। ঠাকুর যে বাজে জিনিসগুলি করছে তার উত্তর চাই। উত্তর না পেলে ঠাকুর যেখানে থাকে সেখানে গিয়ে আমরা বোম ছুঁড়ব। বোমের গায়ে কাগজে লেখা থাকবে। নাহলে শুধু যদি আমরা কাগজ ছুঁড়ি আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেখানেই পড়বে। যদি আমরা বোম ছুঁড়ি তাহলে ঠাকুর যেখানে থাকবে সেখানেই পড়বে, সেটা ঠাকুরের সামনে। এই আয়োজনটা আমরা করলাম।"

শেষ হতে বুঝলাম শিশুটির মতে ভগবানই এসবের মূলে। অথচ সত্যি যাতে মানুষের হাত নেই, সেই বিষয়ে ভগবানকে অভিযুক্ত হিসেবে সে রেহাই দিয়েছে আর মানুষের কৃতকর্মের জন্যে অভিযুক্ত হিসেবে বেছে নিয়েছে সর্বশক্তিমানকে। একটু পরেই শুনলাম নির্মাণসংস্থার কর্ণধারও সেই ভগবানকেই দায়ী করেছেন ঘটনার জন্যে। বুঝতে পারলাম না সেই ষষ্ঠবর্ষীয় বালক ইতিমধ্যেই প্রাপ্তবয়স্কদের মত ভাবতে শিখে গেছে? নাকি একজন প্রাপ্তবয়স্ক শিশুসুলভ আচরণ করছে?

চর্যাপদের আমরা...

অনেকদিন আগে আমাদের ব্লগার থাংকমনি লিখে দিয়েছিলেন আমাদের কথা, চর্যাপদের পথ চলার শুরুর কথা। এবারের বাছাই করতে গিয়ে মনে হল শুধু শুরুর কথা কেন, থাকুক চর্যাপদের লেখকদের কথাও, যাঁরা লেখালিখি, মন্তব্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই ক' বছর সঙ্গে থেকেছেন চর্যাপদের। এবারের বাছাই চর্যাপদে লিখেছেন সেরকমই কিছু লেখকদের কথা রইল এখানে, তাঁদের নিজের ভাষায়...

হস্তিমূর্খ

আমার মূর্খতা কোন লঘু জিনিস নয়। শিশি বোতলের মতই শক্ত। লাঠ্যৌষধি দ্বারা দেহস্থ পঞ্চভূত প্রকম্পিত করিলে যে মূর্খতা অপগত হইয়া সুবুদ্ধির উদয় হয় এবং সেই সুবুদ্ধি যদি স্থায়ী হয়, তবে তাহা হইল লঘু মূর্খতা। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আমার ক্ষেত্রে কখনই তা হয়নি।

তুষার সেনগুপ্ত

প্রবাসী বাঙালী, পেশা জাহাজ (আদার ব্যাপারী নই কিন্তু), নেশা যা খুশি পড়া এবং যা ইচ্ছে তাই লেখা, শুভাকাঙ্ক্ষীরা পড়ে বলেন যাচ্ছেতাই.....

যদুবাবু

নিজের সম্বন্ধে কিছু লেখা অত্যন্ত কঠিন কাজ, মনে হয় মরে ভূত হয়ে নিজের অবিচুয়ারি নিজেই লিখছি। সে যাইহোক, আমি রাশিবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করি, বা বলা ভালো, করার নামে সময় কাটাই। অনেকদিন আগে (অর্থাৎ যখনো গাংগুলি স্টেপ আউট করে ব্রডকে মাঠের বাইরে পাঠাতেন), নাটক পরিচালনা করতাম/ লিখতাম, গল্প-কবিতাও লিখতাম সময় পেলে - এখন সময় পেলে হাঁ করে ঘুমোই অথবা বোকা সিরিয়াল দেখি - দেখতে দেখতে সিরিয়াল-ও শেষ হয়ে যায়, আর আমিও লালঝুল মেখে ঘুম থেকে উঠে বসে ভাবি কি থেকে কি হচ্ছি, হয়েই চলেছি - চর্যাপদে এলাম একেবারে গাড়ি উলটে খাদে পড়ার আগে কিছু ঝোপঝাড় ধরে কয়েকটা মিনিট ঝুলতে, বলা যায় না ঝোপ বুঝে কোপ মেরে হয়তো আবার হাইওয়েতে উঠেও পড়তে পারি। দেখা যাক ...

প্রত্যয়

সরল সাদাসিধে আমি একদমই নই, বরং বেশ প্যাঁচালো। একটাই গুণ, আমি অনেকটা মোবিয়াস ব্যাণ্ডের মত প্যাঁচালো, তাই ভিতরে বাইরে কোনো তফাৎ নেই...

হযবরল

আত্মজীবনী যেদিন সংক্ষিপ্ত ভাবে তথ্য সহকারে লিখতে পারব সেদিন ...

সৌরদীপ

আমি যে কি, তা আজও বুঝে উঠতে পারলাম না। কেউ বলে সর্বঘটের কাঁঠালিকলা, কেউ বলে কুঁড়ে, কেউ বলে হ্যাজায় বেশি, বাবা-মায়ের মুখে তো গাধা-গরুর বাইরে শুনি কম। আইডেন্টিটি কার্ডটা হারিয়েই ফেলেছি একরকম। যখন মনে যা আসে লিখি, কারোর পড়ে ভাল লাগলে সেটুকুই আমার রোজগার। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি এখন, যদিও বিশ্বের বিদ্যালয়ে এখনও পৌঁছতে পারিনি। সে চেষ্টাই করি মাঝে মাঝে, বাইরে তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে।

নবকলম

আমি আসলে কিছুই করিনা।।

হিমাদ্রী

অবশ্যই বাঙালি। কোলকাতায় বরানগরে বাসা। এখন চাকুরি সূত্রে আমেদাবাদে। প্রোফেসনাল জিওলজিস্ট। পড়াশুনো কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও আই আই টি খড়্গপুর (অসমাপ্ত)। অফিস ও এন জি সি। বিবাহিত, দুই মেয়ে ও স্ত্রী। লেখালিখি আর বই পড়া ছাড়া ঘুরতে ভালোবাসি। পুরোনো দিনের গান পছন্দের। এক সময়ে পেটুক ছিলাম, এখন পেটেই দেয় না। ঈশ্বর গভীর বিশ্বাসী- জন্মান্তর আর জীবন এক উদ্দেশ্য এই সব বিশ্বাস করি। রাজনীতি একদম অপছন্দের জিনিস।

বিশেষ ধন্যবাদ

শর্মিলা ব্যানার্জি

নির্মাল্য মুখার্জী চক্রবর্তী

ধন্যবাদ

অতনু

কল্পতরু

পাগলা দাশু

হস্তিমূর্খ

প্রচ্ছদ

শাক্যমুনি

সম্পাদনা

প্রত্যয়

www.chorjapod.com